হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

ভূমিকা

কলা-সংস্কৃতির বিভিন্ন অলিন্দে যাঁদের বলিষ্ঠ সার্থক পদপ্রক্ষেপ সংশ্লিষ্ট ইতিহাসের আয়তন বহুগুণ বিবর্ধিত করে তুলেছে—সেই মহার্ঘ তালিকায় হেমেন্দ্রকুমার রায় নিঃসন্দেহে একটি কনকোজ্জ্বল মালিন্য-মুক্ত নাম। প্রজন্মের পর প্রজন্মের নিটোল পরম্পরার বিপুল স্রোতে যাঁরা গ্রাসধর্মী মহাকালের ভয়াল ভ্রুকুটিকে তিলমাত্র গুরুত্ব না দিয়েও জনচিত্তে অরুণরাগরঞ্জিত এক অম্লান মহিমায় সমুদ্ভাসিত রয়েছেন হেমেন্দ্রকুমার সেই নমস্যদেরই একজন। অর্ধ শতাব্দী-পরিসর তাঁর সুদীর্ঘ অবদানময় জীবনের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত যে অভাবনীয় বৈশিষ্ট্যের মিছিল, স্বকীয়তার সমারোহ, বৈচিত্র্যের সমাবেশ তাঁর সৃষ্টি ও সাধনার মাধ্যমে জাতীয় জীবনের অমূল্য সঞ্চয়কে সুসমৃদ্ধ করেছে—তার মধ্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ নিহিত রয়েছে।

কবিতা-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-রোমাঞ্চ কাহিনী রহস্য আখ্যান প্রভৃতির মাধ্যমে ছোট-বড় নির্বিশেষে সব বয়সের পাঠকের সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর অন্তরঙ্গ মিতালি, গড়ে উঠেছে এক অভঙ্গুর বন্ধুত্বের অচ্ছেদ্য বন্ধন। উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলি ছাড়া ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, নাট্যকলা প্রভৃতিকেও সমান ঔজ্জ্বল্যে বিকীরিত হয়েছে তাঁর বহুগামী প্রতিভার অনবদ্য আলো। আর, এই সবকিছুর সমন্বয়েই তাঁর সৃষ্টি সমগ্র সমুচ্চারিত হয়েছে উৎকর্ষের অভ্রচুম্বী বিন্দুতে।

ছোটদের কাছে হেমেন্দ্রকুমার রায় সব মিলিয়ে পরিপূর্ণতারই এক উপযুক্ত প্রতিশব্দ। একদিকে অপার আনন্দ, অদম্য আগ্রহ, দুর্বার কৌতূহল। অন্যদিকে ঠাসবদ্ধ রোমাঞ্চ, জমাট বাঁধা রহস্য, কল্পনাতীত শিহরণ। আর, হেমেন্দ্রকুমারই এ-সবের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার।

লেখক জীবনের কর্মসূচীতে কিশোর মনের পরিধির প্রসারতাকেই

তিনি দিয়েছিলেন অগ্রাধিকার। অ-পরিণত মনের সীমানার সম্প্রসারণের দিকেই জোর দিয়েছিলেন সর্বাধিক। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মানসিকতার দ্বারোদঘাটন করে বিরাট-বিশাল-বিপুল-অনন্ত-অশেষ সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলে তাদের মধ্যে বিবিধ বিষয়ক সচেতনার উন্মেষ ঘটানোই তাঁর এক মুখ্য কীর্তি। রাজা-মন্ত্রী-রাক্ষস-রাক্ষসী-সওদাগর-কোটাল-ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী-মৃগয়ার সীমিত পরিসরে ছোটদের গণ্ডীবদ্ধ না রেখে তাদের ছড়িয়ে দিলেন অসীমের পটভূমিতে। অন্ধ কুসংস্কার আর অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সেই সঙ্গে অসার চিন্তাধারার অন্ত্যেষ্টি-সাধন করে মনকে বিজ্ঞানধর্মী, বিশ্লেষণবাদী, যুক্তিনিষ্ঠ, প্রগতিমুখীন এবং দুঃসাহসিক করে তোলার অনির্বাণ প্রেরণা এবং অভয়মন্ত্র-এ দেশের ছেলেমেয়েরা সর্বপ্রথম পেল তাঁরই কাছ থেকে। আমাদের কিশোর সাহিত্যের চেহারাটার পর্ণকুটীর থেকে রাজপ্রাসাদে রূপান্তর ঘটল তাঁরই হাত দিয়ে। ছোটদের রূপকথা শোনানোর পরিবর্তে অপরূপকথা শোনানোর প্রয়োজনীয়তা তিনিই উপলব্ধি করলেন সবার আগে।

বর্তমানে, তাঁর কালজয়ী রচনা সমগ্র খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করে চলেছেন এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী। একালের ছেলেয়েদের সামনে তাঁর রচনা নতুন করে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে আর তার উপযুক্ত সময়ও দুয়ার হতে দূরে নয়। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর মূল্য অনস্বীকার্য। সেই প্রেক্ষাপটে, এই বিদগ্ধ প্রকাশন সংস্থা এক মহৎ জাতীয় কর্তব্য সাধিত করলেন।

আমি সুনিশ্চিত, এই কারণেই রসিক সমাজের আন্তরিক অভিনন্দন এবং অকুণ্ঠ সাধুবাদ এঁদের উদ্দেশে নিবেদিত হবেই।

ফাল্গুন ৯ ॥ ১৩৯৩ **কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়**

সূচীপত্র

বর্তমান খণ্ডে 'জয়ন্তের কীর্তি', 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর' ও 'আধুনিক রবিন্‌হুড' বই তিনখানি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন 'দেব সাহিত্য কুটির' প্রকাশন সংস্থার অন্যতম কর্ণধার শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রকাশিকা

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

দশম

জয়ন্তের কীর্তি

রহস্যময় চুরি

সকালবেলা। শীতকাল। খিড়কির ছোট বাগানের একপাশে, একখানা ইজি-চেয়ারে শুয়ে জয়ন্ত একমনে বিলাতী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়ছে আর তার গায়ের উপর দিয়ে খেলা ক'রে যাচ্ছে, কাঁচা সোনার মতো কচি রোদের মিষ্টি হাসিটুকু।

এমন সময় মানিকলাল উর্ধ্বশ্বাসে সেখানে ছুটে এসে বললে, "জয়, জয়—"

জয়ন্ত বই থেকে মুখ তুলে বললে, "হয়েছে কি? অমন ক'রে ছুটে আসছ কোত্থেকে?"

—"মুকুন্দ নন্দীর গদী থেকে।"

—"কিন্তু ছুটে আসছ কেন? কেউ তোমাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে নাকি?"

ইজি-চেয়ারের হাতলের উপর ব'সে প'ড়ে মানিকলাল বললে, "হুঁঃ, আমাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করে, এ-অঞ্চলে এমন লোক তো কাউকে দেখি না! আমি তাড়াতাড়ি ছুটে আসছি তোমাকে একটা মস্ত খবর দেবার জন্যে। কাল মুকুন্দ নন্দীর গদীতে একটা রহস্যময় চুরি হয়ে গেছে!"

জয়ন্ত সিধে হয়ে ব'সে বললে, "রহস্যময় চুরি?"

—"হুঁ। এই দেখ খবরের কাগজ।"

—"তুমি প'ড়ে শোনাও।"

মানিকলাল খবরের কাগজ থেকে প'ড়ে শোনাতে লাগল:—

রহস্যময় চুরি

"গতকল্য গভীর রজনীতে বাগবাজারের শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল নন্দীর

গদীতে এক রহস্যময় চুরি হইয়া গিয়াছে। গদীর কার্য শেষ হইয়া যাইবার পর মুকুন্দবাবু যথারীতি হিসাব মিলাইয়া শয়ন করিতে যান। গদীতে সেদিন অনেক টাকার কাজ হইয়াছিল এবং সে টাকা লোহার সিন্দুকের ভিতরে তুলিয়া রাখা হইয়াছিল। সিন্দুকের পাশেই মুকুন্দ-বাবুর এক কর্মচারী শয়ন করিয়াছিল। গভীর রাত্রে হঠাৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কে তাহাকে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া জানালা দিয়া দ্বিতলের উপর হইতে নিম্নতলে নিক্ষেপ করে। ভাগ্যক্রমে জানালার নিচেই মেদি-পাতার ঝোপ ছিল, তাই তাহার উপরে পড়িয়া লোকটি অজ্ঞান হইয়া গেলেও তাহার আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। জ্ঞানোদয়ের পর তাহার আর্তনাদে গদীর আর সকলকার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাহার মুখ হইতে সমস্ত শুনিয়া মুকুন্দবাবু তখনি লোহার সিন্দুকের ঘরে যান। কিন্তু ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। তখন দ্বার ভাঙিয়া ফেলা হয়। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সকলে দেখেন যে, লোহার সিন্দুকের দরজা ভাঙা, —ভিতরে টাকাকড়ি কিছুই নাই। একটা জানালার চারিটা লোহার শিক দুম্‌ড়াইয়া কে বা কাহারা খুলিয়া ফেলিয়াছিল,—শিকগুলি বাড়ির বাহিরে জানালার ঠিক নিচেই পাওয়া গিয়াছে। চোরেরা যে এই ভাঙা জানালা দিয়াই ভিতরে ঢুকিয়া আবার বাহির হইয়া গিয়াছে, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মুকুন্দবাবুর প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা সিন্দুক হইতে অদৃশ্য হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিস জোর তদন্ত শুরু করিয়াছে।”

জয়ন্ত সমস্ত শুনে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল। তারপর বললে, “আচ্ছা মানিকলাল, মাস-তিনেক আগে ভবানীপুরের এক বড় জুয়েলারের দোকান থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার অলঙ্কার চুরি যায়, মনে আছে ?”

—“আছে। কিন্তু সে-চুরির সঙ্গে এ-চুরির সম্পর্ক কি ?”

—“সম্পর্ক হয়তো কিছুই নেই। কিন্তু সে-চুরির সঙ্গে এ-চুরির মিল আছে অনেকটা।”

—“হ্যাঁ, তা বটে। চোরেরা সেখানেও জানালার লোহার গরাদ

ভেঙে ভিতরে ঢুকেছিল আর লোহার সিন্দুকের কপাট ভেঙে গহনা নিয়ে পালিয়েছিল—ঠিক কথা।"

জয়ন্ত বললে, "কেবল তাই নয়, একজন দরওয়ানকে ধ'রে তুলে এমন আছাড় মেরেছিল যে, তার প্রাণ প্রায় যায় যায় হয়েছিল।"

মানিকলাল উৎসাহিত হয়ে বললে, "ঠিক, ঠিক! তুমি কি বল, সেই চোরের দলই কাল মুকুন্দ নন্দীর গদীতে এসে হানা দিয়েছে?"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "আমি এখন ও-সব কিছুই বলতে চাই না। আমি এখন খালি জানতে চাই যে, মুকুন্দ নন্দীর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে কি না?"

মানিকলাল বললে, "হ্যাঁ, অল্প-স্বল্প আলাপ-পরিচয় আছে বৈকি! মুকুন্দবাবু আমাকে তো চেনেনই, তোমারও খ্যাতি তাঁর অজানা নেই। এইমাত্র আমি যখন গদী থেকে আসি, তিনিও আমার সঙ্গে তোমার কাছে আসতে চাইছিলেন।"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চল, তাহ'লে আর দেরি ক'রে কাজ নেই, একবার গদীটা দেখেই আসি।"

বেনামা চিঠি

এইবার আগে জয়ন্ত আর মানিকলালের একটুখানি পরিচয় দেওয়া দরকার।

জয়ন্তের বয়স একুশ-বাইশের বেশি হবে না—তবে তার লম্বা-চওড়া চেহারার জন্যে বয়সের চাইতে তাকে অনেক বেশি বড় দেখায়। তার মতন দীর্ঘদেহ যুবক বাঙালী জাতির ভিতরে বড়-একটা দেখা যায় না—তার মাথার উচ্চতা ছয় ফুট চার ইঞ্চি। ভিড়ের ভিতরেও সে নিজেকে লুকোতে পারত না, সকলের মাথার উপরে জেগে থাকত তার মাথাই।

রীতিমত ডন-বৈঠক, কুস্তি, জিমনাষ্টিক ক'রে নিজের দেহখানিকেও সে তৈরি ক'রে তুলেছিল। বাঙালীদের ভিতরে সে একজন নিপুণ মুষ্টিযোদ্ধা ব'লে বিখ্যাত। আপাততঃ এক জাপানী মল্লের কাছ থেকে যুযুৎসুর কৌশল শিক্ষা করছে।

মানিকলাল বয়সে জয়ন্তের চেয়ে বছর তুই-এক ছোট হবে। নিয়মিত ব্যায়ামাদির দ্বারা যদিও তারও দেহ খুব বলিষ্ঠ, কিন্তু তার আকার সাধারণ বাঙালীরই মতন—ইচ্ছে করলেই সে আর-পাঁচজনের ভিতরে গিয়ে অনায়াসেই আপনাকে লুকিয়ে ফেলতে পারত।

জয়ন্ত ও মানিকলাল তুজনেই এক কলেজে পড়াশুনা করত—কিন্তু 'নন-কো-অপারেশন' আন্দোলনের ফলে তারা তুজনেই কলেজী পড়াশুনো ত্যাগ করেছিল। তারা তুজনেই পিতৃ-মাতৃহীন, কাজেই স্বাধীন। তুজনেরই কিছু কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে, কাজেই তাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ও নেই।

ছেলেবেলা থেকেই তাদের ভারি শখ, বিলাতী ডিটেক্‌টিভের গল্প পড়বার। এ-সব গল্প তারা একসঙ্গে ব'সেই পড়ত এবং গল্প শেষ হ'লে তাদের ভিতরে 'উত্তপ্ত' আলোচনা চলত। এড্‌গার অ্যালেন পো, গে-বোরিও, কন্যান ডইল ও মরিস লেব্‌লাঙ্ক প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের কাহিনী তো তারা একরকম হজম ক'রেই ফেলেছিল এবং হাতে সময় থাকলে অবিখ্যাত লেখকদেরও রচনাকে তারা অবহেলা করতে পারত না। কিন্তু তাদের কাছে উপাস্য দেবতার মতন ছিলেন কন্যাল ডইল সাহেবের দ্বারা সুপরিচিত ডিটেক্‌টিভ শার্লক হোমস।

একটি বোতাম, এক টুকরো কাগজ বা একটা ভাঙা চুরোটের পাইপের মতন তুচ্ছ জিনিস দেখে শার্লক হোমস বড় বড় চুরির বা খুনের আসামীকে ধ'রে ফেলতে পারতেন, জয়ন্ত ও মানিকলাল রুদ্ধশ্বাসে তাঁর সেই বাহাতুরির কথা পাঠ করত এবং ব'সে ব'সে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখত, তারাও যেন গোয়েন্দা হয়ে শার্লক হোমসের মতন তুচ্ছ সূত্র ধ'রে বড় বড় চুরি-রাহাজানি-খুনের কিনারা ক'রে ফেলে লোকের চোখে তাগ

লাগিয়ে দিচ্ছে!

এইভাবে আলোচনা করতে করতে ক্রমে তাদের পর্যবেক্ষণশক্তি এতটা বেড়ে উঠল যে, পাড়ার কয়েকটা ছোটখাটো চুরির আসামীকে পুলিসের আগেই ধ'রে ফেলে সত্য-সত্যই সবাইকে অবাক ক'রে দিলে। তারপর একটা শক্ত খুনের 'কেসে' তারা খুবই নামজাদা হয়ে পড়ল। পুলিস যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল, সেই সময়েই 'কেস'টা হাতে নিয়ে জয়ন্ত হপ্তাখানেকের ভিতরে খুনীকে ধ'রে পুলিসের কবলে সমর্পণ করেছিল।...এই রকম আরো চার-পাঁচটা জটিল চুরি ও খুনের রহস্য ভেদ ক'রে জয়ন্ত ও মানিকলালের নাম এখন চারিদিকেই সুপরিচিত।

জয়ন্ত ও মানিকলাল এসেছে শুনে মুকুন্দবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তাদের খুব আদর ক'রে গদীর ভিতরে নিয়ে গেলেন।

জয়ন্ত বললে, "আমাদের একেবারে চুরির ঘরে নিয়ে চলুন। আমি বাজে কথায় সময় নষ্ট করতে চাই না।"

যে-ঘরে চুরি হয়েছিল সে-ঘরে ঢুকে জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলে। ভাঙা লোহার সিন্দুকটা পরীক্ষা ক'রে বললে, "আচ্ছা, এই সিন্দুক ভাঙার শব্দেও আপনাদের ঘুম ভেঙে যায় নি?"

মুকুন্দবাবু বললেন, "আমার ঘুম খুব সজাগ আর আমি পাশের ঘরেই থাকি। অথচ শুনলে আপনি অবাক হবেন যে, কাল আমার ঘুম ভাঙে নি!"

—"আপনার যে কর্মচারী আহত হয়েছেন, তিনি এখন কোথায়?"

—"হাসপাতালে!"

—"কারা তাঁকে আক্রমণ করেছিল, সে-বিষয়ে তিনি কিছু বলেছেন?"

—"সে বিশেষ কিছুই বলতে পারে নি, কারণ, অন্ধকারে সে কারুকেই দেখতে পায় নি। তবে যখন তাকে জানালা গলিয়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল, তখন সে চকিতের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল যে, নিচে চার-পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।"

—"হুঁ" ব'লে জয়ন্ত একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। সে জানালায় আগে ছয়টা লোহার শিক ছিল, এখন মাত্র দুইটা অবশিষ্ট আছে। জয়ন্ত একটা শিক ধ'রে টেনে বুঝল, এ-রকম চার-চারটে শিক দুমড়ে খুলে ফেলা বড় সামান্য শক্তির কাজ নয়। হঠাৎ সেই শিকের এক জায়গায় তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। শিকটার লোহার গায়ে একটু চিড় খেয়েছে, এবং সেইখানেই একগোছা কটা চুল বা লোম আটকে রয়েছে। জয়ন্ত সাবধানে ও সযত্নে সেই চুলের গোছা টেনে নিয়ে একখানা কাগজে মুড়ে পকেটের ভিতরে রাখলে এবং একটি শামুকের নস্যদানী থেকে এক টিপ নস্য নিয়ে নাকের ভিতরে গুঁজে দিলে।

মানিকলাল জানত, জয়ন্ত যখনি মনে মনে কোন কারণে খুশি হয়ে ওঠে, তখন এক টিপ নস্য না নিয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু আপাততঃ তার খুশি হবার কোন কারণ আবিষ্কার করতে না পেরে, এগিয়ে এসে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপার কি ?"

জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, "একটা ভাল সূত্র পেয়েছি। বৈকালে বলব।"

মুকুন্দবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "ওকি জয়ন্তবাবু, এখনি চললেন যে ?"

জয়ন্ত বললে, "আমার যা জানবার তা জেনেছি। নতুন কিছু ঘটনা ঘটলে আমাকে তখনি জানাবেন।"

মুকুন্দবাবু বললেন, "অবশ্যই তা জানাব। জয়ন্তবাবু, আপনার শক্তির কথা আগেই শুনেছি। দেখবেন, আমাকে যেন ভুলবেন না। পুলিসের চেয়ে আমি আপনাকে বেশি বিশ্বাস করি। পুলিস ঘুষ খায়, আপনি খাঁটি লোক।"

জয়ন্ত ফিরে রুক্ষস্বরে বললে, "আমি খাঁটি লোক, আপনি তা জানলেন কি ক'রে ? মিছে তোষামোদ আমি ভালবাসি না।"

রাস্তায় এসে জয়ন্ত বললে, "মানিকলাল, বাড়িতে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম ক'রেই আবার আমার সঙ্গে দেখা কোরো"—ব'লেই সে হন্‌হন্ ক'রে এগিয়ে গেল।

মানিকলাল নিজের বাড়ির পথ ধ'রে অগ্রসর হ'ল। যখন সে প্রায় বাড়ির কাছে এসে পড়েছে, হঠাৎ একজন লোক পিছন থেকে তার নাম ধ'রে ডাকলে।

মানিকলাল ফিরে দেখলে, কিন্তু তাকে চিনতে পারলে না।

লোকটা বললে, "আপনারই নাম তো মানিকবাবু?"

মানিকলাল ঘাড় নেড়ে জানালে, "হ্যাঁ।"

—"আপনার নামে একখানা চিঠি আছে, এই নিন।"

মানিকলাল হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিলে। খাম ছিঁড়ে চিঠি বার ক'রে পড়লে :—

"মানিকবাবু; আমাদের চোখ সর্বত্র। মুকুন্দ নন্দীর গদীতে চুরি হইয়াছে তো আপনাদের কি? যদি প্রাণের মায়া রাখেন, এ-ব্যাপার থেকে সরিয়া দাঁড়ান। নহিলে, মৃত্যু অনিবার্য।"

পত্রে লেখকের নাম নেই।

পত্র থেকে দৃষ্টি তুলে মানিকলাল দেখলে, যে চিঠি নিয়ে এসেছিল

সে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে।

মানিকলালের আর নিজের বাড়িতে যাওয়া হ'ল না, সে আবার জয়ন্তের বাড়ির দিকে ছুটল।

দুই হাতের উপর মুখ রেখে জয়ন্ত চুপ ক'রে টেবিলের সামনে ব'সে ছিল।

মানিকলাল ঘরে ঢুকেই চিঠিখানা টেবিলের উপরে ফেলে দিয়ে বললে, "জয়, আর এক নতুন কাণ্ড!"

জয়ন্ত একটুও নড়ল না, চিঠির দিকে তাকিয়েও দেখলে না। সহজ ভাবেই বললে, "চিঠিতে কি লেখা আছে আমি তা জানি।"

—"জানো?"

—"হ্যাঁ। আমিও এখনি ঐ-রকম একখানা চিঠি পেয়েছি।"

একটি বেশি-খুশি মনুষ্য

মানিকলাল সবিস্ময়ে বললে, "তুমিও এইরকম একখানি চিঠি পেয়েছ?"

—"হ্যাঁ।"

—"যে চিঠি দিয়েছে তাকে ধরতে পারো নি?"

—"না। কিন্তু তার চেহারা দেখে নিয়েছি, তাকে আবার দেখলেই চিনতে পারব। তবে আমার বিশ্বাস চিঠি সে লেখে নি, সে পত্রবাহক ছাড়া আর কেউ নয়।"

—"তোমার এ বিশ্বাসের কারণ কি?"

—"কারণ, চিঠিখানা এরই মধ্যে আমি কিছু কিছু পরীক্ষা ক'রে দেখেছি।"—এই ব'লে জয়ন্ত টেবিলের উপর থেকে মানিকলালের চিঠিখানাও তুলে নিলে, তারপর হঠাৎ উঠে পাশের ঘরে চ'লে গেল।

পাশের ঘরটি হচ্ছে জয়ন্তের পরীক্ষাগার। মানিকলাল বুঝলে, তার

চিঠিখানা ভাল ক'রে পরীক্ষা করবার জন্যেই জয়ন্ত ও-ঘরে গেল। সে চুপ ক'রে ব'সে আজকের ঘটনাগুলো নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল—কিন্তু কোন সূত্রই আবিষ্কার করতে পারলে না।

খানিকক্ষণ পরেই জয়ন্ত পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অন্যমনস্ক ভাবে যেন নিজের মনেই বললে, "না, কোন সন্দেহ নেই—কোন সন্দেহ নেই!"

মানিক বললে, "তোমার কথার অর্থ কি জয়?"

জয়ন্ত চেয়ারের উপরে ব'সে প'ড়ে এক টিপ নস্য নিয়ে বললে, "এই চিঠি দু'খানা যে লিখেছে, তার সম্বন্ধে কতকগুলি দরকারী কথা, আমি জানতে পেরেছি।"

—"যথা?"

—"শোনো। পত্রলেখক বাঁ-হাতে চিঠি লিখেছে। যাঁরা হাতের লেখা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তাঁরা সকলেই জানেন, ডান-হাতের আর বাঁ-হাতের লেখার ছাঁদ হয় আলাদা রকম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পত্রলেখক বাঁ-হাত ব্যবহার করেছে কেন? তুমি হয়তো মনে করবে, সে তার ডান-হাতের লেখা লুকোবার জন্যেই বাঁ-হাতে লিখে আমাদের ফাঁকি দিতে চেয়েছে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে অনভ্যাসের জন্যে বাঁ-হাতের লেখা এতটা পাকা হ'ত না। সুতরাং তার বাঁ-হাতে চিঠি লেখবার তিনটি কারণ থাকতে পারে। এক: কারুর কারুর মতন সে হয়তো দুই হাতেই চিঠি লিখতে পারে। দুই: কারুর কারুর মতন তার হয়তো ডান-হাতের চেয়ে বাঁ-হাতই ভাল চলে। তিন: হয়তো তার ডান-হাত নেই বা থাকলেও অকর্মণ্য, কাজেই তাকে বাঁ-হাতে লেখার অভ্যাস করতে হয়েছে।"

মানিকলাল বললে, "আর কিছু জানতে পেরেছ?"

জয়ন্ত বললে, "পেরেছি বৈকি। ভাল ক'রে লক্ষ্য করবার সময় পেলে তুমিও বুঝতে পারতে যে, পত্রলেখক ফাউন্টেন পেনে, সবুজ কালিতে লেখে। খাম আর চিঠির কাগজ কিরকম পুরু আর দামী

দেখেছ তো ? সাধারণ লোক চিঠি লেখার জন্যে এত অর্থ ব্যয় করে না, আবার অনেক ধনী লোকেও করে না ; সুতরাং পত্রলেখক কেবল ধনী নয়, বিলাসীও। এই চিঠি লিখে সে মস্ত ভ্রম করেছে, আমাদের অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছে। আমরা বুঝতে পারছি : সে বাঙালী, ধনী, বিলাসী আর বাঁ-হাতে লেখে। অপরাধীকে ধরবার জন্যে আমাদের আর কলকাতার নানান জাতের লোকের পিছু নিতে হবে না।"

মানিকলাল বললে, "কিন্তু কলকাতায় বাঙালীর সংখ্যাও তো কম নয় !"

জয়ন্ত টেবিলের উপরে নস্যদানীটা ঠুকতে ঠুকতে বললে, "মানিক, আমি আরো কিছু কিছু দরকারী কথা জানতে পেরেছি। অপরাধী যদি ইউরোপের লোক হ'ত তাহ'লে কখনো চিঠি লিখে আমাদের এমন ক'রে শাসাতে সাহস করত না। ইউরোপের পুলিসকে বিজ্ঞান এখন শাসন করে। চোর-ডাকাত-খুনীদের বিরুদ্ধে সেখানকার পুলিস এখন বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে ব'সে প্রমাণ সংগ্রহ করে। অপরাধীদের ব্যবহৃত ছোটখাটো কোন জিনিস দেখেও অনেক রহস্য ধ'রে ফেলা যায়। পত্রলেখক আমাকে চেনে, কিন্তু আমারও যে কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার আছে এটা জানলে সে চিঠি লেখবার সময় আরো-বেশি সাবধান হ'ত। মানিক, পত্রলেখক হচ্ছে—হয় রাসায়নিক, নয় তার টেবিলের উপরে নানারকম রাসায়নিক চূর্ণ ছড়ানো থাকে।"

—"তাই নাকি, তাই নাকি ?"

—"হ্যাঁ। আমি খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলুম, চিঠির খামের পিছনদিকে তিন-চার রকম রাসায়নিক চূর্ণ লেগে রয়েছে—সাদা চোখে তা দেখা যায় না। খুব সম্ভব, পত্রলেখক জল দিয়ে খাম এঁটে সেখানাকে টেবিলের উপরে চেপে ধরেছিল—লোকে প্রায়ই যা ক'রে থাকে। সাদা চোখে অদৃশ্য ঐ সব রাসায়নিক চূর্ণ তার টেবিলের উপরে ছড়ানো ছিল,—তারই কিছু কিছু খামের গায়ে লেগে গিয়েছে।"

মানিকলাল চমৎকৃত হয়ে বললে, "এ যে আলিবাবার গল্পের কুন্‌কের সঙ্গে মোহর উঠে আসার মতো হ'ল।"

—"হ্যাঁ, প্রায় সেই রকমই বটে। এখন বুঝে দেখ, কোন সাধারণ লোকের টেবিলেই নানারকম রাসায়নিক চূর্ণ ছড়ানো থাকে না। সুতরাং আমাদের এই প্রেরক যে 'কেমিস্ট্রি' নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানিক, সে বাঁ-হাতে ফাউন্টেন পেনে সবুজ কালিতে লেখে আর আমাদের কার্যকলাপ সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে।"

মানিকলাল বললে, "তাহ'লে এটাও বুঝতে হবে যে, সে আমাদেরও নাগালের বাইরে নেই।"

জয়ন্ত বললে, "এই চিঠি দুখানিই সে-প্রমাণও দিচ্ছে।"

মানিকলাল হাসতে হাসতে বললে, "এইবারে আমার মাথাও একটু একটু ক'রে খুলছে। মুকুন্দ নন্দীর গদীতে আমরা বেশিক্ষণ ছিলুম না। কিন্তু আমরা বাড়ি আসবার পথেই এই চিঠি দুখানা পেয়েছি। পত্রলেখক নিশ্চয়ই খুব কাছেই ছিল।"

জয়ন্ত বললে, "খুব কাছে—হ্যাঁ, কাছের এক বাড়িতে।"

মানিকলাল বললে, "বাড়িতে?"

—"নিশ্চয়! বাড়ির নামে তুমি যখন সন্দেহ করছ, তখন তোমার বুদ্ধি খুলতে এখনো দেরি আছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা গাড়িতে ব'সে চিঠি লিখলে খামের পিছনে ঐ রাসায়নিক গুঁড়োগুলো উঠে আসত কি?"

মানিক উৎসাহ-ভরে ব'লে উঠল, "ঠিক, ঠিক, ঠিক! অপরাধী তাহ'লে বাগবাজারেই থাকে, তাকে গ্রেপ্তার করা শক্ত হবে না!"

জয়ন্ত গম্ভীর ভাবে বললে, "এত সহজেই উৎসাহিত হয়ো না মানিক! চারে মাছ থাকলেই সে যে ডাঙায় উঠবে, এমন কোন কথা নেই। আমি কেবল এইটুকু বলতে পারি যে, অপরাধী চিঠি লিখে অন্ধকার অনেকটা পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে। কিন্তু ও-কথা এখন থাক, আমার আর-একটা আবিষ্কারের কথা শোনো। দেখ দেখি, এটা কি? এই ব'লে সে টেবিলের উপর থেকে ছোট্ট একটি কাগজের মোড়ক তুলে

মানিকের দিকে এগিয়ে দিলে।

মোড়ক খুলে মানিক দেখলে, এক টুকরো শুকনো মাটি।

জয়ন্ত বললে, "কিছু বুঝতে পারছ?"

মানিক বললে, "দেখে মনে হচ্ছে, গঙ্গামাটি।"

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, "ঠিক বলেছ। মুকুন্দ নন্দীর গদীর যে-জানালার গরাদ ভেঙে চোরেরা ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল, সেই জানালায় এই মাটিটুকু লেগে ছিল—ভিতর-দিকে নয়, বাইরের দিকে। অমন জায়গায় গঙ্গামাটি থাকার কারণ কি? খুব সম্ভব, চোরদের কারুর পায়ে তা ছিল, ঘরে ঢোকবার সময়ে জানালার গায়ে লেগে গিয়েছে।"

মানিক অল্পক্ষণ ভেবে বললে, "মুকুন্দ নন্দীর গদী বাগবাজারের অন্নপূর্ণা-ঘাট থেকে বেশি দূরে নয়। তবে কি চোরেরা গঙ্গার দিক থেকে এসেছে?"

—"সবাই এসেছে কিনা জানি না, তবে একজন যে এসেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।"...জয়ন্ত হঠাৎ চমকে উঠে সামনের জানালা দিয়ে পথের দিকে তাকালে, তারপর বললে, "মানিক, ঐ দেখ, যে আমাকে চিঠি দিয়ে গেছে, সে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছে!"

মানিক তাড়াতাড়ি ঝুঁকে প'ড়ে দেখলে, একজন ময়লা কাপড়পরা নিম্নশ্রেণীর লোক রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। সে উত্তেজিত স্বরে বললে, "আমারও যেন মনে হচ্ছে ঐ লোকটাই আমাকে চিঠি দিয়ে গেছে!"

জয়ন্ত বললে, "মানিক, ওকে এখানে ডেকে আনতে পারো?"

—"যদি না আসে?"

—"জোর ক'রে ধ'রে আনবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, গায়ের জোরের দরকার হবে না। ও-লোকটা বোধ হয় চোরদের দলের লোক নয়, দেখছ না ওর ভাবভঙ্গি কেমন নিশ্চিন্ত!"

জয়ন্তের কথাই সত্য। মানিক গিয়ে ডাকবামাত্রই লোকটা তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতরে এল বিনা আপত্তিতে। জয়ন্ত শুধোলে, "তুমি

কোথায় থাকো ?"

—"কুমোরটুলীতে।"

—"কি কর ?"

—"চায়ের দোকানে চাকরি করি, খাই-দাই আর বেড়িয়ে বেড়াই।"

—"বেশ, বেশ, তা'হলে তুমি তো দেখছি বেশ খুশিতে আছ।"

—"তা আর থাকব না মোশয়! আমি কারুর কোন ধার ধারি না, —একটা বই পেট নয়, ভাবনা-চিন্তে কিছুই নেই! তার ওপরে আজকে আবার বেশি-খুশিতে আছি।"

—"বেশি-খুশিতে আছ! কেন বল দেখি ?"

—"তা যেন বলছি, কিন্তু আপনারা এত কথা জানতে চাইছেন কেন ?"

"তোমাকে আরো-বেশি খুশি করব ব'লে। তুমি নগদ একটাকা রোজগার করবে ?"

—"কে দেবে ?"

—"আমি!"

—"আমায় কি করতে হবে ?"

—"আগে তোমার এত খুশির কারণ শুনি, তারপর বলব।"

—"তবে শুনুন মোশয়! আজ সকালে গঙ্গার ধার থেকে বেড়িয়ে ফিরছি, হঠাৎ এক বাবু এসে আমাকে বললে, 'ঐ যে দুজন লোক দুদিকে চ'লে যাচ্ছে ওদের একজনের নাম জয়ন্ত, আর একজনের নাম মানিক। ওদের এই চিঠি এক-একখানা দিয়ে যদি ছুটে পালিয়ে আসতে পারিস, তা'হলে নগদ একটাকা বকশিশ পাবি।"

"আমি তখনি রাজী হয়ে গেলুম, এ আর—"

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, "বুঝেছি, আর বলতে হবে না। এখন আমার কথা শোনো। সেই বাবুটিকে কেমন দেখতে, তোমার মনে আছে কি ?" সে বুঝলে, এই বেশি-খুশি লোকটি আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাদের কারুকেই চিনতে পারে নি।

লোকটা বললে, "খুব খুঁটিয়ে বলতে পারব না মোশয়! তবে তার রঙ কালো নয় আর দেহ খুব লম্বা-চওড়া, আর,—"

—"আর? থামলে কেন, বল না।"

—"বাবুটি যখন আমাকে টাকা দেয় তখন আমি দেখেছিলুম, তার ডান-হাতের বুড়ো আঙুলটা নেই!"

মানিক সচমকে জয়ন্তের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। কিন্তু জয়ন্তের মুখ স্থির।

লোকটা বললে, "এখন আমাকে কি করতে হবে মোশয়?

জয়ন্ত পকেট থেকে একটা টাকা বার ক'রে লোকটার হাতে দিয়ে বললে, "তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, তুমি এখন যাও।"

লোকটা অবাক হয়ে খানিকক্ষণ জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইল, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, "বোম মহাদেব! মা লক্ষ্মী দেখছি আজ টাকা বৃষ্টি করছেন।"

জয়ন্ত বললে, "শুনলে মানিক, তার ডান-হাতের বুড়ো আঙুল নেই! কাজেই তাকে বাঁ-হাতে চিঠি লেখা অভ্যাস করতে হয়েছে!"

মানিক অভিভূত স্বরে বললে, "জয়, জয়, তুমি কি যাদুকর?"

জয়ন্ত বললে, "মানিক, ভগবান সবাইকে চোখ দিয়েছেন, কিন্তু সবাইকে সমান দেখবার ক্ষমতা দেন নি। যেমন, সকলেই লিখতে পারলেও সকলেই কবিতা লিখতে পারে না, তেমনি সকলেই দেখতে পেলেও সকলেই আসল জিনিসটুকু দেখতে পায় না। আমি যাদুকর নই ভাই, আমি তোমার বন্ধু!"—এই ব'লে সে খুব বড় এক টিপ নস্য নাকের গর্তে গুঁজে দিল।

ধুলো-হাওয়া-ভক্ষণ

বৈকালবেলায় মানিক যখন আবার জয়ন্তের কাছে ফিরে এল তখন দেখলে, সে ইজি-চেয়ারে চোখ মুদে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে।

মানিক শুধোলে, "এখনো তোমার ঘুম ভাঙে নি নাকি? বেলা যে প'ড়ে এল!"

চোখ না খুলেই জয়ন্ত বললে, "বীরপুরুষ, তুমি সজাগ আছ দেখে আমার সাহস বাড়ল। চোখ মুদলেই মানুষ যে ঘুমোয়, তোমাকে এ শিক্ষা কে দিলে?"

মানিক বললে, "মানুষ ঘুমোলেই চোখ মোদে।"

জয়ন্ত বললে, "মানুষ যখন দাঁড়িয়ে থাকে, তখন সে ব'সে থাকে না। কিন্তু মানুষ যখন দাঁড়িয়ে থাকে না, তখন সে বসতেও পারে, শুতেও পারে, দৌড়োতেও পারে। মানুষ যখন চোখ মুদে থাকে, তখন সে ঘুমোতেও পারে কিংবা জেগে চিন্তা করতেও পারে।"

—"তাহ'লে তুমি চিন্তা করছিলে?"

জয়ন্ত চোখ খুলে বললে, "হ্যাঁ, গভীর চিন্তা! মুকুন্দ নন্দীর গদীর চোরেরা যে পথ দিয়ে শুভাগমন করেছে, আমার মন সেই পথে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।"

—"তাহ'লে পথ চিনতে পেরেছ?"

—"হয়তো পেরেছি, হয়তো পারি নি। চল, একটু গঙ্গার ধারে গিয়ে জোলো হাওয়া আর পথের ধুলো খেয়ে আসি।"—ব'লেই জয়ন্ত জামা পরতে লাগল।

জয়ন্তের জোলো হাওয়া আর পথের ধুলো খাবার আগ্রহ মানিক আর কোনদিন দেখে নি। সুতরাং সে আন্দাজ ক'রে নিলে তার অন্ত

কোন উদ্দেশ্য আছে।

দুজনে মিনিট-পনেরো গঙ্গার ধারে এদিক-ওদিক ক'রে বেড়ালে। তারপর অন্নপূর্ণা ঘাটের কাছে এসে জয়ন্ত বললে, "ধুলো আর হাওয়া খেয়ে পেট ভ'রে গিয়েছে। এখন এইখানে একটু ব'সে ব'সে গঙ্গার ঢেউ গোণা যাক।"

দুজনে গঙ্গার ধারে ব'সে পড়ল। সেখানটায় পাশাপাশি খড়ের নৌকোর পরে খড়ের নৌকো সাজানো রয়েছে, খড়বোঝাই প্রত্যেক নৌকোকে এক একখানা কুঁড়ে-ঘরের মতন দেখাচ্ছে—হঠাৎ তাকালে মনে হয়, গঙ্গার বুকে যেন এক ভাসন্ত পল্লীগ্রাম বিরাজ করছে! এ-জায়গাটা খালি অন্নপূর্ণা-ঘাট নয়, খোড়ো-ঘাট বা বিচিলি-ঘাট নামেও পরিচিত—প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত খড়ের দালাল, মুটে-মজুর, গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ও মাঝি-মাল্লাদের হৈ-চৈ আর গণ্ডগোলে এখানে কেউ কান পাততে পারে না।

এখন সে-সব গোলমাল আর নেই। বাঁধানো পাড়ের উপরে ব'সে পাঁচ-ছজন দাঁড়ী ও মাঝি গল্পগুজব করছিল, জয়ন্ত খুব সহজেই তাদের ভিতর গিয়ে আলাপ জমিয়ে ফেললে।

কথায় কথায় জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা ভাই, ঘাটের ঠিক গায়েই ঐ যে খড়ের নৌকোখানা রয়েছে, ওখানা কার?"

একজন বললে, "আমার, বাবু।"

খানিকক্ষণ জয়ন্ত তাদের আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। মানিকের দিকে ফিরে বললে, "মানিক, বয়ার কাছে একখানা বড় বজরা বাঁধা রয়েছে, দেখেছ?"

বজরাখানা ইতিমধ্যেই মানিকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল; এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কারণ হচ্ছে, এত বড় ও এমন সুন্দর চিত্রবিচিত্র শৌখিন বজরা গঙ্গার বুকে আজকাল বড় একটা দেখা যায় না।

বজরাখানা তারা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে দেখে একজন মাঝি বললে, "বাবু, ও বজরাখানা কাল বিকাল থেকে এই ঘাটেই বাঁধা ছিল।

আজ তুপুরে ওখানাকে বয়ার কাছে নিয়ে গেছে।"

জয়ন্ত বললে, "চমৎকার বজরা! ওখানা কার তা জানো?"

—"না বাবু। ওরকম বজরা আমি এখানে আর কখনো দেখি নি। তবে বজরার ভিতরে তিন-চারজন বাঙালীবাবু আর একজন হাবসী লোককে আমি দেখেছি।"

জয়ন্ত অকারণেই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ব'লে উঠল, "ঠিক দেখেছ? হাবসী?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, হাবসী!" মাথায় বেজায় উঁচু, দেহ যেন লোহা দিয়ে তৈরি, গায়ের রঙ কয়লার মতো,—উঃ, দেখলেই ভয় হয়।"

জয়ন্ত নস্যদানী বার ক'রে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল।

মাঝিদের দলের একটা লোক আর-একজনকে ডেকে বললে, "ছাখ ভাই ছিহু! ঐ বজরার লোকগুলো বোধ হয় কাল সারা রাত ঘুমোয় নি।"

ছিহু বললে, "কেমন ক'রে জানলি তুই?"

—"আমারও যে কাল রাতে ঘুম হয় নি! ঐ বজরার লোকগুলো কাল রাতে তিন-চারবার ডাঙায় নেমেছিল।"

জয়ন্ত বললে, "ওঠ মানিক, এইবারে আরো তু-চার পা বেড়িয়ে বাড়ি ফেরা যাক।"

তুজনে কাশী মিত্তিরের ঘাটের দিকে অগ্রসর হ'ল।

জয়ন্ত হঠাৎ মাঝের আর-একটা ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে বললে, "একখানা পানসি নিয়ে জলবিহারে রাজী আছ?"

মানিক হেসে ফেলে বললে, "বুঝেছি হে, বুঝেছি! ঐ বজরার কাছে না গিয়ে তুমি আর থাকতে পারছ না।"

জয়ন্তও হেসে বললে, "তুমি দেখছি অন্তর্যামী হয়ে উঠেছ!"

তখনি একখানা পানসি ভাড়া করা হ'ল, মাঝি শুধোলে, "কোন-দিকে যাব বাবুজী?"

—"ঐ বজরার কাছ দিয়ে এগিয়ে চল।"

তুজনে প্রথমটা বজরার দিকে তাকিয়ে নীরবে ব'সে রইল। তারপর

মানিক বললে, "মাঝিদের মুখে যা শুনলুম, বজরার লোকগুলোর ব্যবহার সন্দেহজনক ব'লেই মনে হচ্ছে। ও-রকম বজরা কোথা থেকে এখানে এল, আর কেনই বা এই ঘাটে এসে লেগেছিল? কাল সারারাত বার বার ওরা ঘাটে নেমেছিল কি কারণে? মুকুন্দ নন্দীর গদী এখান থেকে বেশি দূরে নয়, কাল সেখানে চুরি হয়ে গেছে!"

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে বললে, "হুঁ, আর বজরায় একজন হাবসী আছে।"

—"যদিও বাঙালীর সঙ্গে হাবসী-জাতের লোক বড়-একটা দেখা যায় না, তবু তার নামেই একটু আগে তুমি এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে কেন?"

—"তোমার মনে আছে মানিক, মুকুন্দ নন্দীর গদীর জানালায় গরাদের উপরে কয়েকগাছা চুল আমি পেয়েছি? সে চুল আমি অণুবীক্ষণে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। চুলগুলো এমন কোঁকড়ানো আর পুরু যে, কাফ্রী-জাতের লোকের মাথার চুল না হয়ে যায় না!"

মানিকও অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "বল কি জয়! এত বড় প্রমাণ তুমি পেয়েছ?"

—"প্রমাণটা এতক্ষণ খুব বড় ছিল না, বরং এই চুলগুলো ব্যাপারটাকে আরো-বেশি রহস্যময় ক'রে তুলেছিল। বাংলাদেশে বাঙালীর গদীতে হাবসীর মাথার চুল অস্বাভাবিক নয় কি? এই চুলগুলোর জন্যে সমস্ত ব্যাপারটা গুলিয়ে যাচ্ছিল, মাঝিদের কথায় এতক্ষণে সব স্পষ্ট হয়ে গেল।"—বলতে বলতে গঙ্গাতীরের দিকে চেয়ে জয়ন্ত হঠাৎ চমকে উঠে থেমে পড়ল।

মানিকও সেইদিকে তাকিয়ে দেখলে, গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে একজন লোক একটা লাল নিশান নিয়ে ঘন ঘন নাড়ছে।

জয়ন্ত বললে, "মানিক, ও-লোকটা বজরার লোকদের সঙ্কেতে কিছু জানাচ্ছে!"

মানিক বললে, "বোধ হয় আমরা ওদিকে যাচ্ছি সেই খবরই দিচ্ছে।"

জয়ন্ত বললে, "খুব সম্ভব তাই। মানিক, একবার যদি ঐ বজরায় গিয়ে উঠতে পারি!"

পানসি তখন বজরার খুব কাছে এসে পড়েছে। জয়ন্ত ও মানিক দেখলে, বজরার ছাদের উপর প্রকাণ্ড আকারের একটা লোক মস্তবড় এক পাথরের মূর্তির মতো স্থির ভাবে ব'সে আছে—তার লক্ষ্যও স্থির হয়ে আছে যে-পানসি এগিয়ে আসছে তার দিকে।

জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, "মানিক, রিভলবারটা আনতে ভোলো নি তো?"

মানিক বললে, "না।"

কালো আঁধারে, কালো ঝড়ে, কালো গঙ্গায়

সূর্য তখন অস্ত গেছে,—পশ্চিমের ভাঙা ভাঙা মেঘের গায়ে আলোময় আলতার ছোপ-মাখিয়ে। আকাশ থেকে আলতা-আলো ঝরে প'ড়ে গঙ্গাজলকেও রঙিন ক'রে তুলেছে—সে জল যেন পিচকারিতে ভ'রে নিলে অনায়াসেই হোলিখেলা করা চলে!

বজরাখানা ভাল ক'রে দেখবার মতোই বটে। দোতলা বজরা—তাকে ছোটখাটো একখানা ভাসন্ত বাড়ি বলাও চলে। দেওয়ালগুলো লাল রঙের ও জানলা-দরজাগুলোর রঙ সবুজ। ছাদগুলো চকচকে পিতলের রেলিং দিয়ে ঘেরা। মাঝে মাঝে রঙিন টবে চারা বসিয়ে বাগান রচনারও চেষ্টা করা হয়েছে। সেইসব চারার থোলো থোলো নানারঙা ফুল ফুটে বজরাখানাকে দেখতে আরো সুন্দর ক'রে তুলেছে।

বজরার একতলায় ছাদের উপরে ব'সে সেই পাথরের মতো স্থির মস্ত মূর্তিটা তখনো নিষ্পলক চোখে পানসির গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। বজরার আর কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

পানসি এগিয়ে যাচ্ছিল, জয়ন্ত হঠাৎ চেঁচিয়ে বললে, "মাঝি, নৌকোখানা বজরার চারদিকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে চল! চমৎকার বজরা! আমি আরো ভাল ক'রে দেখতে চাই!"

জয়ন্তের কথা বজরার উপরকার সেই মূর্তিটা শুনতে পেলে। আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়ালো। একেবারে ধারে এসে, পিতলের রেলিঙের উপরে ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বললে, "আপনারা আমার বজরা দেখতে চান? বেশ তো, বজরার উপরেই আসুন না, বাইরে থেকে দেখবেন কেন?"

লোকটার গলার আওয়াজ কি গম্ভীর! এমন অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বর শোনাই যায় না!

জয়ন্তের দিকে ফিরে মানিক চুপিচুপি বললে, "ওহে, লোকটা আবার আমাদের ডাকে যে! এখন কি করবে?"

জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, "আমরা বজরায় উঠলে আপনি তাহ'লে রাগ করবেন না?"

—"রাগ? রাগ করব কেন? আপনাদের মতো আরো অনেকেই আমার বজরা দেখতে আসেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য!"—ব'লেই সে ফিরে ডাকলে, "ওরে, কে আছিস রে!"

একটা জোয়ান পশ্চিমী লোক ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সেলাম করলে।

লোকটা বললে, "বাবুদের ওপরে তুলে নে! সব ঘর ভাল ক'রে ছাখা।"

বজরার উপরে উঠে জয়ন্ত ও মানিক বুঝলে, এ একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার বটে! বজরার মালিকের শখও আছে, টাকাও আছে! এর কামরার যে-সব ছবি, পোর্সিলেনের আসবাব, সোফা, কৌচ, 'ডাইনিং টেবিল' ও কার্পেট প্রভৃতি চোখে পড়ে, অনেক নামজাদা ধনীর বাড়িতেও তার তুলনা মেলে না।

একতলার একটা ঘরে ব'সে কয়েকজন পশ্চিমী লোক গল্পগুজব

করছিল। জয়ন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের কারুর ভিতর থেকে সন্দেহজনক কোন-কিছু আবিষ্কার করতে পারলে না।

দোতলার একটা ঘরে ঢুকে দেখা গেল, যার আমন্ত্রণে তারা বজরায় এসেছে, সেই লোকটি টেবিলের সামনে একখানা চেয়ারে চুপ ক'রে ব'সে আছে।

"—এই যে, আসুন! সব কামরা দেখা হ'ল? কেমন দেখলেন?"

জয়ন্ত বললে, "চমৎকার। আজকাল এ-রকম বজরা চোখেই পড়ে না। বজরার মালিক বোধ হয় আপনিই?"

—"হ্যাঁ। এখনকার বাবুদের শখ হচ্ছে 'লঞ্চ' আর 'মোটরবোট' কেনা। আমি ও-সব কল-কব্জার জিনিস দু-চক্ষে দেখতে পারি না। একটা কল বিগড়োলেই সব অচল!"

জয়ন্ত লোকটাকে ভাল ক'রে দেখতে লাগল। লোকটির বয়স হবে বছর চল্লিশ। রঙ উজ্জ্বল-শ্যাম, দেহ যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, দেখলেই শক্তিমান ব'লে বোঝা যায়। দুই চোখের দৃষ্টি এমন তীব্র যে, বেশিক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না।

—"আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন, বসুন।"

জয়ন্ত ও মানিক এক-একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়ল।

মানিক দেখলে, জয়ন্ত একদৃষ্টিতে একটা 'শেলফে'র দিকে চেয়ে আছে। সেও সেইদিকে চেয়ে দেখলে, 'শেলফে'র উপর কতকগুলো ইংরেজী বই সাজানো রয়েছে—সব বই-ই রসায়ন-তত্ত্ব-বিষয়ক। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল, যে-ব্যক্তি তাদের ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখেছে, জয়ন্তের বিশ্বাস সেও 'কেমিস্ট্রি' নিয়ে আলোচনা করে। মানিক বুঝতে পারল, জয়ন্ত অমন ক'রে বইগুলো লক্ষ্য করছে কেন!

টেবিলের এককোণে রয়েছে একটা বক-যন্ত্র। জয়ন্ত হাত দিয়ে অন্য-মনস্কভাবে সেটা নাড়তে নাড়তে বললে, "এখানে এ জিনিসটা কেন?"

লোকটি হেসে বললে, "আমার একটি বাতিক আছে। আমি 'কেমিস্ট্রি' নিয়ে অল্প-স্বল্প নাড়াচাড়া করি।"

জয়ন্ত বললে, "আমারও 'কেমিস্ট্রি' শিখতে ইচ্ছে হয়। আপনি যদি দয়া ক'রে ও-সম্বন্ধে দু-চারখানা বইয়ের নাম লিখে দেন, তাহ'লে বাধিত হই।"

লোকটি বললে, "এ আর শক্ত কথা কি, এখনি দিচ্ছি।"—ব'লেই টেবিলের টানার ভিতর থেকে কাগজ ও কলম বার ক'রে খানকয় বইয়ের নাম লিখে কাগজখানা জয়ন্তের হাতে দিলে।

জয়ন্ত বললে, "ধন্যবাদ! আপনার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করলুম, কিন্তু মহাশয়ের নাম আমরা জানি না!"

—"আমার নাম ভবতোষ মজুমদার। কলকাতায় বাগবাজারে থাকি।"

এমন সময় নিচে থেকে পানসির মাঝির চিৎকার শোনা গেল—"বাবুজী, আকাশে মেঘ জমেছে, এখনি ঝড় উঠবে, শীগ্‌গির আসুন!"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আপনার বজরা দেখে বড় খুশি হলুম, আজ তাহ'লে আসি, নমস্কার।"

কামরা থেকে বাইরে বেরিয়েই তারা দেখলে, সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতরে আধখানা আকাশ জুড়ে মেঘের কালিমা ঘন হয়ে উঠেছে। কষ্টি-পাথরের উপরে ক্ষণস্থায়ী সুবর্ণরেখার মতো থেকে থেকে বিদ্যুতের দীপ্ত লীলা দৃষ্টিকে ঝলসে দিচ্ছে।

মাঝি বললে, "বাবুজী, ঝড় এল ব'লে। আপনারা এখন পানসিতে আসবেন কি?"

জয়ন্ত পানসিতে নেমে প'ড়ে বললে, "ঝড়কে আমরা ভয় করি না, পানসি চালাও।"

মানিক বললে "জয়, কাজটা বুদ্ধিমানের মতো হ'ল না, মেঘগুলো কি-রকম হু-হু ক'রে এগিয়ে আসছে তা দেখেছ?"

—"দেখেছি। কিন্তু মানিক, ঝড়ের সময়ে এই গঙ্গার চেয়ে ঐ বজরা যে আরো ভয়ানক হয়ে উঠত না, তাই-বা কে বলতে পারে?"

মানিক সচমকে বললে, "তোমার এমন সন্দেহের কারণ?

—"সকালে আমরা যে-দুখানা চিঠি পেয়েছি, তার কথা তুমি ভোলো নি বোধ হয়?"

—"না।"

—"সেই চিঠি দুখানা ঐ বজরার ভিতরে ব'সেই লেখা হয়েছে।"

মানিক বললে, "তোমার বিশ্বাস, সেই চিঠি দুখানার লেখক 'কেমিস্ট্রি, নিয়ে চর্চা করে। ভবতোষ যে 'কেমিস্ট্রি' নিয়ে আলোচনা করে তাও স্বকর্ণে-ই শুনলুম বটে। কিন্তু এইটুকু প্রমাণই যথেষ্ট নয়।"

জয়ন্ত বললে, "সে কথা আমিও জানি। কিন্তু আমি তার চেয়েও বেশি-কিছু জানতে পেরেছি। এই কাগজখানা দেখছ? ভবতোষ তোমার সামনেই এই কাগজে কতকগুলো বইয়ের নাম লিখে দিয়েছে। আর এই দেখ সেই চিঠি দুখানা!"—এই ব'লে সে পকেটে হাত দিয়ে সকালের সেই চিঠি দুখানা বার করলে।

মানিক কাগজ দুখানা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে করতে বললে, "ভবতোষ লিখেছে কালো কালিতে ইংরাজী হরফে, আর চিঠির লেখা বাংলায় সবুজ কালিতে। তোমার মতে, চিঠির লেখা—বাঁ হাতের। কিন্তু ভবতোষ তো আমার সামনেই ডান-হাতে লিখলে! এই কাগজের লেখার সঙ্গে চিঠি লেখার কোন মিলই আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

জয়ন্ত বলল, "আরও ভাল ক'রে দেখ মানিক, আরো ভাল ক'রে দেখ!"

মানিক হঠাৎ সবিস্ময়ে ব'লে উঠল, "এ কী ব্যাপার! চিঠিখানার কাগজ আর ভবতোষের কাগজ যে একেবারে এক।"

জয়ন্ত কাগজখানা আর চিঠি আবার পকেটের ভিতরে পুরে ফেলে সহাস্যে বললে, "ভায়া, তোমার চোখ একটু দেরিতে ফোটে দেখছি! ভবতোষের কাগজ আর চিঠির কাগজ যে এক, আমি তো সেটা মিলিয়ে দেখবার আগেই টের পেয়েছিলুম। ঐ চিঠি দুখানা ভবতোষ নিজে লেখে নি বটে, কিন্তু চিঠির কাগজ সরবরাহ করেছে সে নিজের হাতেই! খুব সম্ভব, চিঠি দুখানা লেখা হয়েছে তার হুকুমেই! মানিক, ও-বজরা

আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।"

মানিক বললে, "ঐ ঝড় উঠল!"

হাঁ, ঝড় উঠল—আর সে বড় সহজ ঝড় নয়! ভীষণ কালো মেঘের দল সারা আকাশকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করবার আগেই আচম্বিতে উন্মত্ত ঝটিকা গোঁ গোঁ শব্দে চিৎকার ক'রে উঠল এবং তারপরেই ছুটে এল চোখ-কানা-করা রাশি রাশি ধুলোর কণা—সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার জল ক্ষেপে উঠে খল-খল-খল অট্টহাস্যে প্রলয়-নাচ শুরু ক'রে দিলে। এক মুহূর্তের মধ্যেই আকাশ-বাতাস-পৃথিবীর রূপ গেল একেবারে বদলে! সন্ধ্যার অন্ধকারে, মেঘের অন্ধকারে, ধুলোর অন্ধকারে—চোখে কিছু দেখা যায় না; বজ্রের গর্জনে, ঝড়ের হুঙ্কারে, তরঙ্গের কোলাহলে—কানে কিছু শোনা যায় না; বাতাসের ও জলের টানে পানসিখানা কোন্‌দিকে ছুটে চলেছে তীরবেগে, তা কেউ বুঝতেও পারলে না।

সেই হট্টগোলের ভিতরেও জয়ন্তের তীক্ষ্ণ কান আর একটা শব্দ আবিষ্কার করলে। হঠাৎ চোখ তুলেই সে দেখলে, একখানা মোটর-বোট একেবারে পানসির উপর এসে পড়েছে। আর রক্ষা নেই।

—"মানিক, মানিক! লাফিয়ে পড়—জলে লাফিয়ে পড়।"—প্রাণপণে চেঁচিয়ে এই কথা ব'লেই মানিককে টেনে নিয়ে জয়ন্ত গঙ্গার সেই মৃত্যু-স্রোতের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল!

সঙ্গে সঙ্গে মোটর-বোটখানা ভীষণ শব্দে পানসির উপরে বিষম এক ধাক্কা মারলে। দাঁড়ী-মাঝিরা তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ ক'রে উঠল,—এবং পানসিখানাও চোখের নিমেষে উলটে গেল।

জয়ন্ত ও মানিক জলের উপরে ভেসে উঠেই দেখলে, মোটর-বোটখানা আবার তাদের দিকে বেগে ছুটে আসছে!

জয়ন্ত আবার চেঁচিয়ে বললে, "মানিক, ও মোটর-বোট আমাদেরই বধ করতে চায়! আবার ডুব দাও,—ডুব-সাঁতারে এগিয়ে যাবার চেষ্টা কর।"

দপ ক'রে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল, এবং ডুব দেবার পূর্বমুহূর্তে জয়ন্ত ও
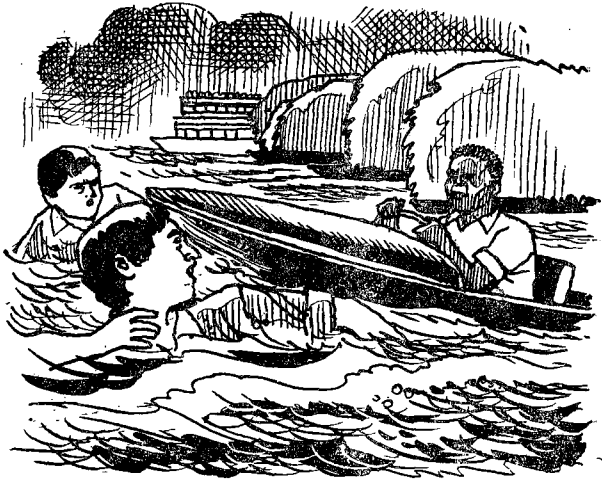
মানিক দুজনেই সচমকে দেখলে, মোটর-বোট চালিয়ে আসছে মূর্তিমান যমের মতন কালো একটা কাফ্রী।

গরম খিচুড়ি

ডুব দিয়ে তারা সেই উন্মত্ত জলরাশি ঠেলে খানিকদূর এগিয়ে গেল। কিন্তু জলের ভিতরে দম বন্ধ ক'রে মানুষ আর কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে? মিনিটখানেক পরেই আবার তাদের উপরে ভেসে উঠতে হ'ল, হাঁপ ছাড়বার জন্যে।

প্রায়-অন্ধকারে ঢেউয়ের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে তারা ত্রস্ত নেত্রে দেখলে, আকাশে চিলেরা যেমন ছোঁ মারবার আগে মণ্ডলাকারে ঘোরে, সেই মোটর-বোটখানা গঙ্গার অস্থির ও ফুটন্ত জলে

তেমনি চক্র কেটে আবার বেগে ঘুরে আসছে। প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হওয়াতে এবারে তার রোখ আরো বেড়ে উঠেছে।

মেঘ আর ঝড়—আর গঙ্গা তেমনি প্রলয়ের চিৎকার করছে, পৃথিবীর সর্বাঙ্গে অন্ধকার তেমনি কয়লার রঙ মাখিয়ে দিচ্ছে এবং চারিদিকে ফেনা ছড়াতে ছড়াতে ও মরণ-নাচ নাচতে নাচতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তেমনি নিষ্ঠুর কৌতুকে ছুটে তেড়ে আসছে!

মানিক হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "জয়, আবার ডুব দাও!"

জয়ন্ত বললে, "এমন বার বার ডুব দিয়ে কতক্ষণ চলবে?

—"তাছাড়া আর উপায় কি? ঐ দেখ, মোটর-বোটখানা আবার এসে পড়ল!"

—"মানিক, আমাদের রিভলবার আছে। শীগ্‌গির বার কর!"

পরমুহূর্তে অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ ক'রে দুটো রিভলবার উপর উপর গর্জন ক'রে উঠল! মোটর-বোটখানা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো বেগে আসতে আসতে হঠাৎ মোড় ফিরে আঁধারের ভিতরে গোঁৎ খেয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

জয়ন্ত বললে, "মানিক, রিভলবারের গুণ দেখ! আমাদের কাছে রিভলবার আছে জানলে শত্রু বোধ হয় এতটা বীরত্ব দেখাতে আসত না।"

দু-হাতে জল ঠেলতে ঠেলতে মানিক বললে, "জয়, তোমার এ অনুমানও সত্য,—ওদের দলে কাফ্রী-জাতের লোক আছে।"

জয়ন্ত বললে, "আমার অনুমান মিথ্যা হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু ও-সব কথা এখন থাক। এখনো আমরা নিরাপদ নই। চল, আগে ডাঙার দিকে চল।"

ঝড় আজ গঙ্গাকে যে-ভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, স্রোতের টান যে-রকম প্রখর, তাতে ডাঙার দিকে অগ্রসর হওয়া বড় সহজ কাজ নয়। তারা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিল বাগবাজারের কাছে, কিন্তু পায়ের তলায় মাটি পেলে নিমতলার ঘাটের কাছে গিয়ে।

তারা যখন পথ দিয়ে বাড়িমুখো হ'ল তখন ঝড়ের আক্রোশ একে-

বারে কমে গেছে। শূন্য থেকে কালো মেঘের পর্দাও সরে গেল বটে, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হ'ল না, খুব জোরে বৃষ্টি ঝরতে লাগল।

জয়ন্ত বললে "দেবতা দেখছি আজ আমাদের ওপরে মোটেই খুশি নন। ভেবেছিলুম, ঝড়ের পর আকাশ পরিষ্কার হবে, আর আমিও সেই কাফ্রী-বন্ধুর মোটর-বোটখানা আর একবার খোঁজবার চেষ্টা করব। কিন্তু আজ আর খোঁজাখুঁজি ক'রে কোন লাভ নেই—চারিদিকে যে অন্ধকার! তবে মোটর-বোটখানা পরেও বোধ হয় আমরা খুঁজে বার করতে পারব।"

—"কেমন ক'রে ?"

—"পোর্ট-পুলিসে খবর দিয়ে। মোটর-বোট এখনে বেশি নেই। যে-ক'খানা আছে, পোর্ট-পুলিসের কাছেই তাদের সন্ধান মিলবে।"

মানিক বললে, "কিন্তু কোন্ মোটর-বোট আমাদের আক্রমণ করেছিল, কেমন ক'রে তা বুঝতে পারবে ?"

জয়ন্ত বললে, "আমার রিভলবারের গুলিগুলো যে ব্যর্থ হয় নি, আমি তা জানি। তোমারও টিপ খারাপ নয়। আমাদের খুঁজে দেখতে হবে, কোন্ মোটর-বোটের গায়ে গুলির দাগ আছে। এটুকু আবিষ্কার করা বিশেষ কঠিন হবে না, কি বল হে ?"

মানিক বললে, "আপাতত ও-সব কথা আমার আর ভাল লাগছে না। আমার গায়ের হাড়গুলো পর্যন্ত বোধ হয় ভিজে গেছে। ডাঙায় উঠেও এখনো ভিজতে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি চল। আগে হু'পেয়ালা গরম চা—"

—"তারপর গরম খিচুড়ি। ঠিক বলেছ মানিক, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে তোমার বুদ্ধিই বেশি খোলে। চল বন্ধু, ঘরমুখো বলদের মতো ঘরের দিকেই দৌড় দেওয়া যাক।"

হাইড্রোজেন আর্সেনাইড

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙবার পর মানিক ঘরের জানালা খুলে বাইরেটা একবার দেখেই নিজের মনে অপ্রসন্ন স্বরে বললে, "উঃ, কী একগুঁয়ে বৃষ্টি ! কাল থেকে শুরু হয়েছে, এখনো থামবার নাম নেই !"

সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তা থেকে জয়ন্তের ডাক শুনলে, "মানিক, ওহে মানিক !"

তাড়াতাড়ি আবার জানালা খুলে মানিক বললে, "কিহে, এত সকালে —এই বৃষ্টিতে তুমি কোত্থেকে আসছ ?"

—"মানিক, জামা-কাপড় পরে শীগ্‌গির নিচে নেমে এস ।"

কথামতো কাজ ক'রে মানিক নিচে নেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপার কি জয়, আবার কোন নতুন বিপদ হয়েছে নাকি ?"

—"বিপদ ? হ্যাঁ । তবে আমাদের বিপদ নয় ।"

—"তার মানে ?"

—"আমাদের পাড়ার—অর্থাৎ বাগবাজারের, সদানন্দ বসুর নাম শুনেছ বোধহয় ? তিনি খুব ধনী হ'লেও খুব কৃপণ ব'লেই বিখ্যাত। লোকের বিশ্বাস, সকালে তাঁর নাম করলে ভাতের হাঁড়ি ফেটে যায়। তাই সবাই তাঁকে হাঁড়ি-ফাটা বসু ব'লে ডাকে। এই সদানন্দ বসুর বাড়িতে কাল রাত্রে মস্ত চুরি হয়ে গেছে ।"

—"মস্ত চুরি !"

—"হ্যাঁ ! ঘটনাটা আমি লোকের মুখে যতটা জানতে পেরেছি, তা হচ্ছে এই : সদানন্দবাবু তাঁর বাড়িতে একলাই বাস করেন ; কারণ, সংসারে তাঁর আর কেউ নেই। একমাত্র মেয়ে, সেও শ্বশুরবাড়িতে। বাড়িতে থাকে কেবল একজন চাকর ও একজন দ্বারবান। ঠিকে-পাচক রান্না সেরে বাসায় চ'লে যায়। সদানন্দবাবুও শখ ক'রে থিয়েটার দেখতে গিয়ে-

ছিলেন। এমন শখ তাঁর হয় না, বোধ করি পাশ পেয়েছিলেন। থিয়েটারে বড় বড় ছুটো পালা ছিল—সারা রাত তাঁর অভিনয় দেখবার কথা। কিন্তু একটা পালা দেখবার পর আর তাঁর ভাল লাগে নি, তাই তিনি রাত সাড়ে বারোটার সময়েই বাড়িতে ফিরে আসেন। দ্বারবান সদর দরজা খুলে দেয়। তিনি সোজা উপরে গিয়ে দেখেন, তাঁর শয়ন-ঘরের দরজা খোলা। অথচ দরজায় তিনি নিজের হাতেই চাবি বন্ধ ক'রে গিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি তিনি ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢোকেন, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান হলে পর দেখলেন, তাঁর লোহার সিন্দুক ভাঙা, টাকাকড়ি আর মূল্যবান যা-কিছু ছিল, সব অদৃশ্য!"

—"আশ্চর্য! কিন্তু ঘরে ঢুকেই তিনি অজ্ঞান হ'য়ে যান কেন?"

—"এখনো সেটা জানতে পারি নি। ...সদানন্দবাবুর জুয়েলারি ব্যবসা আছে, সুতরাং তাঁর লোহার সিন্দুকে যে হীরে-মুক্তা-চুনি-পান্নার অভাব ছিল না, এটুকু অনায়াসেই কল্পনা করতে পারি। চোর এসেছিল খিড়কির দরজা দিয়ে। আপাতত এর বেশি আর কিছু জানি না। সদানন্দবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ আছে, তিনি আমাকেও ডেকে পাঠিয়েছেন, পুলিসেও খবর দিয়েছেন।"

আরো-খানিক পথ চলেই ছুজনে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হ'ল। তখনো পুলিস আসে নি, উপরে খবর দিয়ে জয়ন্ত বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল।

শয়ন-ঘরে একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে সদানন্দবাবু শুকনো মুখে হতাশভাবে শুয়ে ছিলেন, জয়ন্তকে দেখেই মাথা নেড়ে হাহাকার ক'রে উঠলেন।

সে-হাহাকার জয়ন্তের কানে ঢুকল ব'লে মনে হ'ল না, সে নস্যদানী থেকে নস্য নিতে নিতে ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল।

ঘরখানি খুব ছোটখাটো, একটা লোহার সিন্দুক ও টুলের উপরে একটা কুঁজো ছাড়া আসবাব-পত্তর আর কিছুই নেই।

লোহার সিন্দুকটা ভাল ক'রে দেখে জয়ন্ত মৃদুস্বরে বললে, "মানিক, কলকাতায় বৈজ্ঞানিক চোরের দল ক্রমেই পুরু হয়ে উঠছে। এই লোহার সিন্দুক খোলবার জন্যে oxy-acetylene torch ব্যবহার করা হয়েছে! মুকুন্দ নন্দীর গদীতেও চোরেরা ঠিক এই উপায়ই অবলম্বন ক'রেছিল!"

মানিক চমকে উঠে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় নিচে একটা গোলমাল উঠল, তারপরেই সিঁড়ির উপরে একাধিক লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল।

জয়ন্ত বললে, "পুলিস এসেছে। এখনি আমাদের পুরানো বন্ধু ইনস্পেক্টার সুন্দরবাবুর আবির্ভাব হবে।"

ইনস্পেক্টার সুন্দরবাবু সদলবলে উপরে এসে হাজির হলেন। সম্ভবত তাঁর পিতৃদেব ঠাট্টা ক'রেই ছেলের নাম রেখেছিলেন—"সুন্দর।" কারণ, তাঁর দেহ যেমন বেঁটে তেমনি মোটা এবং গায়ের রঙ নিগ্রোদের চেয়ে বেশি ফর্সা নয়। চোখ আর নাক প্রায় চীনেম্যানদের মতো এবং শোনা যায়, জন্মগ্রহণের পরে তাঁর মাথায় কেউ কোনদিন একগাছি চুলও দেখতে পায় নি।

জয়ন্তকে দেখেই সুন্দরবাবু একগাল হেসে বললেন, "এই যে শখের টিকটিকি-ভায়ারা যে! চোরের ঠিকুজী বোধহয় জানতে পেরেছ?"

জয়ন্ত বললে, "আজ্ঞে না, আপনার আগে চোর ধরব, এমন সাধ্য আমাদের নেই।"

সুন্দরবাবুর খুশি হয়ে বললেন, "তা সত্যিকথা ভায়া! শখের গোয়েন্দাগিরি আর শার্লক হোমসের বাহাদুরি নভেলেই ভাল লাগে, আসলে তার কোন দামই নেই! যাক সে কথা। কৈ, কোন্ সিন্দুক ভেঙে চুরি হয়েছে দেখি!"

সিন্দুকটার দিকে তাকিয়েই সুন্দরবাবু বললেন, "হুম!" ওর ভেতরে কত টাকা ছিল?

সদানন্দবাবু বিহ্বলের মতো হাহাকার করতে লাগলেন,

সুন্দরবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "ও-সব কান্না-টান্না এখন রাখুন মশাই! কাজের কথা বলুন। কী চুরি গেছে?"

সদানন্দবাবু অনেক কষ্টে হাহাকার থামিয়ে জানালেন, চোরেরা চারখানা হাজার টাকার নোট ও প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না নিয়ে গেছে।

সুন্দরবাবু বললে, "বেশ করেছে। অত টাকার জিনিস এখানে রেখেছিলেন কেন? চোরকে লোভ দেখিয়ে পুলিসের কাজ বাড়াবার জন্যে?......আপনি আর যা জানেন বলুন।"

সদানন্দবাবু যা বললেন, জয়ন্তের কাছ থেকে মানিক আগেই তা শুনেছিল।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! কিন্তু ঘরে ঢুকেই আপনি কচিখোকার মতো অজ্ঞান হয়ে গেলেন কেন?"

—"জানি না। কিসের একটা শব্দ হ'ল, আর অমনি আমার সর্বাঙ্গ কি রকম ক'রে উঠল। তারপর কি হ'ল, আমার মনে নেই!"

—"হুম! তাহ'লে কোন লোককে আপনি দেখতে পান নি?"

—"কি ক'রে দেখব, ঘরে আলো ছিল না।"

তারপর চাকর-দ্বারবানের ডাক পড়ল। তারা কিছুই জানে না।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! সেপাই, এ তুই বেটাকে বেঁধে থানায় নিয়ে চল।......ওকি, জয়ন্ত-ভায়া, ঘরের মেঝেয় তুমি হামাগুড়ি দিচ্ছ কেন? তোমার আবার কি হ'ল?"

জয়ন্ত ঘরের মেঝে থেকে সযত্নে কি-কতকগুলো তুলে একটা কাগজে মুড়ে রেখে বললে, "এখানে অনেক কাঁচের টুকরো পড়ে রয়েছে। সে-গুলো কুড়িয়ে তুলে রাখলুম।"

সদানন্দবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "আমার ঘরে কাঁচের টুকরো কেমন ক'রে এলো?"

সুন্দরবাবু বললেন, "কৈ, দেখি একবার টুকরোগুলো!"

জয়ন্ত দেখালে। সেগুলো এত ছোট যে, কাঁচের টুকরো না ব'লে

কাঁচচূর্ণ বলাই উচিত,—খুব পাতলা ও হালকা কাঁচের গুঁড়ো।

সুন্দরবাবু হা হা ক'রে হেসে উঠে বললেন, "ফেলে দাও ভায়া, ফেলে দাও! ওগুলো হীরকচূর্ণ নয় যে এত যত্ন ক'রে নিয়ে যাচ্ছ!"

জয়ন্ত বললে, "এগুলো হীরকচূর্ণ হ'লে এত যত্ন ক'রে নিয়ে যেতুম না।"

সুন্দরবাবু হতাশভাবে একটা মুখভঙ্গি ক'রে এবং সদানন্দবাবুকে আরো গোটাকয়েক প্রশ্ন ক'রে উঠে দাঁড়ালেন।

জয়ন্ত বললে, "সদানন্দবাবু, আপনার জলের কুঁজোর পাশে একটা কাঁচের গেলাসে আধগ্লাস জল রয়েছে। ও জল কি আপনি পান করেছিলেন ?"

সদানন্দবাবু বললেন, "না। কাল থেকে আজ পর্যন্ত আমি ও-গেলাসটা হাতে করি নি। গেলাসটা তো বরাবর কুঁজোর মুখে ঢাকা দেওয়াই থাকে, ওটাকে নামিয়ে রাখলে কে, তাও জানি না।"

জয়ন্ত এক টিপ নস্য নিলে। তারপর সাবধানে গেলাসের তলাটা ধ'রে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং 'ম্যাগনিফাইং গ্লাস' দিয়ে গেলাসটা পরীক্ষা করতে লাগল।

সুন্দরবাবু একটি ছোটখাটো লাফ মেরে তাড়াতাড়ি বললেন, "হুম! সাধু শার্লক হোমস! ও-বুদ্ধি তো আমার মাথায় ঢোকে নি! ওতে আঙুলের ছাপ আছে নাকি ?"

—"আছে। তবে চোরেদের কারুর কিনা জানি না। গেলাসটা আপনি নিয়ে যান, আঙুলের ছাপের ফোটো তুলে দেখবেন, কিছু আবিষ্কার করতে পারেন কিনা!......চল হে মানিক, আমরা বিদায় হই। হ্যাঁ, ভাল কথা! সুন্দরবাবু, দয়া ক'রে যদি একবার আমার বাড়িতে আসেন, তাহ'লে আপনাকে একটা খুব দরকারী নতুন কথা শোনাতে পারি।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তোমার কথা যদি নভেলের রূপকথা না হয়, তাহ'লে আমি যেতে পারি। মনে রেখো, আমরা পুলিসের লোক, রূপ-

কথা শোনবার সময় নেই।"

জয়ন্ত হেসে বললে, "বেশ বেশ, আপনি যে পুলিসের একজন ছোট-খাটো কর্তা, সে কথা আমি ভুলব না। আসতে আজ্ঞা হোক।"

সকলে যখন জয়ন্তের বাড়িতে গিয়ে হাজির হ'ল, তখনো বৃষ্টি থামে নি। সুন্দরবাবুকে বৈঠকখানায় বসিয়ে জয়ন্ত বললে, "মানিক, তুমি সুন্দরবাবুদের সঙ্গে মিনিট-কয়েক গল্প কর। আমি একবার পরীক্ষাগারের ভিতরে যেতে চাই।"

সুন্দরবাবু অত্যন্ত ছটফটে লোক, চুপ ক'রে বসে থাকা তাঁর পক্ষে মস্ত শাস্তি। তিনি টেবিলের উপর থেকে একবার খবরের কাগজ তুলে নিলেন, দু-এক লাইন প'ড়েই আবার কাগজখানা ফেলে দিলেন। এক-বার একটা জানালা খুললেন, তারপর জলের ছাঁট আসছে দেখে জানালাটা আবার বন্ধ ক'রে দিয়ে বললেন, "হুম! মানিক-ভায়া, আমার প্রতি-মুহূর্ত মূল্যবান। আর আমি অপেক্ষা করতে পারব না!"

মানিক বললে, "ঐ যে, চা আর টোস্ট নিয়ে এসেছে, একটু খেয়ে দেখুন না।"

সুন্দরবাবু তৎক্ষণাৎ ব'সে প'ড়ে বললেন, "হ্যাঁ, এ প্রস্তাব আমি সমর্থন করি। আরো খান-দুই 'টোস্ট' পেলেও আমি আপত্তি করব না।"

মানিক হেসে বললে, "খালি 'টোস্ট' কেন, আপনি ডিম খান? মুর্গীর ডিম?"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! মুর্গীর ডিম হচ্ছে উপাদেয় খাদ্য।"

বেয়ারা তখনি আরো 'টোস্ট' ও মুর্গীর ডিম দিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু চা ও খাবার নিঃশেষ ক'রে অত্যন্ত খোসমেজাজে মুখ পুঁছতে পুঁছতে বললেন, "এরপরে জয়ন্ত-ভায়া যদি গোটাদুই রূপকথা বলেন, তাহ'লে পুলিসের লোক হয়েও আমি রাগ করব না।"

এমন সময় জয়ন্ত ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল—তার হাতে সেই কাগজের মোড়কটা। সে বললে, "সুন্দরবাবু, এগুলো কি জানেন?

কাঁচের 'বালবে'র ভাঙা টুকরো! এর ভেতরে কি ছিল জানেন? 'হাই-ড্রোজেন আর্সেনাইড'……ও কি, ও কি!"

হঠাৎ একটা খড়খড়ির পাখি খোলার শব্দ হ'ল—তারপরেই আরো তিন-চারটে অদ্ভুত শব্দ!

চোখের পলক না ফেলতেই জয়ন্ত ছুটো প্রবল ধাক্কায় সুন্দরবাবু ও মানিককে ঘরের দ্বারপথ দিয়ে বাইরে ঠেলে দিলে এবং সেই সঙ্গে নিজেও একলাফে বাইরে গিয়ে পড়ল।

ঠেলা সামলাতে না পেরে মানিকের সঙ্গে সুন্দরবাবু ঠিকরে একেবারে উঠানে গিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়লেন। কোনরকমে উঠে ব'সে যন্ত্রণাবিকৃত ক্রুদ্ধস্বরে সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত! এর অর্থ কি?"

জয়ন্ত শান্তস্বরে বললে, "এর অর্থ আর কিছুই নয়, ও-ঘরে আর এক সেকেণ্ড থাকলে হয়তো আমরা প্রাণে মারা পড়তুম!"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে সুন্দরবাবু বললেন, "প্রাণে মারা পড়তুম?"

—"হ্যাঁ। "হাইড্রোজেন আর্সেনাইড'!"

স্বপ্নের অগোচর বিভীষিকা

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো বললেন, "কি বললে? হাইড্রোজেন আর্সেনাইড?"

—"হ্যাঁ।"

—"সে আবার কি?"

—"একরকম মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস। সদানন্দবাবুর ঘরে যে-কাঁচের টুকরোগুলো পেয়েছি, সেগুলো যে খুব ছোট কাঁচের 'বালবে'র অংশ, এ-কথা আগেই বলেছি। সেইরকম 'বালবে'র ভিতরে 'হাইড্রোজেন

আর্সেনাইড' ভ'রে কেউ এইমাত্র আমাদেরও ঘরে ফেলে দিয়ে গেছে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম। তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। নভেল প'ড়ে প'ড়ে তোমার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।"

জয়ন্ত মুখ টিপে হেসে বললে, সুন্দরবাবু, "আমার মাথা নিয়ে আপাততঃ আপনি আর মাথা ঘামাবেন না। ব্যাপারটার গুরুত্ব এখনো আপনি আন্দাজ করতে পারেন নি। আমরা যখন সদানন্দবাবুর বাড়ি থেকে আসি, চোরেদের কেউ নিশ্চয় আমাদের পিছু নিয়েছিল। হঠাৎ আমি দেখলুম, জানালার খড়খড়ি তুলে ঘরের ভিতরে কে কি ছুঁড়ে ফেললে—সঙ্গে সঙ্গে 'বালব' ফাটার শব্দ। তখন সবে আমি পরীক্ষা ক'রে আন্দাজ করেছি সদানন্দবাবু কাল রাতে ঘরে ঢুকে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন কেন। কাজেই চোখের পলক ফেলবার আগেই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি আপনাদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে—অর্থাৎ পালিয়ে এলুম। একটু দেরি হ'লে আর রক্ষে ছিল না।"

সুন্দরবাবু অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, "হুম। একটু দেরি হলে কি হ'ত শুনি ?"

—"হয়তো আমরা প্রাণে বাঁচতুম না।"

—"হুম। কিন্তু সদানন্দবাবু তো কেবল অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।"

—"সদানন্দবাবু ঘরে ঢুকেই খোলা দরজার কাছে অজ্ঞান হয়ে প'ড়েছিলেন। চোরেরা ঠিক সময়ে 'বালব' ছুঁড়তে পারে নি। বন্ধঘরে 'হাইড্রোজেন আর্সেন্যাইড' গ্যাস অব্যর্থ। সদানন্দবাবু খোলা দরজার কাছে ছিলেন ব'লেই গ্যাসটা তাঁকে ভাল ক'রে কাবু করতে পারে নি।"

মানিক বললে, "কিন্তু ঘরের ভিতরে চোরেরা তো ছিল ?"

জয়ন্ত বললে, "যে-সব চোরের এত বেশি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা থাকে, তারা আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে যায়। নিশ্চয়ই তারা গ্যাস-মুখোশ ব্যবহার করেছিল।"

সুন্দরবাবু কষ্টেসৃষ্টে এতক্ষণে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বিকৃত-

মুখভঙ্গি ক'রে বললেন, "দেখ জয়ন্ত, তোমার রূপকথা বরং সহ্য করতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যতে আমার ভুঁড়ির ওপরে তুমি আজকের মতো এত-জোরে ধাক্কা মেরো না। ভুঁড়ির ওপরে ধাক্কা আমি পছন্দ করি না।"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, আপনি এখনো আমার কথা রূপকথা ব'লে মনে করছেন? বেশ, আসুন আমার সঙ্গে ঘরের ভেতরে!"

সকলে আবার বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু ঘরের দরজার কাছে গিয়েই সুন্দরবাবু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সন্দিগ্ধস্বরে বললেন, "হুম! জয়ন্ত, যদি তোমার কথাই সত্যি হয়? ঘরের ভেতরে এখনো—ঐ যে কি বললে—সেই গ্যাসটা যদি থাকে?"

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, "না, সে গ্যাস এতক্ষণ থাকবার কথা নয়।"

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না ভায়া, মনে তুমি খটকা লাগিয়ে দিয়েছ। প্রাণ বড় মূল্যবান জিনিস হে। ঘরের ভেতরে তুমিই আগে ঢোকো।"

জয়ন্ত ও মানিক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল। সুন্দরবাবু দরজার ভিতর দিয়ে আগে ভয়ে ভয়ে মাথাটি গলিয়ে দিলেন, ভয়ে ভয়ে তিন-চারবার নিঃশ্বাস টেনে দেখলেন, তারপর অতি-সন্তর্পণে পায়ে পায়ে ঘরের ভিতরে গিয়েই ব্যস্ত স্বরে বললে, "জানলা খুলে দাও—ঘরের ভেতরে বাইরের হাওয়া আসতে দাও।"

মানিক জানালাগুলো খুলে দিলে।

জয়ন্ত ঘরের মেঝের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ ক'রে বললে, "দেখুন!"

সুন্দরবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, সদানন্দবাবুর ঘর থেকে জয়ন্ত যে-রকম অতিসূক্ষ্ম কাঁচের টুকরো বা গুঁড়ো সংগ্রহ ক'রেছিল, এখানেও ঘরময় তেমনি টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে।

জয়ন্ত বললে, "দেখুন সুন্দরবাবু, আর এক চোরের শাস্তি দেখুন!"

সুন্দরবাবু ফিরে দেখলেন, চৌকীর তলায় একটা বিড়াল চার পা ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে!

জয়ন্ত বললে, "ও-বিড়ালটা নিশ্চয় কিছু খাবারের লোভে এই ঘরে

ঢুকেছিল। তারপর চৌকীর তলায় গা-ঢাকা দিয়েছিল আমাদের সাড়া পেয়ে। 'হাইড্রোজেন আর্সেন্যাইডে'র মহিমায় এখন ওর অবস্থা কি হয়েছে দেখুন।"

সুন্দরবাবু কপালে দুই চোখ তুলে আড়ষ্টভাবে বললেন, "ও কি একেবারে ম'রে গিয়েছে?"

—"একেবারে। ঘরের ভেতরে থাকলে আমাদেরও ঐ অবস্থা হ'ত।"

সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ স্তম্ভিত ও স্তব্ধ হয়ে রইলেন; এবং তারপর অভিভূত স্বরে বললেন, "হুম! জয়ন্ত, আজ তুমি আমার প্রাণরক্ষা করলে। এখন আমার মনে হচ্ছে, তুমি সব সময়ে রূপকথা বল না।"

জয়ন্ত আহত স্বরে বললে, "সুন্দরবাবু, রূপকথা বলবার বা শোনবার বয়স আমাদের কারুরই নেই। আমি যে রূপকথা বলি না, এর প্রমাণ আগেই আপনি পেয়েছেন। সেই শ্যামপুকুরের চুরির ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যান নি?"

সুন্দরবাবু বললেন, "না, না, ভুলি নি। সে ব্যাপারে তুমি যথার্থই বাহাদুরি দেখিয়েছিলে বটে! বর্ষার রাত্রে চোর চুরি ক'রে পালিয়েছিল। বাগানের ভিজে মাটির একটা জায়গা দেখে তুমি বললে, 'চোর এইখানে পা হড়কে মুখ থুবড়ে প'ড়ে গিয়েছে।' আমরা তোমার কথা গ্রাহ্য করলুম না। কিন্তু তুমি সেইখান থেকে চোরের দুটো হাতের, আর মুখের খানিকটার এমন সুন্দর প্লাস্টারের ছাঁচ তুললে যে, আমরা অবাক হয়ে গেলুম। পরে তোমার সেই ছাঁচের সাহায্যেই চোর ধরা প'ড়ে শাস্তি পায়। তোমার সে কেরামতির কথা কখনো আমি ভুলব না।"

জয়ন্ত বললে, "ভবিষ্যতেও আমার কথায় নির্ভর করলে আপনার ক্ষতি হবে না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু ভায়া, আজ যে বড় ভয়ানক কথা শোনা গেল! ইউরোপে আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক চোর আছে ব'লে শুনেছি, কিন্তু বাংলাদেশেও যে তারা দেখা দিতে পারে, এটা তো কখনো কল্পনাও করি নি। আর, এরা কেবল চোর নয়, দরকার হ'লে এরা মানুষ খুন

করতেও ভয় পায় না।"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, আমার বিশ্বাস, কলকাতায় ভীষণ একটা দল গ'ড়ে উঠেছে; সে-দলের লোকেরা চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি বা খুন-জখম করতে সর্বদাই প্রস্তুত। এদের যে দলপতি, সে হচ্ছে একজন শিক্ষিত লোক। মুকুন্দ নন্দীর গদীতে আর সদানন্দবাবুর বাড়িতে যে চুরি হয়েছে, তা একই দলের কীর্তি।"

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, "তোমার এমন আশ্চর্য বিশ্বাসের কারণ কি জয়ন্ত।"

জয়ন্ত বললে, "কারণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আপাততঃ আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। সদানন্দবাবুর ঘরে যে কাঁচের গেলাস পাওয়া গেছে, তার উপরে কার আঙুলের ছাপ আছে, সেটা আপনি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করুন। সেটা যদি কোন পুরাতন পাপীর হাতের ছাপ হয়, তাহ'লে আমাদের অনেক পরিশ্রম বেঁচে যাবে। যদিও 'ম্যাগনিফাইং গ্লাস' দিয়ে একটা বিষয় আমি এর মধ্যেই আবিষ্কার ক'রে ফেলেছি।"

মানিক কৌতূহলী স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি আবিষ্কার করেছ?"

জয়ন্ত বললে, "লোকে সাধারণতঃ গেলাস ধরে ডান-হাতে। কিন্তু এ-গেলাসের ওপর ছাপ আছে বাঁ-হাতের আঙুলের।"

মানিক চকিত স্বরে বললে, "বাঁ-হাতের আঙুলের! যে আমাদের চিঠি লিখে শাসিয়েছিল, সেও চিঠি লিখেছিল বাঁ-হাতে!

জয়ন্ত বললে "তার কারণও পরে আমরা জানতে পেরেছি। তার ডান-হাতের বুড়ো আঙুল নেই। এখন এটাও আমাদের জানা দরকার, এই গেলাসটা যে ব্যবহার করেছে, তারও ডান-হাতের বুড়ো আঙুল আছে কিনা! অবশ্য, আমার এ সন্দেহ অমূলক হতেও পারে। কারণ সময়ে সময়ে আমরা সকলেই ডান-হাত থাকতেও বাঁ-হাতে গেলাস ধ'রে থাকি।"

সুন্দরবাবু এতক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দুই চোখ অত্যন্ত বিস্ফারিত

ক'রে জয়ন্ত ও মানিকের কথাবার্তা শুনছিলেন। এখন বললেন, "হুম! তোমরা আবার হেঁয়ালিতে কথা কইতে শুরু করলে কেন? ডান-হাত, বাঁ-হাত,—এ-সবের অর্থ কি?"

জয়ন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তুই হাত ছড়িয়ে হাই তুলে বললে, "বড্ড পরিশ্রম হয়েছে সুন্দরবাবু! আজ আর কোন কথা নয়। এখন আমি ওপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করব—অর্থাৎ বাঁশি বাজাব।"

সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "বিশ্রাম করবে—অর্থাৎ বাঁশি বাজাবে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। বাঁশি বাজিয়েই আমি বিশ্রাম করি, আর মানিক বিশ্রাম করে আমার বাঁশি-বাজানো শুনতে শুনতে। এটা আমাদের অনেকদিনের অভ্যাস। না মানিক?"

মানিক হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! তোমরা রাগ কোরো না, কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাদের তুজনেরই মাথা দস্তুরমতো খারাপ হয়ে যায়"—ব'লেই তিনি প্রস্থান করলেন।

তু'দিন পরে এক সন্ধ্যাবেলা। জয়ন্ত ও মানিক চা-পান শেষ ক'রে বসে বসে পরামর্শ করছিল, আজ রাত্রে বায়স্কোপ দেখতে গেলে কেমন হয়,—এমন সময় নিচের তলা থেকে সুন্দরবাবুর হাঁক-ডাক শোনা গেল।

মানিক হতাশ ভাবে ইজি-চেয়ারের উপরে আড় হয়ে প'ড়ে বললে, "ব্যাস, বিদায় গ্রেটা গার্বোর মায়া-লীলা! ঐ শোনো, তোমার সুন্দর-বাবু এলেন মুরুব্বিয়ানার ঠেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত করতে।"

জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, "আসুন সুন্দরবাবু, ওপরে উঠে আসুন।"

সুন্দরবাবু ঘরের ভিতরে ঢুকেই উত্তেজিত স্বরে বললেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত, তুমি কি মন্তর-টন্তর কিছু জানো?"

জয়ন্ত বললে, "কেন বলুন দেখি?"

সুন্দরবাবু বললেন, "তাহ'লে সেই মন্তরটা আমাকে শিখিয়ে দাও।

……গেলাসে যার হাতের ছাপ আছে, সত্যিই তার ডান হাতের বুড়ো-আঙুল নেই। কিন্তু পুলিসের কাছে তার বাঁ-হাতের ছাপ আছে।"

জয়ন্ত দুই টিপ নস্য নিয়ে বললে, "তাহ'লে সে পুরানো পাপী?"

—"হ্যাঁ। সে ভয়ানক লোক। তার নাম বলরাম চৌধুরী। পঁচিশ বছর আগে সে একটা খুনের মামলার আসামী হয়। কিন্তু বিচারে প্রমাণ-অভাবে খালাস পায়। বিশ বছর আগে একটা ডাকাতির মামলায়ও সে আসামী হয়েছিল। কিন্তু সেবারও সে শাস্তি পায় নি। উনিশ বছর আগে বড়বাজারে রাহাজানি ক'রে সে ধরা পড়ে। এবার সে আইনকে ফাঁকি দিতে পারে নি, বিচারে তার তিন বছর জেল হয়। জেলে থাকতে থাকতেই এক হাবসীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়—"

মানিকের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, "এক হাবসীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়?"

—"হ্যাঁ। তার সঙ্গে বলরাম জেল ভেঙে পালিয়ে যায়। তারপরও এক বছরের ভেতরে তারা যে দুটো খুন আর তিনটে ডাকাতি করেছে, পুলিসের কাছে এমন প্রমাণ আছে। কিন্তু আমরা কিছুতেই তাদের ধরতে পারি নি। কেবল তাই নয়, তারা যেন পৃথিবী থেকে উবে গিয়েছিল। খুন আর ডাকাতি যাদের জীবিকা, তারা বেশিদিন চুপ ক'রে থাকতে পারে না। কিন্তু আজ যোলো বৎসরের মধ্যে দেশ-বিদেশের কোথাও তাদের আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি। আমরা ভেবেছিলুম, তাদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আজ এতকাল পরে বলরাম যে কোথা থেকে আবার দেখা দিলে, ভগবান জানেন!"

জয়ন্ত বললে, "বলরাম যখন এমন গুণী ব্যক্তি, তখন পুলিস নিশ্চয়ই তার ফটো নিতে ভোলে নি!"

সুন্দরবাবু একখানা মোটা বইয়ের পাতা উলটে বললেন, "এই দেখ বলরামের ফোটো আর ইতিহাস। এর চেহারা দেখলেই তোমাদের ভয় হবে।"

সত্যই তার চেহারা ভয়ঙ্কর,—শয়তানের চেহারাও বোধহয় এত

ভয়ানক নয়। চোখদুটো সাপের মতো ক্রূর ও তীক্ষ্ণ, নাক বুলডগের মতো থ্যাবড়া, চোয়াল হচ্ছে হাঙরের মতো।

জয়ন্ত অনেকক্ষণ ধ'রে বলরামের ইতিহাস প'ড়ে যেন নিজের মনেই বললে, "দেখছি এই ফোটোখানা তোলা হয়েছে পঁচিশ বছর আগেই,—বলরামের বয়স যখন পঁয়তাল্লিশ বৎসর। না, না, এ অসম্ভব।"

সুন্দরবাবু শুধোলেন, "কি অসম্ভব?"

—"এ-কথা সত্য হ'লে বলতে হয়, বলরামের বয়স এখন সত্তর বৎসর।"

—"অসম্ভব নয়। আমরা এমন সব পাপীকেও জানি, সত্তর বছর বয়সেও যাদের স্বভাব শোধরায় নি।"

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, "না সুন্দরবাবু, আমি সে কথা বলছি না। চোরেদের দলে যে বুড়ো-আঙুল-কাটা লোক আছে, তাকে স্বচক্ষে দেখেছে আমরা এমন একজনকে জানি। মানিক, কুমোরটুলির চায়ের দোকানে কাজ করে, আমি সেই বেশি-খুশি লোকটির কথাই বলছি। সে তো সেই বুড়ো-আঙুল-কাটা লোকটিকে বুড়ো বলে নি!"

সুন্দরবাবু দৃঢ়স্বরে বললেন, "আঙুলের ছাপ মিথ্যা হ'তে পারে না"

জয়ন্ত বললে, "আমার তাই বিশ্বাস। সেইজন্যেই তো আমি আশ্চর্য হচ্ছি! তবে কি চোরেদের দলে দুজন বুড়ো আঙুল-কাটা লোক আছে? না, তাই বা বিশ্বাস করি কেমন ক'রে? কিন্তু এ ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে?"

হঠাৎ মানিক সভয়ে চিৎকার ক'রে উঠল, "সাপ, সাপ! অজগর সাপ! সুন্দরবাবু, সাবধান!"

জয়ন্ত সচকিতে ফিরে দেখলে, বিপুল এক অজগর সাপ জানালার দুটো গরাদের মধ্যেকার শূন্য পরিপূর্ণ ক'রে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করছে, এবং তার দুটো ক্ষুধিত চক্ষু দিয়ে ঠিকরে পড়ছে যেন হিংসার আগুন!

অজগরটা বিষম গর্জন ক'রে সুন্দরবাবুকে লক্ষ্য ক'রে এক ছোবল মারলে, কিন্তু তিনি তার আগেই "বাপ" ব'লে বিরাট এক লম্ফত্যাগ

ক'রে স'রে গেলেন এবং লক্ষ্যচ্যুত অজগরের মাথাটা মাটির উপরে এসে সশব্দে আছড়ে পড়ল।

সেই ভয়াবহ অজগরের দেহের সাত-আট হাত অংশ ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে, কিন্তু তখনো তার দেহের অপর অংশ জানালার বাইরেই অদৃশ্য হয়ে আছে! এমন প্রকাণ্ড অজগর তারা কেউ কখনো দেখে নি!

অজগরটা আবার এক প্রচণ্ড গর্জন ক'রে বিদ্যুৎ-বেগে মাথা তুললে —এবারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টি জয়ন্তের দিকে।

অসম্ভব মৃত্যু যেন মূর্তিমান হয়ে আজ এই ঘরের ভিতরে আচম্বিতে আবির্ভূত হয়েছে।

প্রতিশোধ চাই!

অজগর আবার মাথা তুলেছে,—তার ক্রুর ও তীব্র দৃষ্টি জয়ন্তের দিকে আকৃষ্ট!

জয়ন্তও তার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে যথাসময়ে লাফ মারবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল। তখন নিজেকে তার কী অসহায় ব'লে মনে হচ্ছিল! হাতে এমন কোন অস্ত্র নেই যে, কোনরকমে আত্মরক্ষা করে। এখন তার আত্মরক্ষা করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ক্ষিপ্র-গতিতে ডাইনে বা বামে অজগরের নাগালের বাইরে স'রে যাওয়া। কিন্তু তারপর? তার-পর কি হবে? এইটুকু ঘরে এমন ভাবে একটা এত-বড় অজগরের আক্রমণ বার বার ঠেকানো তো সম্ভবপর নয়! একমুহূর্তের মধ্যে এই সব চিন্তা বিদ্যুতের মতন তার মাথার ভিতর দিয়ে খেলে গেল। সঙিন মুহূর্তে মানুষ কত তাড়াতাড়ি ভাবতে পারে।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তে সুন্দরবাবু ভাবছিলেন, এই অজগরটা এখনি তাঁর দেহ জড়িয়ে ধরে হাড়গোড় ছাতু ক'রে ফেলে তারপর তাঁকে গিলে হজম করবে! দুনিয়ায় আজ তাঁর শেষ-দিন! তিনি এমন নেতিয়ে পড়লেন যে, সাপটা এখন আবার যদি তাঁকে ছোবল মারে, তাহলে তিনি আগের বারের মতো আর লম্বা লম্ফত্যাগ ক'রে সরে যেতেও পারবেন না!

এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই মানিক তীরবেগে হাত বাড়িয়ে সুন্দরবাবুর পকেট থেকে রিভলবারটা একটানে বার ক'রে নিলে। সুন্দরবাবু যখন প্রথম ঘরে এসেছিলেন মানিক তখনি তাঁর পকেটের এই বিশেষত্বটি লক্ষ্য করেছিল।

অজগর আবার সোঁ ক'রে এগিয়ে ছোবল মারতে এল এবং জয়ন্ত

সাঁৎ করে একপাশে স'রে গেল।

লক্ষ্যচ্যুত হয়ে অবলম্বন না পেয়ে সাপটা আবার মাটির উপরে মুখ থুবড়ে পড়ল। ততক্ষণে তার দেহের প্রায় তিনভাগ ঘরের ভিতর এসে পড়েছে।

অজগর তৃতীয়বার আক্রমণ করবার জন্যে মাথা তোলবার আগেই মানিক তার মাথা টিপ ক'রে উপরি-উপরি দু-বার রিভলবারের গুলি-বৃষ্টি করল এবং তারপর যে কাণ্ড হ'ল ভাষায় তা ভাল ক'রে বুঝানো যাবে না।

অজগরের ভীষণ গর্জনে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং তার সেই বিপুল দেহটা প্যাকসাট খেয়ে ঘরের মেঝের উপরে আছড়া-আছড়ি করতে লাগল—তারই বা শব্দ কি। ঘরের গোল মার্বেলের টেবিলটা ও একখানা সোফা ঠিকরে উলটে পড়ল এবং অজগরের কুণ্ডলীর মধ্যে প'ড়ে একখানা চেয়ার পলকে দেশলাইয়ের বাক্সের মতই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অজগরটা রাগে অন্ধ হয়ে সেই ভাঙা চেয়ার লক্ষ্য ক'রেই উপরি-উপরি দুবার ছোবল মারলে।

ততক্ষণে এই বিষম ধুমধাড়াক্কা শুনে বাড়ির অন্যান্য লোকজন ছুটে এসে ঘরের বাইরে দরজার কাছেই স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, এবং জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবু লাফিয়ে উঠে পড়েছে ঘরের উঁচু খাটের উপরে। সেইখান থেকে মানিক আরো দু-বার রিভলবার ছুঁড়লে। কিন্তু সেই অতিকায় অজগর তবু কাবু হয়েছে ব'লে মনে হ'ল না।

জয়ন্ত চিৎকার ক'রে বললে, "বন্দুক, বন্দুক। আমার বন্দুক এনে ছোঁড়ো।

অজগরের ল্যাজটা একবার উঁচু হয়ে খাটের উপরে আছড়ে পড়ল—মজবুত খাটখানাও মড়-মড় আর্তনাদ ক'রে উঠল। সে-ল্যাজের একটা আঘাত যদি জয়ন্তদের কারুর গায়ে লাগে, তাহলে তখনি তার নিশ্চিত মৃত্যু। অজগরের ল্যাজ সিংহ, ব্যাঘ্র ও বড় বড় মোষকেও কাৎ ক'রে দেয়।

এর মধ্যে কে ছুটে গিয়ে বন্দুক নিয়ে এল। কিন্তু সে ঘরের ভেতরে

ঢুকতে সাহস করলে না ; দরজার কাছ থেকেই পরে পরে দু-বার গুলি-বৃষ্টি করলে ! মানিকও সাপের মাথা লক্ষ্য ক'রে আর একবার রিভলবার ছুঁড়লে।

অজগর মারাত্মক আক্রোশে খাটের একটা পায়াকে জড়িয়ে ধরলে, পায়াটা তখনি মড়াৎ ক'রে ভেঙ্গে গেল এবং খাটখানাও একদিকে নিচু হয়ে পড়ল ! টাল সামলাতে না পেরে সুন্দরবাবু খাটের নিচে প'ড়ে যাচ্ছিলেন, জয়ন্ত তাড়াতাড়ি তাঁকে টেনে নিয়ে অন্যপাশে স'রে গেল।

এই হ'ল অজগরের শেষ-প্রচেষ্টা ! তার মাথা তখন গুলির চোটে থেঁতলে গুঁড়িয়ে গেছে ! কিন্তু সে মরলেও তার দেহ দেখলে সেটা বুঝ-বার উপায় নেই, তা তখনো পাকসাট খাচ্ছে এবং কুণ্ডলী রচনা করছে —এ-কুণ্ডলীর মধ্যে এখনো কোন জীবজন্তু গিয়ে পড়লে আর তার রক্ষা নেই !

এই প্রাণহীন ভীম অজগরের দেহ তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত 'জীবন্ত' হয়ে ছিল !

সুন্দরবাবু তখন একেবারে মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন এবং মানিক খাটের উপরে দুই পা ছড়িয়ে বসে প'ড়ে গভীর উত্তেজনায় কাতর হয়ে ক্রমা-গত হাঁপাচ্ছে !

জয়ন্ত কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, "মানিক, আজ তুমি না থাকলে আমরা কেউ বাঁচতুম না "

মানিক হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "সে কথা এখন থাক। দেখ, সুন্দরবাবু 'হার্ট ফেল' করল কিনা !"

সুন্দরবাবুর যখন জ্ঞান হ'ল তখন তিনি প্রথমেই ব'লে উঠলেন, "আমি বেঁচে আছি তো ?"

জয়ন্ত বললে, "সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই !"

—"হুম ! সে অজগর-ব্যাটা কোথায় ?"

—"পরলোকে। তার দেহটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে এখান থেকে

টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

—"হুম! আমি আর তোমাদের বাড়িতে আসব না—এই নাক-কান মলছি।"

—"কেন সুন্দরবাবু?"

—"কেন? তাও আবার জিজ্ঞেস করছ! তোমার বাড়ি বিপজ্জনক। সেদিন শুনলুম, 'হাইড্রোজেন আর্সেনাইড'—ভগবান জানেন, সে কি জিনিস! আজ আবার দেখছি হ্যারিসন রোডের মতো লম্বা অজগর? কাল আবার এসে হয়তো দেখব আফ্রিকার সিঙ্গী, হিপো, গণ্ডার, হাতি। বাপ, এখানে কোন ভদ্রলোক আসে? হুম, তোমার বাড়িকে নমস্কার, আর আমি এমুখো হচ্ছি না।"

মানিক হেসে ফেলে বললে, "কিন্তু আপনি তো রিভলবার নিয়ে আসতে পারেন, আপনার ভয়টা কিসের?"

সুন্দরবাবু মুখ ভার ক'রে বললেন, "ঠাট্টা করো না মানিক! ওরকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না। কলকাতায় ঘরের ভেতরে অজগর দেখলে রিভলবারের কথা কারুর মনে থাকে?......কিন্তু অজগরটা এল কোত্থেকে? বাড়ির ওদিকে বাগানের মতো আছে দেখছি! জয়ন্ত, তুমি কি অজগর পোষো?

জয়ন্ত বললে, "না! ও-শখ এখনো আমার হয় নি। আমি বাগানে গিয়ে চারিদিকে দেখে এসেছি। খিড়কির দরজা খোলা থাকে না, কিন্তু আজ খোলা রয়েছে। খালের ধারে আমাদের বাড়ির কাছে রাতে লোক-চলাচল খুব কম। আমাদের খিড়কির পিছনে একটা সরু কানা গলি আছে—অত্যন্ত নোংরা গলি। সেখান দিয়ে কেউ হাঁটে না। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না; কিন্তু আমার বিশ্বাস, রাত-আঁধারে কেউ বা কারা এসে কোনরকমে এই অজগরকে নিয়ে বাগানে ঢুকে আমার ঘরের জানালায় তুলে দিয়েছে। অজগরটা নিশ্চয়ই তাদের পোষা।"

—"বল কি! কাদের এ কাজ?"

—"আমাদের শত্রুদের—যাদের কাছে 'হাইড্রোজেন আর্সেনাইড'

আছে, যারা মুকুন্দ নন্দীর গদীতে আর সদানন্দবাবুর বাড়িতে চুরি করেছে, যারা চায় না আমরা এ-ব্যাপারের মধ্যে থাকি!"

সুন্দরবাবু এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে বললেন, "হুম! তাহলে তোমার ধারণা, একই দল মুকুন্দ নন্দীর গদীতে আর সদানন্দের বাড়িতে চুরি করেছে?"

—"ধারণা নয় সুন্দরবাবু, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যেদিন মুকুন্দ নন্দীর গদীর ব্যাপারটা হাতে নিই, সেই দিনই কারা আমাদের শাসিয়ে চিঠি লিখেছিল। তারপর সদানন্দবাবুর বাড়ির চুরির পর থেকে আমাদের ওপরে তাদের রাগ যেন আরো বেড়ে উঠেছে। এবার নিয়ে তিন-তিনবার আমাদের হত্যা করবার চেষ্টা হ'ল। কিন্তু আর নয়, এই-বারে আসল অপরাধীকে অন্ধকার থেকে টেনে বার করতে হবে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "তুমি কি বলরাম চৌধুরীর ওপরে সন্দেহ কর?

জয়ন্ত যেন আপন মনেই বললে, "বলরাম চৌধুরী! পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে যে প্রথমে ধরা পড়ে, বহু বৎসর অজ্ঞাতবাসের পরে সত্তর বৎসর বয়সে আবার সে আবির্ভূত হয়েছে! না, না, এ অসম্ভব সুন্দরবাবু, অসম্ভব! নিশ্চয়ই এর মধ্যে গভীর কোন রহস্য আছে! তাহ'লে ভবতোষ মজুমদার কে? মানিক, এর মধ্যেই ভবতোষকে তুমি নিশ্চয়ই ভোলো নি—বিশেষ ক'রে তার চোখ দুটো?"

সুন্দরবাবু হতাশজনক মুখভঙ্গি ক'রে বললেন, "এই রে, আবার হেঁয়ালি! আচ্ছা জয়ন্ত, থাকো থাকো আর এমন হয়ে যাও কেন বল দেখি তুমি? হচ্ছিল বলরাম চৌধুরীর কথা, কোত্থেকে এল আবার ভবতোষ মজুমদার আর তার দুটো চোখ! বলি, তার দুটো চোখ নিয়ে আমরা করব কি? ধুয়ে খাবো? হুম, যত অনাসৃষ্টি!"

জয়ন্ত বললে, "চোখ নিয়ে অনেক-কিছু হয় সুন্দরবাবু, অনেক-কিছুই হয়! চোখ হচ্ছে মনের আরশি,—সে আরশিতে ভেসে ওঠে লুকানো স্বভাবের আসল ছবি! অসাধুর সমস্ত ছদ্মবেশের ভিতর থেকেই ঐ চোখদুটোই তাকে আগে ধরিয়ে দেয়। ভবতোষ মজুমদার হচ্ছে মানুষের

নাম, কিন্তু তার চোখ দুটো হচ্ছে শয়তানের চোখ। সে চোখের আসল ভাব ঢাকবার চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। যাবেই তো! চোখের আসল ভাব বেশিক্ষণ কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। ভবতোষও তা পারে নি! তার চোখ দুটো ভীষণ নয়, রহস্যময়!"

সুন্দরবাবু বললেন, "কি আপদ! কে ভবতোষ? তার চোখের এত ব্যাখ্যানা কেন?"

জয়ন্ত বললে, "বলব সুন্দরবাবু, তার কথা সব আপনাকে বলব। কিন্তু আপাততঃ আপনি একটু চুপ করুন—আমার মাথায় একটা ফন্দি আসছে, বোধহয় খুব ভাল ফন্দি!·· সুন্দরবাবু, আর একবার চা খেতে আপনার আপত্তি আছে? নেই? ওরে, আমাদের জন্যে তিন পেয়ালা চা দিয়ে যা!······সুন্দরবাবু, একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসুন, সব কথাই আপনাকে বলব!"—এই ব'লে সে জানালার ধারে গিয়ে বাইরের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল এবং মাঝে মাঝে এক এক টিপ নস্য নিতে লাগল।

সুন্দরবাবু একখানা চেয়ারের উপরে বসে প'ড়ে বিরক্তভাবে আপন মনে বললেন, "আমি তোমার ভবতোষের চোখের ইতিহাস শুনতে চাই না। চা খেয়েই আমি পাগলা গারদ থেকে পালাব।"

খানিক পরেই চাকর চায়ের 'ট্রে' নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকল।

জয়ন্ত ফিরে বললে, "সুন্দরবাবু, এই চোরদের ধরবার এক চমৎকার উপায় আমি আবিষ্কার করেছি। চা খেতে খেতে সব কথা আপনাকে বলছি।"

আচম্বিতে বাইরে থেকে গুড়ুম ক'রে একটা বন্দুকের আওয়াজ হ'ল এবং ঘরের দেওয়ালের উপরের একখানা বড় ছবির কাঁচ ঝনঝন ক'রে ভেঙে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত ধুপ ক'রে মেঝের উপর ব'সে পড়ল!

মানিক তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে গিয়ে আর্তস্বরে ব'লে উঠল, "জয়—জয়! কি হ'ল?" সে সভয়ে দেখলে, জয়ন্তের গাল বেয়ে

ঝরঝর ক'রে রক্ত ঝরছে।

সুন্দরবাবু একলাফে উঠে তাড়াতাড়ি ঘরের জানালাগুলো বন্ধ ক'রে দিলেন।

জয়ন্ত গালের উপরে রুমাল চেপে ধ'রে বললে, "ভয় নেই মানিক, ভয় নেই! এ-যাত্রাও বেঁচে গেলুম,—গুলি আমার গালের মাংস ঘেঁষে চ'লে গেছে! জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ানোই আমার ভুল হয়েছিল। আমি ভাবতে পারি নি যে, অজগর লেলিয়ে দেবার পরেও আমাদের স্যাঙাতরা বাইরে কোথাও লুকিয়ে থাকতে ভরসা করবে।"

মানিক বললে, "আমরা এ-কী ভয়ানক লোকের পাল্লায় পড়েছি!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! আমি আর চা খাব না। এখান থেকে কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেই বাঁচি!"

জয়ন্ত বললে, "মুখের চা ফেলে গেলে নরকে পচতে হয়। আসুন, পেয়ালা নিন, আমিও চা খাব। সুন্দরবাবু, যে ফন্দি আমি করেছি, দু'চার দিনের ভেতরেই এই চোর আর খুনীর দল আমাদের হাতের মুঠোয় ধরা পড়বে। তারা আমাদের রক্তপাত করেছে—আমি প্রতিশোধ চাই।"

দুটি হাঁচি ও দ্বাদশ দস্যু

যাকে বলে, রাত ঝাঁ ঝাঁ!

নবমীর চাঁদ এখন মড়ার মতন হলদে-মুখে যেন মিশিয়ে যেতে চাইছে পশ্চিম আকাশে। পৃথিবীর উপরে থমথম করছে না-আলো, না-অন্ধকার! দেখাও যায়, দেখাও যায় না!

এমন আলো-আঁধারির চেয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার ঢের ভাল লাগে। সমুদ্রের নীল জলের মতো, শূন্যের কালো অন্ধকার তার ভিতরের সমস্ত

বিভীষিকাকে একেবারে ঢেকে রাখে। কিন্তু খানিক তফাতে যদি একটা গাছের ডাল-পাতা নড়ে, এই আলোমাখা অন্ধকারে তাও স্পষ্ট নজরে আসে না—সন্দেহ হয় বুঝি কোন অপার্থিব ছায়া দেখলুম! দূর দিয়ে হয়তো একটা ভীতু শিয়াল ছুটে পালায়, আর আমাদের চোখে ধাঁধা লাগে—বুঝি কোন ভৌতিক দেহ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল!

রাতের সভায় আজ জন-মানবের সাড়া নেই। কেবল ঝিঁঝিপোকা আর কোলাব্যাঙের দল যেন পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটানা চেঁচিয়ে চলেছে! আর এ-পাড়া ও-পাড়ার কুকুরগুলো থেকে থেকে অকারণেই খাপ্পা হয়ে গলাবাজি ক'রে এ-ওকে দমিয়ে দেবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। তুই ধারে সারি সারি বাগানবাড়ি রাত্রের গভীর নির্জনতায় ঘুমিয়ে পড়েছে! মাঝে মাঝে গরিবদের তু-একখানা মেটে ঘর আর ছোট ছোট বস্তি—সেখানেও অনিদ্রার কোন লক্ষণই নেই। পথের তু'ধারে তেলের আলোগুলো নাচার হয়ে অত্যন্ত মিটমিট ক'রে জ্বলছে, যেন ঘুমিয়ে পড়তে পারলে তারাও বাঁচে। আশেপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে সজাগ জোনাকিরা কেবল ব্যস্ত হয়ে শূন্যপথে আনাগোনা ওঠা-নামা ছুটোছুটি করছে—তারা যেন স্বপ্নপরীদের ছোট্ট হাতে উড়িয়ে দেওয়া অগুন্তি খেলার ফানুস।

তুখানা বড় বড় মোটরগাড়ি যথাসম্ভব নীরবে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়েঅগ্রসর হচ্ছে। তাদের জানালায় জানালায় পর্দা তোলা, আরোহীদের দেখবার উপায় নেই।

তুখানা গাড়িই একখানা মস্তবড় বাগানবাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে-বাড়িখানার চারিদিক লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। তার কোন জানালায় আলোর আভাসটুকু পর্যন্ত নেই। ফটকও বন্ধ।

সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি এই প্রকাণ্ড বাগান-বাড়িখানা ভাড়া নিয়েছেন। তিনি মাসখানেকের জন্য কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন! তাঁর নাম নবাব মহম্মদ আলি খাঁ বাহাতুর।

আজ দিন-পনেরো ধ'রে নবাব-সাহেবকে নিয়ে কলকাতার লোকদের কৌতূহলের অন্ত নেই। কারণ নবাব-সাহেব হচ্ছেন একজন ধনকুবের। তাঁর হীরা-জহরতের ভাণ্ডার নাকি অফুরন্ত।

এই ভাণ্ডারের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়জনক হচ্ছে একছড়া হীরার হার। অনেক খবরের কাগজে এই অমূল্য রত্নহারের ছবি ও ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর নাকি এই রত্নহারটি নূরজাহানকে উপহার দিয়েছিলেন। তারপরে এই হারছড়া মোগল রাজবংশের ভিতরেই থাকে। নাদির শা দিল্লী লুটে ময়ূর-সিংহাসন পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোহিনূর ও এই রত্নহারের কোন সন্ধান পান নি। তারপর ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে আহম্মদ শা এসে কোহিনূরের সঙ্গে ঐ রত্নহারও কেড়ে নিয়ে যান। পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহ যখন আহম্মদের বংশধরকে হারিয়ে কোহিনূর পুনরধিকার করেন, তখন রত্নহারটিও তাঁর হস্তগত হয়। তারপর কোহিনূর যায় ইংরেজদের হাতে, কিন্তু কেমন ক'রে ঐ হারছড়া যে নবাব-সাহেবের পূর্বপুরুষের অধিকারে আসে, সে ইতিহাস কেউ জানে না। সম্প্রতি একজন বড় জহুরী হারছড়া পরীক্ষা ক'রে ব'লে গেছেন, তার এখনকার বাজারদর এককোটি টাকার কম নয়।

ঐ ঐতিহাসিক হারছড়া একবার খালি চোখে দেখে ধন্য হবার জন্যে নবাব-সাহেবের বাড়িতে প্রতিদিন দলে দলে দর্শক এসে ভিড় করেছে। দর্শকদের আগ্রহে বাধ্য হয়ে নবাব-সাহেব রত্নহারছড়াকে তাঁর বৈঠকখানায় নামিয়ে এনে একটি গ্লাস-কেসের ভিতরে রেখে দিয়েছেন। বৈঠকখানার দরজায় দিবারাত্র সর্বদাই একজন সশস্ত্র সেপাই পাহারা দেয়।

এইবারে সেই রহস্যময় মোটরগাড়ি দুখানা কি করে দেখা যাক।

একখানা গাড়ির ভিতর থেকে দুজন লোক নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। তারপর চোরের মতো সন্তর্পণে এগিয়ে নবাব-সাহেবের বাড়ির এপাশে-ওপাশে উঁকিঝুঁকি মেরে আবার মোটরের কাছে ফিরে এসে দাঁড়াল।

গাড়ির ভিতর থেকে খুব মৃদুস্বরে কে বললে, "পথ সাফ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছে।"

তার সঙ্গী বললে, "কিন্তু ভিতরে বৈঠকখানার সেই সেপাই ঘুমোচ্ছে কিনা জানি না।"

গাড়ির লোকটি বললে, "তা জানবার দরকার নেই। সেই সেপাই-ব্যাটা আমার কাছ থেকে অনেক টাকা ঘুষ খেয়েছে। সে আমাদের বাধা দেবে না। বাড়ির ডানদিকের ঐ গলিতে যাও। রেলিং টপকে ফটকটা খুলে দাও। সাবধান, যদি কোন দারওয়ান জেগে ওঠে, তখনি তার মুখ বন্ধ করবার ব্যবস্থা করবে—বুঝেছ? যাও।"

অল্পক্ষণ পরেই একে একে বারোজন লোক ঠিক ছায়ামূর্তির মতো নিঃশব্দেই নবাব-সাহেবের বাড়ির ফটক পার হ'ল। মোটর দুখানা দূরেই দাঁড়িয়ে রইল,—কিন্তু তাদের কল সমানে চলতে লাগল।

নূরজাহানের রত্নহার আজ আবার বুঝি আর-একজনের হাতছাড়া হয়!

অনেককালের পুরানো বাগান—চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ মাটির উপরে মস্ত মস্ত অন্ধকার সৃষ্টি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। আসল মালিকের যে বাগানের সৌন্দর্য-রক্ষার দিকে তেমন দৃষ্টি নেই, তাও বেশ বোঝা যায়। কারণ সর্বত্রই সাজানো ফুলগাছের চেয়ে এলোমেলো ঝোপঝাপই বেশি। নবাব-সাহেবের মতো ধনী ও শৌখিন লোকের পক্ষে এ-রকম বাগানবাড়ি ভাড়া নেওয়া উচিত হয় নি।

ঐ-সব ঝোপঝাপের পাশ দিয়ে, বড় বড় গাছের ছায়ার ভিতর দিয়ে, নিবিড়তর ছায়ার মতো লোকগুলো একে-একে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! কেবল একজন লোক একটা মস্ত আমগাছের তলায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল পাথরের প্রতিমূর্তির মতো। বোধ হয় সে পাহারা দিতে লাগল।

অতগুলো লোক বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে, কিন্তু তবু সেখানে খুব-অস্পষ্ট কোন শব্দও জেগে উঠল না। বাগানও গোরস্থানের মতো নিস্তব্ধ।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতাকে চমকিত ক'রে পাশের ঝোপের ভিতর

থেকে কে হেঁচে উঠল—হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো!

গাছের তলায় যে পাহারা দিচ্ছিল, সে আঁতকে লাফিয়ে উঠল এবং পরমুহূর্তেই ডান-হাতের রিভলবার ধ'রে ঝোপ লক্ষ্য ক'রে গুলিবৃষ্টি করতে ও বাঁ-হাতে একটা বাঁশি বার ক'রে খুব জোরে বাজাতে লাগল!

ঝোপের ভিতর থেকে অমনি কে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, "হুম। জমাদার, সেপাই, জয়ন্ত!"

সারা বাগানখানার ভিতরে চারিদিকে দুদ্দাড় পায়ের শব্দ জেগে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে নানা কণ্ঠের চিৎকার ও ঘন ঘন রিভলবারের শব্দ। রাত্রের সমস্ত তন্দ্রা-স্তব্ধতা ছুটে গেল এক সেকেণ্ডে।

যে ঝোপে হাঁচির জন্ম, তার ভিতর থেকে আবির্ভূত হ'ল সুন্দর-বাবুর বিশাল ভুঁড়ি। কিন্তু বাড়ির দিক থেকে সাত-আটজন লোক রিভলবার ছুঁড়তে ছুঁড়তে তীরের মতো বোঁ-বোঁ ক'রে ছুটে আসছে দেখে সুন্দরবাবু "হুম।"—ব'লে আবার ভুঁড়িসুদ্ধ ঝোপের ভিতর ঝম্প প্রদান করলেন।

আরো নানা ঝোপের ভিতর থেকে পাহারাওয়ালার পর পাহারা-ওয়ালা বেরিয়ে আসতে লাগল—এখানকার সমস্ত ঝোপঝাপই যেন কেবল পাহারাওয়ালায় ভরা!

খানিক তফাত থেকে জয়ন্তের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"জমাদার, ঐদিকে। মানিক এইদিকে। আরে—আরে—শীগগির।"

সুন্দরবাবু ঝোপের ভিতর থেকে খুব সাবধানে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, আর কেউ এদিকে ছুটে আসছে না। তখন তিনি আর একবার বাইরে লাফিয়ে এসে চেঁচাতে শুরু করলেন—"সেপাই, সেপাই। জলদি। ডাকু-লোক ভাগ্‌তা হ্যায়। পাকড়ো, পাকড়ো।"

জয়ন্ত বেগে ছুটে সেইখানে এসে দাঁড়িয়ে দেখলে, চোরেরা সকলেই অদৃশ্য হয়েছে, কেবল একজনকে তখনো দেখা যাচ্ছে—পরমুহূর্তে সেও মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে যাবে!

সে আর ইতস্ততঃ করলে না, পলাতকের পায়ের দিকে লক্ষ্য ক'রে

রিভলবার ছুঁড়লে এবং সে-লোকটাও টক্কর খেয়ে মাটির উপরে মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেল।

সুন্দরবাবু মহা আনন্দে নৃত্য করতে করতে ব'লে উঠলেন, "এক ব্যাটা কুপোকাৎ! এক ব্যাটা কুপোকাৎ! উল্লুক, শুয়োর। আমাকে টিপ ক'রে গুলি ছোঁড়া? এখন কেমন জব্দ। বাহাদুর জয়ন্ত।"

কিন্তু জয়ন্ত তাঁর কথা কানেও তুললে না, সে আহত লোকটার দিকে ছুটে এগিয়ে গেল—তার পিছনে পিছনে মানিকলাল।

আহত ব্যক্তি মাটির উপরে উঠে বসে তুই হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আচম্বিতে আবার একবার রিভলবারের শব্দ হ'ল এবং সেও আর্তনাদ ক'রে আবার ঘুরে পড়ে গেল।

তারপরেই ট্রাঙ্ক রোডের উপর তুখানা মোটরগাড়ি গর্জন ক'রে ছুটতে লাগল।

জয়ন্ত যখন সেই ভূপাতিত লোকটার কাছে এসে পড়ল, তখন সে আর নড়ছে না। তাড়াতাড়ি তার বুকে হাত দিয়ে দেখে বললে,

"মানিক, এ আর এ-জীবনে চুরি করবে না।"

মানিক বললে, "কিন্তু জয়, সব-শেষে রিভলবার ছুঁড়লে কে?"

—"চোরেরা। আমি একে মারতে চাই নি, তাই এর পায়ে গুলি করেছিলুম। কিন্তু একে বধ করলে এর দলের লোকেরাই।"

—"সে কি?"

—"হ্যাঁ। পাছে ওদের আহত সঙ্গী সমস্ত গুপ্তকথা ফাঁস ক'রে দেয়, সেই ভয়ে। আমি একে জ্যান্তো ধরবার চেষ্টা করেছিলুম, ওরা আমার সে আশায় ছাই দিয়ে গেল।"

এমন সময়ে সুন্দরবাবু সেখানে হাঁসফাঁস করতে করতে এসে হাজির! চিৎকার ক'রে বললেন "কোথায় সেই ডাকাত-ব্যাটা? এই-বারে মজাটা দেখিয়ে দিচ্ছি!"

জয়ন্ত তিক্তস্বরে বললে, "সুন্দরবাবু, আজ পনেরো দিন ধ'রে যে ফাঁদ পাতলুম—নকল নবাব-সাহেব, ঐতিহাসিক জাল রত্নহার, খবরের কাগজে কাগজে অমূলক আন্দোলন, চোরেদের মিথ্যে লোভ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলা,—কিন্তু সমস্ত পণ্ড ক'রে দিলে আপনার ঐ বিদ্‌কুটে হাঁচি! আটাশ বছর পুলিসে চাকরি করছেন, দুটো হাঁচি চাপতেও পারলেন না? ঘাটে এনে নৌকো ডোবালেন? ছিঃ!"

কিছুমাত্র দমে না গিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, "হুম। যে-রকম হাঁচি আমার এসেছিল, কোন ভদ্রলোকই সে-রকম বিশ্রী হাঁচি সামলাতে পারে না। আমি অন্যমনস্ক হলুম, মাথা-ঝাঁকানি দিলুম, দুহাতে মুখ চাপলুম, কিন্তু কিছুতেই কিচ্ছু হ'ল না—সে ভয়ঙ্কর ভণ্ডুলে হাঁচি মুখ ঠেলে বেরিয়ে এল একেবারে তেড়ে-ফুঁড়ে। আমার দোষ কি?"

জয়ন্ত বললে, "আমারই ভাগ্যের দোষ! আর পাঁচ মিনিট পরে হাঁচলে পালের গোদা ভবতোষের সঙ্গে সমস্ত দলটাকেই আমরা গ্রেপ্তার করতে পারতুম।"

জয়ন্তের পিঠ চাপড়ে সুন্দরবাবু বললেন, "এত সহজে মুষড়ে পোড়ো না ভায়া, ভয় কি? ইস্কুলের কেতাবে পড়ো নি—"ট্রাই ট্রাই

ট্রাই এগেন'? চেষ্টা কর, চেষ্টা কর আবার চেষ্টা কর। চেষ্টায় কী না হয়?"

মানিক বললে, "কিন্তু জয়, তুমি তো সুন্দরবাবুর বাহাদুরিটা দেখছ না। ওঁর দুটি মাত্র তুচ্ছ হাঁচির ভয়ে বারো-বারোজন জোয়ান ও জ্যান্তো ডাকাত এক দৌড়ে পালিয়ে গেল! একেই বলি বীরত্ব!"।

সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচকে বললে, "ঠাট্টা কোরো না মানিক, ও-রকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না।......হুম! এইবারে দেখা যাক, এ ডাকাতটা কি বলে।"

জয়ন্ত শুকনো হাসি হেসে বললে, "ও আর এ-জীবনে আপনার সঙ্গে কথা কইবে না।"

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, "তা'হলে ও ম'রে গিয়েছে?··· দেখছি, আজকের যাত্রাই খারাপ! যাক, তবে ওর মুখখানাই দেখি! মানিক, তোমার 'টর্চ'টা ওর মুখের ওপর ধর তো একবার!......ও বাবা, ও কী! ও কি মানুষের মুখ?"—তিনি চমকে দু পা পিছিয়ে এলেন!

জয়ন্ত বললে, "ভয় নেই সুন্দরবাবু, ও ভূত-টুত নয়। ওর মুখে বিষাক্ত গ্যাস থেকে বাঁচবার মুখোশ আছে, গ্যাশের মুখোস দেখতে এমনি বেয়াড়াই হয়।"

—"গ্যাসের মুখোশ? কেন?"

—"আপনি কি এর মধ্যেই 'হাইড্রোজেন আর্সেনাইডে'র কথা ভুলে গেলেন? এখানেও ঐ গ্যাস ব্যবহার করবার জন্যে ওরা প্রস্তুত হয়ে এসেছিল!" এই ব'লে জয়ন্ত মৃতদেহের মুখোশ খুলে দিলে।

লোকটির দেহ অত্যন্ত বলিষ্ঠ, গায়ের ডুমো ডুমো মাংসপেশীগুলো যেন চামড়া ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখখানা ভয়ানক, দেখলেই দুর্গা-প্রতিমার অসুরের মুখ মনে পড়ে! কপালের বাঁ-দিকে, ভুরুর উপর থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বিস্তৃত প্রচণ্ড একটা পুরানো ক্ষতচিহ্ন,—এমন মারাত্মক চোট খেয়েও কেউ যে বেঁচে থাকতে পারে, স্বচক্ষে না দেখলে তা বিশ্বাস হয় না!

মানিক শিউরে উঠে বললে "কী ভয়ানক!"

সুন্দরবাবু তার মুখ দেখে এমন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যে, খানিকক্ষণ একটাও কথা কইতে পারলেন না! তারপর তিনি অত্যন্ত বিস্মিত স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, "না, না—এ অসম্ভব! আমি কি স্বপ্ন দেখছি? আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে···মানিক, 'টর্চে'র আলোটা আরো ভাল ক'রে এর মুখের ওপর ফেল তো!···না, না, এ যে একেবারে সেই মুখ! কপালের সেই বিষম কাটা দাগটা পর্যন্ত যে মিলে যাচ্ছে! জয়ন্ত, আমার মাথা ঘুরছে, তুমি একবার এর বুকটা খুলে দেখ তো, ডান-দিকে একটা এক-বিঘৎ-লম্বা লাল জড়ুলের দাগ আছে কিনা! আমার ভয় করছে, আমি পারব না।"

জয়ন্ত লাশের জামার বোতামগুলো খুলে ফেললে। তার বুকের ডানদিকে সত্যসত্যই একটা এক-বিঘৎ-লম্বা লাল জড়ুলের দাগ রয়েছে। সে বললে, "সুন্দরবাবু, আপনি একে চেনেন নাকি?"

সুন্দরবাবু বললেন, "চিনি বললে বলতে হয়, চোখের সামনে আমি একটা ভূতের মড়া দেখছি!···হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। মহম্মদ একবার এদিকে এগিয়ে এস তো! এ ক'দিন তো নকল নবাব-সাহেব সেজে খুব আয়েস ক'রে নিলে, এখন একটা কাজ কর দেখি। তুমি হচ্ছ আমারই মতো পুলিসের পুরানো লোক। এই লাশটা কি সনাক্ত করতে পারো?"

মহম্মদ এগিয়ে এসে মৃত ব্যক্তিকে দেখেই সভয়ে ও সবিস্ময়ে চিৎকার ক'রে উঠল!

সুন্দরবাবু সাগ্রহে বললেন, "কে এ মহম্মদ? তুমি চিনতে পেরেছ?"

—"হাঁ হুজুর! এ মহাদেও কাহার!"

সুন্দরবাবু চিৎকার ক'রে বললেন, "তাহ'লে আমার সন্দেহ মিথ্যা নয়,—এ মহাদেও কাহার!"

জয়ন্ত বললে, "মহাদেও কাহার! কে সে?"

সুন্দরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "আমি যখন সবে পুলিসে চাকরি নিয়েছি, মহাদেও কাহার ছিল তখন এক নামজাদা ডাকাত! সে নিজের হাতে কত মানুষ খুন করেছে, তা আর গুণে বলা যায় না।

অনেক কষ্টে তাকে আমরা গ্রেপ্তার করি। তার ওপরে ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির আগেই সে জেল ভেঙে পালায়। কিন্তু হাওড়ার পোলের কাছে পুলিস তাকে আবার ধ'রে ফেলে। তবু কোনগতিকে পুলিসের হাত ছাড়িয়ে মহাদেও গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও আর তাকে বা তার লাশকে পাওয়া যায় না। আমরা সবাই জানি সে ম'রে গিয়েছে। কারণ আজ সাতাশ বৎসরের মধ্যে মহাদেওকে কেউ চোখে দেখে নি। সাতাশ বৎসর আগে যে গঙ্গাজলে ডুবে মরেছে, আজ সেই মহাদেওর লাশ আবার আমরা খুঁজে পেলুম।"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "না, না সম্পূর্ণ অসম্ভব!"

মানিক বললে, "এ লোকটার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসরের বেশি হ'তে পারে না। এ অসম্ভব কথা।"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমিও বলি, এ অসম্ভব কথা! কিন্তু তার চেয়েও অসম্ভব কি জানো? সাতাশ বছর আগে মহাদেও যখন পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন তার বয়স ছিল ঠিক পঁয়ত্রিশ বৎসর। তা'হলে আজ তার বয়স হ'ত বাষট্টি বৎসর! কিন্তু এই কি বাষট্টি বৎসরের বৃদ্ধের দেহ? অথচ এ যে সেই মহাদেও, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই। সেই মুখ-চোখ, কপালের বাঁদিকে সেই কাটা দাগ, বুকের ডানদিকে সেই জড়ুলের চিহ্ন!"

জয়ন্ত অস্ফুট কণ্ঠে বললে, "বলরাম চৌধুরী! পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের পরে অদৃশ্য হয়ে সত্তর বৎসর বয়সে আবার দেখা দিয়ে চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি করছে! তার ওপরে আবার মহাদেও কাহার! পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে জলে ডুবেছে, বাষট্টি বৎসর বয়সে ডাঙ্গায় উঠে আবার মরল, কিন্তু এই সাতাশ বৎসরে তার চেহারা একটুও বদলায় নি! —আমাদের সকলের মাথাই কি একসঙ্গে বিগড়ে গিয়েছে? যা নয় তাই!"

সুন্দরবাবুর তৈরি রিভলবার

জয়ন্ত ও মানিক দুজনে দুখানা ইজিচেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়েছিল। জয়ন্তের চোখ মোদা—বোধহয় কিছু ভাবছে; মানিকের চোখ খোলা—বোধহয় কড়িকাঠ গুণছে।

হঠাৎ মানিক ব'লে উঠল, "জয়, আজকের কাগজ পড়েছ ?"

জয়ন্ত চোখ বন্ধ রেখেই বললে "না। আজকালকার খবরের কাগজে খবর থাকে না—অর্থাৎ আমি যে-রকম খবর চাই।"

মানিক বললে, "আজকের কাগজ ও-কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তোমার মনের মতো খবর দিয়েছে।"

জয়ন্ত বললে, "আচ্ছা, আগে খবরটা তোমার মুখে শুনি, তারপর আমি চোখ খোলবার চেষ্টা করব।"

—"শ্যামবাজারের মস্ত ধনী তারিণী বিশ্বাসের বাড়িতে কাল রাত্রে একটা বড় চুরি হয়ে গেছে। প্রায় ত্রিশহাজার টাকার জড়োয়া গয়না অদৃশ্য হয়েছে।"

—"হ্যাঁ, এমন খবর শুনে চোখ খুলতে পারা যায় বটে! তারপর ?"

—"ঘটনাস্থলে বাড়ির একজন দ্বারবানের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কি-ক'রে তার মৃত্যু হয়েছে এখনো জানা যায় নি। তার দেহের কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।"

জয়ন্ত বললে, "হাইড্রোজেন আর্সেনাইড!"

মানিক বললে, "সে কি! তুমি কি এটাও ভবতোষের কীর্তি ব'লে মনে কর ?"

—"খুব সম্ভব তাই। কারণ 'হাইড্রোজেন আর্সেনাইড' যাদের মারে, তাদের মৃত্যুর কারণ ধরা বড় কঠিন। ডাক্তাররা হয়তো ঐ

দারবানের দেহ পরীক্ষা ক'রে বলবেন, হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে তার মৃত্যু হয়েছে।"

মানিক বললে, "জয়, ভবতোষের অপরাধ সম্বন্ধে যখন কোনই সন্দেহ নেই, তখন এমন ভয়ানক লোককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন?"

—"মানিক, তুমি ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ! হ্যাঁ, আমরা জানি বটে এ-সব কাণ্ডের মূলে আছে ভবতোষই। কিন্তু আদালত তা শুনবে কেন? চাক্ষুষ প্রমাণ কোথায়?"

মানিক খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, "আচ্ছা জয়, সেই যে মোটরবোট নিয়ে কাফ্রীরা আমাদের আক্রমণ করেছিল, পোর্ট-পুলিস তার কোন পাত্তা পেলে?"

জয়ন্ত বললে, "ও, সে খবরটা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি! সে মোটরবোটখানা যে ভবতোষের, এটুকু জানতে পারা গিয়েছে।"

মানিক চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বললে, "তবে? অন্ততঃ আমাদের আক্রমণ করার জন্যে তো মূল চক্রী ব'লে ভবতোষকে গ্রেপ্তার করা যায়?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "বোসো মানিক, বোসো,—অত ব্যস্ত হয়ো না। তুমি কি ভবতোষকে এমনি কাঁচাছেলেই মনে করেছ? ঘটনার পরদিনই খবরের কাগজে কি বিজ্ঞাপন দেখলুম জানো? ভবতোষ এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়েছে···'আমার ত্রিবেণীর বাগানের ঘাট থেকে একখানা মোটরবোট আজ তুই দিন হ'ল চুরি গিয়েছে। যিনি তার খোঁজ দিতে পারবেন তাঁকে একশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে'—প্রভৃতি।"

মানিক বললে, "তারপর?"

—"তারপর আর কি, পোর্ট-পুলিস সেই মোটরবোটখানাকে বাগবাজারের খালের ভিতরে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু বোটে তখন কেউ ছিল না।"

মানিক বললে, "বুঝেছি! এখন ভবতোষকে প্রশ্ন করলে সে বলবে,—'বোট যে চুরি করেছে সমস্ত দোষ তার', আর চোর যখন পলাতক, তখন কেউ তাকে ছুঁতেও পারবে না!"

—জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেইরকমই দাঁড়িয়েছে বটে।
···মানিক, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে! খুব ভারী ভারী পায়ের শব্দ।
নিশ্চয় সুন্দরবাবু আসছেন—ওঁর ভুঁড়ির ভারেই পায়ের শব্দ অত ভারী!"

সুন্দরবাবু ঘরের ভিতরে ঢুকেই ব'লে উঠলেন, "জয়ন্ত, আমার মান আর চাকরি—দুইই বুঝি যায়! আমার এলাকায় উপরি-উপরি এতগুলো চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম—অথচ একটারও কিনারা হ'ল না! কেন বাবা, শহরে তো আরো ঢের থানা আছে, তাদের এলাকায় যা না! একলা আমার ওপরেই এত অত্যাচার কেন?"—ব'লেই তিনি ধপাস ক'রে একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন।

মানিক বললে, "আপনার সেই দুটো মারাত্মক হাঁচির কথা···সেই বারোজন ডাকাত তাড়ানো বলিষ্ঠ হাঁচির কথা স্মরণ করুন! আপনার মান আর চাকরি যদি যায়, তবে সেই দুটো হাঁচির জন্যেই যাবে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "ঠাট্টা কোরো না মানিক! মরছি নিজের জ্বালায়, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিও না!"

জয়ন্ত বললে, "আচ্ছা সুন্দরবাবু, তারিণী বিশ্বাসদের দ্বারবানের লাশ যেখানে পেয়েছেন, সেখানেও নিশ্চয় খুব-মিহি কাঁচের গুঁড়ো ছড়ানো ছিল?"

সুন্দরবাবু সচমকে ব'লে উঠলেন, "হুম! এ কথা তুমি জানলে কেমন ক'রে? হ্যাঁ, কাঁচের গুঁড়ো ছিল বৈকি!"

জয়ন্ত বললে, "যা ভেবেছি তাই! আবার 'হাইড্রোজেন আর্সেনাইড'! আবার সেই ভবতোষ মজুমদার।"

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, "তোমার ঐ হাইড্রোজেন না মাথামুণ্ডু আর ভবতোষই আমাকে হত্যা না করুক, পাগল না ক'রে ছাড়বে না! এ কী প্যাঁচে পড়লুম রে বাবা, কোন হদিসই পাওয়া যায় না।"

এমন সময়ে ঘরে আর এক ব্যক্তির আবির্ভাব হ'ল! তার পরনে তালিমারা ময়লা কাপড়, গায়ে ধুলোমাখা ছেঁড়াখোঁড়া চাদর আর মাথার চুলগুলো রুক্ষ উশকোখুশকো।

তাকে দেখেই সুন্দরবাবু তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে পকেট থেকে রিভলবার বার করলেন, এবং ষাঁড়ের মতো গর্জন ক'রে বললেন, "চুপ ক'রে ঐখানে দাঁড়াও! আর এক পা এগিয়েছ কি গুলি ক'রে মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছি!"

জয়ন্ত বললে, "ভয় নেই সুন্দরবাবু, ভয় নেই! ও শত্রু নয়, আমারই চর!"

মানিক বললে, "ওঃ, সুন্দরবাবু কি চটপটে! রিভলবার একেবারে তৈরি!"

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, "ঠাট্টা কোরো না মানিক! তুমি কি জানো না, তোমাদের বাসাটা বাঘের খাঁচার চেয়েও বিপজ্জনক? হাইড্রোজেন না কি আছেন, অজগর সাপ আছেন, আরো যে কত কি আছেন না-আছেন, কেমন ক'রে বুঝব বাবা? হুম! ভদ্দরলোকের বাড়ির ভেতরে এমন দুশমন চেহারা দেখলে কার না ভয় হয়?"

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, "সে কথা ঠিক! কিন্তু আমার এই চরটি যে এখন ছদ্মবেশে আছে। ও আমারই একটা কাজে গিয়েছিল।...... তারপর শিবলাল, ব্যাপার কি? কোন খবর আছে?"

আগন্তুক জয়ন্তের কাছে এসে চুপিচুপি বললে, "সেই বজরাখানা ঘুষুড়ীর কাছে এসে নঙ্গর করেছে। তার সঙ্গে একখানা মোটরবোটও আছে।"

—"আচ্ছা, তুমি এখন যাও।"

শিবলাল অদৃশ্য হ'ল। জয়ন্ত ফিরে বললে, "এস মানিক, আমাদের এখনি বেরুতে হবে। সুন্দরবাবু, আপনি আপাততঃ এখানে ব'সে বিশ্রাম করুন, চা-টা যা দরকার হবে, হুকুম করলেই আসবে।"

—"আর তোমরা?"

—"আমরা এখন নৌকোয় চ'ড়ে গঙ্গায় বেড়াতে যাব। আমি বাঁশি বাজাবো আর মানিক গান গাইবে। এস মানিক!"

জয় ও মানিক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু নিজের মনেই বললেন, "হুম! বরাবরই জানি, ছোকরা-দের মাথা খারাপ! ওরা কি যে বলে আর কি যে করে, কিছুই বোঝবার যো-নেই! আবার ব'লে গেল, হুকুম করলেই চা পাবেন বাব্বাঃ! এ-বাড়িতে একলা খানিকক্ষণ থাকলে আর রক্ষে আছে!"

আবার সেই আঙুল-কাটা বলরাম চৌধুরী

জয়ন্ত ও মানিক আজকেও একখানা পানসিতে চ'ড়ে ওপারে ঘুষুড়ীর দিকে চলল। দূর থেকেই দেখা গেল, সেই পরিচিত বাহারী বজরাখানা গঙ্গার উপরে ভাসছে এবং তার সঙ্গে রয়েছে একখানা মোটরবোট।

মানিক জিজ্ঞাসা করলে, "সেদিন এই বজরা দেখতে এসেই আমরা বিপদে পড়েছিলুম। আবার আজ—"

জয়ন্ত তার মুখের কথা কেড়ে নিয়েই বললে, "আবার আজ এই বজরা দেখতে গিয়েও আমরা বিপদে পড়তে পারি। তবু আমি ওখানে যাব।"

—"কেন?"

—"সেদিন ঐ বজরাতে উঠেছিলুম ব'লেই আসল অপরাধীকে চেনবার উপায় হয়েছিল। আবার দেখতে চাই, নতুন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না!"

—"কোন অছিলায় বজরায় গিয়ে উঠবে?"

—"বলব, বজরাখানা খুব ভাল লেগেছে, তাই আবার দেখতে এসেছি। কিংবা অন্য কোন ছুতো!"

—"ভবতোষ বিশ্বাস করবে কেন?"

—"বিশ্বাস না করুক, বাইরে মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারবে না। খুব সম্ভব, আমাদের সন্দেহ দূর করবার জন্যে এবারে সে আর কোন

গোলমাল করবে না। আর গোলমাল যদি করেই, বিপদে যদি পড়ি, তাহলে আমরাও প্রস্তুত। এ-সব কাজে সিদ্ধিলাভ হয় কেবল বিপদ-আপদের মাঝখান দিয়েই।...এই যে, আমরা বজরার কাছে এসে পড়েছি। মানিক, হুঁশিয়ার থাকো, চোখ-কান সজাগ রাখো।"

বজরার উপরে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। সে একদৃষ্টিতে পানসির গতিবিধি লক্ষ্য করছিল

পানসিখানা বজরার গায়ে গিয়ে লাগল। জয়ন্ত শুধোলে, "ভবতোষ-বাবু আছেন?"

—"আছেন"

—"আমরা তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব।"

—"ওপরে আসুন।"

জয়ন্ত ও মানিক বজরার উপরে গিয়ে উঠল।

—"ভবতোষবাবু কোথায়?"

লোকটা হাত তুলে একটা দিক দেখিয়ে দিলে।

তারা সেইদিকে এগুলো।...হঠাৎ ছাদে ওঠবার সিঁড়ির পাশ থেকে তুজন লোক বেরিয়ে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারাও সতর্ক ছিল, পাশ কাটিয়ে এক লাফে পাশের ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। কিন্তু সেখানেও জন-চারেক লোক যেন তৈরি হয়েই দাঁড়িয়েছিল। তারাও এত তাড়াতাড়ি আক্রমণ করলে যে, জয়ন্ত ও মানিক আত্মরক্ষা করবার অবসর পর্যন্ত পেলে না। তারা সকলে মিলে তাদের তুজনের হাত ও পা শক্ত ক'রে বেঁধে ফেললে। তারপর তাদের সেই অবস্থায় সেইখানেই ফেলে রেখে সকলে বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

শোনা গেল, দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে একজন বলছে, "হতভাগারা যে এমন বোকার মতো সাধ ক'রে মরতে আসবে, তা আমি জানতুম না। এখন বোটে ক'রে কেউ গিয়ে বড়বাবুকে এই সুখবরটা দিয়ে আসগে যা। তিনি এসে ওদের ব্যবস্থা করুন।"

আর-একজন বললে, "কিন্তু পানসির লোকগুলো যদি ওদের খোঁজে?"

—"মাঝির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বল যে, বাবুরা এখন যাবেন না।"

আর-একজন কে বললে, "ওদের এ-ঘরে রাখা হয়েছে দেখলে বড়-বাবু বোধ হয় রাগ করবেন।"

—"ওরা নিজেরাই যে ও-ঘরে ঢুকে পড়ল! তা, আজ ওরা ওখানে যা দেখবে, সে কথা কি পরে আর কারুকে বলবার দিন পাবে? এখন যা, যা—দেরি করিস নে!"

তারপর কতকগুলো পায়ের শব্দ এবং তারওপর সব স্তব্ধ।

বিপদ যে এমন অভাবিতভাবে অতর্কিতে তাদের ঘাড়ের উপরে এসে পড়বে, জয়ন্ত সেটা কল্পনা করতে পারে নি মোটেই। সে ভেবেছিল, এমন পরিষ্কার দিনের বেলায় এরা তাদের সাদর অভ্যর্থনা না করলেও এতটা বেপরোয়ার মতো কাজ করবে না, অন্ততঃ খানিকক্ষণ ভাববে এবং তারা যথাসময়েই সাবধান হ'তে পারবে! সে নিজের সৌভাগ্যের উপর বড়-বেশি নির্ভর ক'রে একরকম নির্বোধের মতোই এখানে এসেছিল, ভাগ্যদেবী কিন্তু তার পানে মুখ তুলে চাইলেন না!

মানিকেরও রাগ হচ্ছিল তার বন্ধুর উপরে। মুখ বাঁধা, ভাষায় রাগ প্রকাশ করবার উপায় নেই, তাই অত্যন্ত ভর্ৎসনা-ভরা চোখে সে জয়ন্তের দিকে মুখ ফেরালে।

কিন্তু জয়ন্তের মুখ-চোখের অদ্ভুত ভাব দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং তার দৃষ্টির অনুসরণ ক'রে সেও ঘরের একদিকে তাকিয়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল!

পরে পরে দুটো কফিনের মতো গ্লাস-কেস সাজানো রয়েছে এবং তাদের ভিতরে শোয়ানো রয়েছে কী ও-দুটো? মোমের মূর্তি? না—না, মৃতদেহ! মানুষের মৃতদেহ!

একটা হচ্ছে অত্যন্ত ঢ্যাঙা এক হাবসীর মড়া, তার দেহ যেন কষ্টি-পাথরে ক্ষোদা!

আর একটা হচ্ছে বাঙালীর মড়া! সেও খুব লম্বা-চওড়া জোয়ান, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ও কুৎসিত তার মুখ যে, দেখলে শয়তানও যেন

ভয়ে আঁতকে উঠবে।

আর—আর তার ডান-হাতের বুড়ো আঙুলটা নেই।

এই কি সেই বলরাম চৌধুরী? কিন্তু তার বয়স তো সত্তর বছর! আর, এর মাথার চুল কালো-কুচকুচে, দেহও যুবকের মতোই জোয়ান।

আর, ঐ কি সেই হাবসীটা,—মোটরবোটে চ'ড়ে সেদিন যে তাদের আক্রমণ করেছিল? কিন্তু তারা মরল কেমন ক'রে? আর তাদের দেহ এমন কাঁচের কেসেই বা রাখা হয়েছে কেন?

বড়বাবুর আগমন

এ কি অসম্ভব রহস্য। পুলিসের রেকর্ড মানলে বলতে হয়, এই বলরাম চৌধুরী ও হাবসী ভূতটার মৃত্যু হয়েছে বহু বৎসর আগে এবং বেঁচে থাকলেও আজ তারা থুত্থুড়ো বুড়ো হয়ে পড়ত। কিন্তু এরা এত-দিনে মরেও নি, বুড়োও হয় নি। আজ তারা সত্যসত্যই মরেছে বটে, কিন্তু তাদের দেহে বার্ধক্যের আভাসটুকু পর্যন্ত নেই। তবে কি ঐ যৌবনের ভাবটা মিথ্যা, নকল। ওদের দেহের উপরে কি ছদ্মবেশ আছে? এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ, যা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতেও ধরা পড়ে না?

আবার মানিকের মনে সেই প্রশ্ন জাগল—কিন্তু এরা হঠাৎ মরল কেন এবং কেমন ক'রে? আর, এদের দেহ কফিনে—কাঁচের কফিনে রাখা হয়েছে কেন? যদি ধ'রে নেওয়া যায়, নতুন কোন জায়গায় ডাকাতি করতে গিয়ে বা হঠাৎ কোন অসুখে এরা মারা পড়েছে এবং ঐ হাবসীটা হয়তো মুসলমান বা ক্রীশ্চান ব'লেই তার দেহ কফিনে পোরা হয়েছে, কিন্তু বলরাম চৌধুরী? সে তো হিন্দু! তার দেহও কফিনে কেন? আবার যে-সে কফিন নয়, কাঁচের কফিন। কাঁচের কফিনের কথা কেউ কি কখনো শুনেছে?

নিজেদের মারাত্মক বিপদের কথা ভুলে এই অদ্ভুত রহস্যের কথা ভাবতে ভাবতে মানিকের মাথাটা যেন গুলিয়ে গেল! মৃতের মৃত্যু! চিরযুবক মানুষ! কাঁচের কফিন! এর পরেও পৃথিবীর কোন মাথা না গুলিয়ে থাকতে পারে?

একটা শব্দে চমকে ফিরে মানিক সবিস্ময়ে দেখলে, বন্ধন-রজ্জুজালের ভিতর থেকে জয়ন্ত ইতিমধ্যেই তার ডান-হাতখানা বার ক'রে নিয়ে নিজের মুখের বাঁধনও খুলে ফেলেছে!

সে হতভম্বের মতো তাকিয়ে আছে দেখে, দড়ির ভিতর থেকে বাঁ-হাতখানা বার করতে করতে জয়ন্ত সহাস্যে বললে, "মানিক, আমার এ-বিদ্যার কথা জানো না ব'লে তুমি বোধ হয় অবাক হয়ে যাচ্ছ? কিন্তু এর মধ্যে অবাক হবার কিছু নেই। যারা 'মাস্‌ল-কন্ট্রোল' করতে পারে, তাদের কাছে এটা ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওরা যখন আমাকে দড়ি দিয়ে বাঁধে, তখন আমি দেহের সমস্ত মাংসপেশী দ্বিগুণ ফুলিয়ে রেখেছিলুম। দেহ এখন আবার আলগা ক'রে দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাঁধনও শিথিল হয়ে পড়েছে।......ব্যস, আমি এখন স্বাধীন! এস, তোমার বাঁধনও খুলে দি।"

জয়ন্ত মানিকের হাত-পা মুখ আবার খুলে দিলে এবং তারপর তাড়াতাড়ি উঠে কফিনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মানিক বললে, "জয়, এ-সব কি ভুতুড়ে ব্যাপার?"

জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কফিনদুটো পরীক্ষা করতে করতে বললে, "চুপ, এখন বাজে কথা বলো না! আমাকে একটু ভাল ক'রে দেখতে আর ভাবতে দাও! আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।"

মিনিট-পাঁচেক দেহদুটোর দিকে তাকিয়ে থেকে জয়ন্ত যেন নিজের মনেই অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল, "হুঁ", তুমি হ'চ্ছ সেই হাবসী বন্ধু, আর তুমি হ'চ্ছ আঙুল-কাটা বলরাম চৌধুরী! তোমরা সেকেলে লোক, কিন্তু এখনো বুড়ো হও নি—যৌবন তোমাদের হাতে-ধরা, তাই না? কিন্তু তোমরা আজ কুপোকাৎ কেন? তোমাদের দেহে কোন অসুখ-বিসুখের

চিহ্ন নেই, কোন আঘাতেরও দাগ নেই, তবে তোমরা মরলে কেমন ক'রে? কিন্তু তোমাদের দেহ দেখলে তো মনে হয় না যে, তোমরা পটল তুলেছ? মড়ার দেহ তো রক্তহীন হলদে হয়ে যায়, তোমাদের দেহ তো হয় নি? অথচ তোমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ। আর এই কাঁচের কফিনেই বা শুয়ে আছ কেন? ...হুঁ, জানি তোমরা কোন জবাব দেবে না। তা জবাব যদি না দাও তো কী আর করা যাবে। হে বন্ধু, ভেবো না, তোমরা জবাব না দিলে আমি কিছুই বুঝতে পারব না! তোমাদের প্রভু ভবতোষ খুব বুদ্ধিমান, ভীষণ ধড়িবাজ আর অসাধারণ মানুষই বটে, —সৎপথে থাকলে সে আজ অমর হতে পারত! কিন্তু ভবতোষের সব রহস্য আমি বুঝে নিয়েছি—বুঝেছ হাবসী-বন্ধু? বুঝেছ বলরাম চৌধুরী? আর কেউ আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। ওঃ, মানিক,—কি সুক্ষণেই আমরা আজ এই ঘরে বন্দী হয়েছিলুম। আনন্দে আমার অট্টহাস্য করতে সাধ হচ্ছে!"

মানিক ব্যস্ত হয়ে বললে, "না, না, তুমি অট্টহাস্য কোরো না জয়! এখনো আমরা বন্দী।...কিন্তু হঠাৎ তুমি আবার কি রহস্য আবিষ্কার করলে?"

জয়ন্ত বললে, "রহস্য ব'লে রহস্য? এমন রহস্যের কথা পৃথিবীর কেউ কখনো শোনে নি। এ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক রহস্য। বিজ্ঞান যে স্বপ্ন দেখেছে, ভবতোষ তাকে সত্যে পরিণত করেছে! কিন্তু সে কথা এখানে গুছিয়ে বলবার সময় হবে না—ঐ শোনো, গঙ্গার বুকে দূরে একখানা মোটর-বোটের গর্জন শোনা যাচ্ছে!"

মানিক কান পেতে শুনে বললে, "হ্যাঁ। আমরা বন্দী হয়েছি খবর পেয়ে মোটরবোটে চ'ড়ে ভবতোষ বোধ হয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছে।"

জয়ন্ত চারিদিকে তাকাতে তাকাতে তাড়াতাড়ি বললে, "দেখা করতে নয় মানিক, আমাদের জবাই করতে! যে রহস্য আমরা জানতে পেরেছি, ভবতোষ এর পরে আর এক মুহূর্তও আমাদেব বাঁচতে দেবে না। আর

এখন আমাদের মরাও অসম্ভব। ভবতোষ হচ্ছে শয়তান—মানুষ-দেহে শয়তান। আমাদের জীবনের উপরে এখন বাংলাদেশের মঙ্গল নির্ভর করছে—মানিক, তুমি জানো না, আমি কি সাংঘাতিক গুপ্তকথা জানতে পেরেছি।"

মোটরবোটের শব্দ আরো কাছে এগিয়ে এল।

বজরার বন্ধ-দরজার বাইরে ব্যস্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল।

কে একজন বললে, "ওরে রামচরণ, শীগগির নেমে আয়! বড়বাবুর বোট আসছে!"

জয়ন্ত বললে, "হয়েছে! মানিক, ঐদিকের জানলাটা খুলে ফেলো! তারপর এস, আমরা গঙ্গায় ঝাঁপ দি! এছাড়া আর উপায় নেই। কেউ বাধা দিলেই গুলি ছুঁড়বে! তারপর ডুবসাঁতার! কিন্তু ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, বোধ হয় আমাদের পালানো দেখতে পাবে না!"

জানালা খুলে আগে মানিক ও পরে জয়ন্ত প্রায়-নিঃশব্দে গঙ্গার জলে গিয়ে ডুব দিলে। বজরার সবাই বড়বাবুর মোটরবোটেরই অপেক্ষা করছে—বন্দীদের বন্ধন-মুক্তি তারা কল্পনাও করতে পারে নি!

বড়বাবু যখন বজরায় এসে উঠলেন, জয়ন্ত ও মানিক তখন অনেক-দূরে।

ক্যারেল-সাহেব বাজে লোক নন *

ঘরের ভিতরে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব হতেই জয়ন্ত ব'লে উঠল "এই যে, আসতে আজ্ঞা হোক, এতক্ষণ আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম!...ওরে, সুন্দরবাবুর জন্যে চা আর 'এগ্-পোচ' নিয়ে আয়!"

* পাঠকরা যেন শুষ্ক ও নীরস ব'লে জয়ন্তের বক্তৃতার অংশ বাদ দিয়ে না যান। এই অংশে যা আছে, তা প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য, ওর প্রত্যেক লাইনটি মন দিয়ে না পড়লে এই উপন্যাসের কোন সার্থকতাই থাকবে না। ইতি—লেখক।

সুন্দরবাবু দুই হাঁটু ফাঁক ক'রে ভুঁড়ির জন্যে স্থান সংকুলান ক'রে ব'সে পড়লেন। তারপর বললেন, "হুম! আজ আমি চা আর 'এগ্-পোচ খেতে এখানে আসি নি। তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ, সেই খুনী ডাকাতদের সন্ধান দেবে ব'লে। আগে আমি তাদের চাই।"

জয়ন্ত বললে, "আজ্ঞে, তারা আমার বাড়িতে এখনো ভ্রমণ করতে আসে নি। তাদের নিমন্ত্রণ করবার জন্যে আমাদেরই যেতে হবে। কিন্তু তার আগে আপাততঃ আমি একটি বক্তৃতা দেব।"

সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "বক্তৃতা? আমি ফাঁকা কথা চাই না, কাজ চাই। আমি কাজের মানুষ। হুম!"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বক্তৃতায় স্বদেশোদ্ধারের কথা থাকবে না, কাজের কথাই থাকবে। আমার বক্তৃতা না শুনলে আপনি আসামী ধরতে পারবেন না।"

সুন্দরবাবু নাচারভাবে বললেন, "তবে দাও তোমার বক্তৃতা!"

চা ও 'এগ্-পোচ' এল। জয়ন্ত তার বক্তৃতা শুরু করলে :—

"আপনারা কেউ জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন কিনা জানি না। করলে দেখতে পেতেন, মৃত্যু নিশ্চিত বটে, কিন্তু জীবনকে সুদীর্ঘস্থায়ী করা চলে।

মানুষের দেহ হচ্ছে মেসিনের মতো। মেসিনে কল-কব্জা বেশি-দিনের ব্যবহারে খারাপ হয়ে যায়। তখন সেগুলোকে মেরামত ক'রে নিলে মেসিন আবার সচল হয়।

মানুষের দেহে কল-কব্জা বিকল হয়ে গেলেও কি মেরামত করা চলে না? চিকিৎসা-শাস্ত্রের সৃষ্টি দেহের কল-কব্জা মেরামত করবার জন্যেই। কিন্তু সাধারণ চিকিৎসকরা মেরামতী-কাজ এখনো ভাল ক'রে শিখতে পারেন নি।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মতে, সমস্ত জীবন্ত পদার্থই ধরতে গেলে এক-রকম অমরই বটে। তরুণ জীবের দেহ থেকে 'টিসিউ' বা 'বিধানতন্তু' নিয়ে তুলে রেখে দিয়ে দেখা গেছে, তার ভিতরকার cell বা অণুকোষ-

গুলি মরে না বরং দিনে দিনে বাড়তেই থাকে। অসম্পূর্ণ দেহের ত্রুটির জন্যেই মৃত্যু হয় এবং সেই জন্যেই tissue বা বিধানতন্তুও মারা পড়ে; নইলে তাদের প্রায়-অমর বলা চলে।

মানুষ বুড়ো হয় কেন? তার দেহের ভিতরকার secretion বা সার বা রস শুকিয়ে যায় ব'লে। বৈজ্ঞানিক Steinach সাহেব অস্ত্র-চিকিৎসার দ্বারা রসগ্রন্থি বা gland-এর বিধানতন্তুগুলি আবার কার্যক্ষম করার চেষ্টা করেছেন। Voronoff সাহেব বানরের বিধানতন্তু নিয়ে বুড়ো মানুষের দেহে ঢুকিয়ে তাকে আবার সরস ও তরুণ ক'রে তুলতে চেয়েছেন এবং যথেষ্ট সুফলও পেয়েছেন। এই উপায়েই একেবারে শক্তি-হীন, নুয়েপড়া বুড়ো ষাঁড়কে আবার তেজীয়ান যুবক ক'রে তুলতে পারা গিয়েছে।

এইসব দৃষ্টান্ত দেখে বেশ বোঝা যায়, পৃথিবী থেকে মৃত্যুকে তাড়াতে না পারলেও, এবং একেবারে অমর হ'তে না পারলেও, যৌবন বজায় রেখে মানুষের পক্ষে কয়েক শত বৎসর বেঁচে থাকা হয়তো অসম্ভব নয়!"

সুন্দরবাবু হাই তুলে বললেন, "ওরে বাবা, আমরা কি মেডিকেল কলেজের মাস্টার-মশায়ের লেকচার শুনছি? জয়ন্ত কত ঢঙই জানে!"

তাঁর কথায় কর্ণপাত না ক'রেই জয়ন্ত বলতে লাগল—"সুন্দরবাবু, আপনি রজনীগন্ধা গাছ দেখেছেন? জানেন তো তার মূলগুলো তুলে নিয়ে রোদে শুকিয়ে রাখলে তারা মরে না? একরকম লিলিজাতের মূলও এইভাবে গুদামজাত করা চলে। পরের বৎসরে যথাসময়ে সেই মূলগুলো আবার মাটিতে পুঁতলে নতুন গাছে নতুন ফল দেখা যায়। এই জাতের আরো অনেকরকম গাছ আছে। তাদের জীবনী-শক্তি অমর।

কিছুদিন আগে বিলাতের 'টাইমস্' পত্রে এই খবরটি বেরিয়েছে:

রুশিয়ায় লেনা নদীর মুখে লিরাখোবস্ক্ দ্বীপ। কেপ্টারেফ সাহেব সেখানে বরফের তলায় আদিম যুগের এমন একটি অরণ্য আবিষ্কার করেছেন, যা শিলীকৃত (fossilized) হয় নি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, fossil বা শিলক বলতে বোঝায়, যা প্রায় পাথরে পরিণত হয়েছে।

তার মধ্যে আর কোন প্রাণশক্তি থাকে না। কিন্তু ঐ অরণ্যের গাছপালা হাজার হাজার বছর পরেও তেমন জড়পদার্থ হয়ে পড়ে নি। এইটুকুই লক্ষ্য করবার বিষয়।

গত ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কেপ্‌টারেফ সাহেব রুশিয়ার আর-এক জায়গায় আর-একটি নতুন আবিষ্কার করেছেন। কয়েকজন লোক সোনার খনি বার করবার জন্যে এক স্থানে ষোল ফুট গভীর ক'রে বরফ কেটেছিল। সেখানেও হাজার হাজার বৎসর আগেকার যে-সব গাছ-পালা ও ঘাস পাওয়া গিয়েছে, তা শিলীকৃত হয় নি। ঘাসগুলো টাটকা ঘাসের মতোই নোয়াতে পারা গিয়েছে।

রুশিয়ার স্কোভোরোডিনো নামক স্থানে কেপ্‌টারেফ সাহেব তৃতীয় যে আবিষ্কার করেছেন, তা আরো আশ্চর্য! বারো ফুট গভীর তুষার-স্তূপের তলায় পাওয়া গিয়েছে ঘাসের মতন একরকম উদ্ভিদ। নিশ্চয় সেখানে অনেক আগে বোদমাটির জলাভূমি ছিল, উদ্ভিদ হচ্ছে তারই অংশবিশেষ,—কিন্তু শিলীকৃত হয় নি। পনেরো দিন পরে ঐ কালো উদ্ভিদে ক্রমে সবুজ রঙ ধরতে লাগল। মাসকয়েক পরে তা শৈবালের আকার ধারণ করলে—সামুদ্রিক শৈবাল! বরফের তলায় সুরক্ষিত ছিল ব'লে হাজার হাজার বৎসর পরেও উদ্ভিদের জীবনী-শক্তি নষ্ট হয়ে যায় নি।"

সুন্দরবাবু প্রায় আর্তনাদ ক'রে ব'লে উঠলেন, "হুম! থামো জয়ন্ত, থামো! আর আমার সহ্য হচ্ছে না! তুমি কি আমাকেও তোমাদের মতন পাগলা ব'লে ধরে নিয়েছ? হাজার হাজার বৎসর আগেকার শৈবালের গল্প আমি আর শুনতে চাই না। আসামীর কথা কিছু জানো তো বল, নইলে আমি থানায় চললুম।"

জয়ন্ত বললে, "আমার বক্তৃতার আর অল্পই বাকি আছে, আপনি আর একটু ধৈর্য ধ'রে শুনুন!

এতক্ষণ আমি এই কথাই বোঝাতে চাইছি যে, ঠিক ভাবে রাখতে পারলে কোন সজীব পদার্থই মরে না—অন্ততঃ প্রায়-অমর হ'তে পারে।

দেহের ভিতরে নতুন ও সতেজ রস সঞ্চার ক'রে বৈজ্ঞানিকরা মানুষকে সহজে বুড়ো হ'তে দেন না। যতদিন না মানুষ বুড়ো হয় তত-দিন মৃত্যু তার কাছে আসে না।

উদ্ভিদ নিম্নশ্রেণীর সজীব পদার্থ। হাজার হাজার বৎসর পরেও সে যদি আবার ঘুমন্ত থেকে পূর্ণজীবনের লক্ষণ নিয়ে বেঁচে উঠতে পারে, তবে তার চেয়ে উচ্চশ্রেণীর জীব মানুষেরও পক্ষে তা সম্ভবপর হবে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পাই আমেরিকার রক্‌ফেলার ইনস্টিটিউটের ডাঃ আলেক্সিস ক্যারেলের কাছ থেকে। সুন্দরবাবু, আপনি ক্যারেল সাহেবের নাম শুনেছেন?"

সুন্দরবাবু প্রচণ্ড মাথা নাড়া দিয়ে ব'লে উঠলেন, "ও-সব বাজে লোকের নাম আমি শুনতে চাই না। তোমাদের মতো আমারও মাথা খারাপ নয়!"

জয়ন্ত হেসে বললে, "সুন্দরবাবু, ক্যারেল সাহেব বাজে লোক নন, তাঁর নাম আজ পৃথিবী-জোড়া। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছেন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন! তাহলে ক্যারেল সাহেব বাজে লোক নন!"

জয়ন্ত বললে, "আপনার সার্টিফিকেট পেয়ে ক্যারেল সাহেব ধন্য হলেন। এই ক্যারেল সাহেব কি বলেন জানেন? তাঁর মতে, মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করা অসম্ভব নয়। মানুষের দেহকে মাঝে মাঝে ঘুম পাড়িয়ে যদি দীর্ঘকালের জন্যে গুদামজাত ক'রে রাখা হয় এবং মাঝে মাঝে তাকে যদি গুদাম থেকে বার ক'রে আবার লীলাখেলা করতে দেওয়া হয়, মানুষও তাহলে শত শত বৎসর বাঁচতে পারে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! হ'তে পারে তোমাদের ক্যারেল সাহেব 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছেন, হ'তে পারে তিনি বাজে লোক নন, কিন্তু ও-কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

জয়ন্ত বললে, "কেন বিশ্বাস করেন না? প্রাণের লক্ষণ না থাকলেও

মানুষের দেহ যে নষ্ট হয় না, এর তো প্রমাণ আছে। আপনি সমাধির কথা শুনেছেন তো? কোন কোন যোগীর সমাধিস্থ দেহ এই আধুনিক কালেও মাটির তলায় কবর দেওয়া হয়েছে। প্রায় চল্লিশ দিন পরে মাটি খুঁড়ে সেই মৃতবৎ দেহ উপরে তোলা হয়েছে, তখন তার মধ্যে আবার পূর্ণজীবন ফিরে এসেছে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এ কথা আমি শুনেছি বটে!"

জয়ন্ত বললে, "তবে গুদামজাত করলে মানুষের দেহ নষ্ট হবে কেন? অবশ্য, দেহকে এখানে যোগবলে ঘুম পাড়ানো হবে না—বৈজ্ঞানিকরা রসায়ন-বিদ্যা বা অন্য-কিছুর সাহায্য নেবেন। ক্যারেল সাহেব বলেন, মানুষের দেহে ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেলেই তাকে যদি ঘুম পাড়িয়ে গুদামে তুলে ফেলা হয়, তাহ'লে অনেককাল পরেও তাকে জাগালে সে আবার তাজা আর সবলরূপেই জেগে উঠবে—যেমন নতুন জীবন পায় রজনীগন্ধা,—যেমন নতুন জীবন পেয়েছে কেপ্‌টারেফ সাহেবের দ্বারা আবিষ্কৃত হাজার হাজার বৎসর আগেকার উদ্ভিদ!"

মানিক এতক্ষণ নীরবে একাগ্রভাবে জয়ন্তের কথা শুনছিল, এইবারে সে মৌনব্রত ভঙ্গ ক'রে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, "জয়, জয়! এতক্ষণ পরে আমি তোমার বক্তৃতার অর্থ বুঝেছি! তুমি তো এই কথাই বলতে চাও যে, ভবতোষও কোনরকম রাসায়নিক ঔষধের গুণে মানুষের দেহকে ঘুম পাড়িয়ে গুদামজাত ক'রে ফেলতে শিখেছে?"

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, "হ্যাঁ!"

সুন্দরবাবু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, "হুম! জয়ন্ত, তুমি বরং বাঁশি বাজিও, আমি সহ্য করব। তোমার আজকের পাগলামি সহ্য করা অসম্ভব। হচ্ছিল ক্যারেল সাহেবের কথা, কিন্তু তার মধ্যেও ভবতোষ? 'ভবতোষ ভবতোষ' ক'রেই তুমি ক্ষেপে গেলে দেখছি!"

জয়ন্ত বললে, "আপনার সঙ্গে আপাততঃ আমি আর বকতে পারব না, আগে এক পেয়ালা চা খেয়ে গলা ভিজিয়ে আসি। মানিক, আজকে বজরায় গিয়ে আমরা যে দৃশ্য দেখেছি, ততক্ষণ তুমি সুন্দরবাবুর কাছে

তা বর্ণনা কর।"—এই ব'লে সে বেরিয়ে গেল।

ঘরের ভিতরে পুনঃপ্রবেশ ক'রে জয়ন্ত দেখলে, ভয়ঙ্কর বিস্ময়ে প্রকাণ্ড হাঁ ক'রে সুন্দরবাবু স্তম্ভিতের মতন ব'সে আছেন। জয়ন্তকে দেখে মুখ বুজেই আবার খুলে ফেলে তিনি ব'লে উঠলেন, "এতক্ষণে তোমার লেকচারের মানে বুঝলুম। কিন্তু, এও কি সম্ভব? আর ভবতোষের এমন অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করবার কারণই বা কি?"

জয়ন্ত বললে, "কারণ কি, বুঝছেন না? যে-সব আসামী প্রাণদণ্ড বা গুরুতর শাস্তি পেয়েছে, ভবতোষের আশ্রয়ে তারা পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে নিরাপদে ঘুমিয়ে কিছুকাল কাটিয়ে দেয়। তারা আপত্তি করে না, কেননা মৃত্যুভয়ও নেই, পুলিসের ভয়ও নেই! বরং লাভ আছে, কেন না বুড়ো হবার ভয় নেই! এতে ভবতোষেরও দু-রকম সুবিধা। প্রথমত, পাপ-কাজ হাসিল করবার জন্যে চুরি-জুয়াচুরি-জালিয়াতি-খুন-ডাকাতিতে একেবারে শিক্ষিত পাকা লোকের সাহায্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, পুলিস যখন বেশি প্রমাণ পেয়ে বেশি গোলমাল করবে, তখন আসামীদের সরিয়ে ফেলে কফিনে পুরে গুদামজাত করলেই হবে। আসল আসামীদের না পেয়ে পুলিস ভবতোষের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বলরাম আর সেই হাবসীটা যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেটা আন্দাজ করতে পেরেই ভবতোষ নিজের আবিষ্কৃত অদ্ভুত উপায়ে কৃত্রিম মৃত্যুঘুমের সাহায্যে তাদের আবার সরিয়ে ফেলতে চায়। কোন গুদামে কাঁচের কফিনে ক'রে তাদের মৃতবৎ দেহ আপাততঃ সরিয়ে ফেলা হবে। পাঁচ-দশ-বারো বৎসর পরে আমরা যখন তাদের কথা ভুলে যাব, তখন আবার হয়তো তাদের সজীব হবার পালা আসবে! দৈবক্রমে গুদামজাত করবার আগেই আমি সেই হাবসীটার আর বলরামের সমাধিস্থ দেহ দেখে ফেলেছি তাই রক্ষা, নইলে এ বিষয়ে আমার পড়াশোনা থাকলেও কোনকালেই আসল ব্যাপারটা হয়তো সন্দেহ করতে পারতুম না। এ যে অস্বাভাবিক কাণ্ড! বৈজ্ঞানিকরা চিরস্থায়ী মানব-দেহের স্বপ্ন দেখেছেন

বটে, কিন্তু কোন অজানা মানুষ নিজের পাপ-ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে সেই স্বপ্নকে গোপনে এমনভাবে সত্য ক'রে তুলেছে, আমিও এটা কল্পনা করতে পারতুম না। জানি না ভবতোষের গুদামে এমন আরো কত পাপী ফাঁসিকাঠকে ফাঁকি দিয়ে আবার জাগবে ব'লে ঘুমিয়ে আছে। পুলিস তাদের দেখলেও মড়া ছাড়া আর কিছু ভাববে না, ডাক্তারী পরীক্ষাও তাদের মড়া ব'লেই স্থির করবে, তাদের গুপ্তকথা জানে কেবল ভবতোষই, তাদের জাগাবার ঔষধও আছে কেবল তার হাতেই।"

সুন্দরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আর আমাদের হাত গুটিয়ে ব'সে থাকা উচিত নয়। এখনি পোর্ট-পুলিসের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে ফেলব—তাদের 'লঞ্চে' উঠে সদলবলে সেই বজরা আর ভবতোষকে গ্রেপ্তার করব।"

মানিক বললে, "তাদের বজরা কি আর সেখানে আছে?"

জয়ন্ত বললে, "বজরাখানা তারা যদি ডুবিয়ে দিয়ে না থাকে, তাহলে গঙ্গার যেখানেই হোক, তাকে আবার পাওয়া যাবে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "চল চল, আর দেরি নয়। এমন আশ্চর্য আসামী-কে গ্রেপ্তার করতে পারলে আমার সুনাম আর উন্নতির সীমা থাকবে না।"

সুন্দরবাবুর বীরত্ব

একখানা লঞ্চ' ও একখানা 'মোটরবোট' সশব্দে গঙ্গার জল কেটে হু-হু ক'রে ছুটে চলেছে। বোটে আছে জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবু প্রভৃতি এবং 'লঞ্চে' আছে একদল পুলিসের লোক।

গঙ্গার আর্তনাদে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে দু-ধারে ফেনার মালা দোলাতে দোলাতে 'লঞ্চ' ও 'বোট' যখন সাগ্রহে ঘুষুড়ীর কাছে গিয়ে হাজির হ'ল তখন ভবতোষের বজরার চিহ্নটুকু পর্যন্ত দেখা গেল না!

এটা সকলেই আশা করেছিল। যে-ভবতোষ ধারণাতীত শয়তানী

চক্রান্তে অদ্বিতীয়, সে যে বোকার মতন এত সহজে ধরা দেবে, এটা কেহই মনে করে নি।

সুন্দরবাবু বললেন, "বজরা আর 'মোটর-বোট' তো ডাঙা দিয়ে হাঁটে না, তাদের জলের ওপরে কোথাও-না-কোথাও থাকতেই হবে।"

জয়ন্ত বললে, "জলের ওপরে না থেকে তারা যদি জলের ভেতরে থাকে ; কে বলতে পারে, তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হয় নি ?.........আচ্ছা, খোঁজ নিয়ে দেখা যাক।"

খোঁজ পেতে বেশি দেরি হ'ল না। উত্তরদিক থেকে যে-সব নৌকা আসছিল, তাদের একখানার ভিতর থেকে খবর পাওয়া গেল, ত্রিবেণীর খানিক আগে তারা মোটরবোটের পিছনে একখানা বজরাকে যেতে দেখেছে।

জয়ন্ত বললে, "মানিক, তুমি বোধহয় ভোলো নি যে, ত্রিবেণীতে ভবতোষের একখানা বাগানবাড়ি আছে ?"

সুন্দরবাবু প্রচণ্ড রোখে ব'লে উঠলেন, "ত্রিবেণী, ত্রিবেণী। চল সবাই ত্রিবেণীর দিকে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। হুম!"

'লঞ্চে'র ও 'বোটে'র গতি দ্বিগুণ বাড়ল, তবু সুন্দরবাবু তুষ্ট নন। মহা-বিরক্ত স্বরে বার বার তিনি বলতে লাগলেন, "তোমাদের মড়াখেকো 'লঞ্চ' দৌড়ে কচ্ছপকেও হারাতে পারবে না। আরো জোরে—আরো জোরে! হুম, আমরা হাওয়া খেতে যাচ্ছি, না, লড়াই করতে যাচ্ছি ?"

মানিক চোখে দূরবীন লাগিয়ে বসেছিল। সে হঠাৎ ব'লে উঠল, "এক-খানা মোটরবোট এদিকে আসছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সেখানা আবার তীরের মতো উত্তরদিকে চলে গেল!

জয়ন্ত বললে, "ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। বলরাম আর হাবসী-টার দেহ লুকিয়ে ফেলে ভবতোষ নিশ্চয়ই পালাবার ফিকিরে ছিল। আমাদের দেখে আবার ফিরে গেল।"

সুন্দরবাবু আরো উত্তেজিত হয়ে দু'হাতে মাথার চুল টানতে টানতে বললেন, "আমরা মোটরবোটে যাচ্ছি, না গাধা-বোটে যাচ্ছি ? আমরা

লণ্ডনে যাচ্ছি, না, ত্রিবেণীতে যাচ্ছি? এ-জীবনে কি সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারব?"

'লঞ্চ' ও 'বোট' উধ্বর্শ্বাসে ছুটছে—এত জোরে তারা বোধহয় আর কোনদিন ছোটে নি! বালি-ব্রীজ, ডাইনে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি, বাঁয়ে বেলুড় ও উত্তরপাড়া পিছনে প'ড়ে আছে, ছ'ধারে আকাশের ভাঙা থামের মতো কলের চিমনিগুলোও তাড়াতাড়ি পিছনে চলে যাচ্ছে এবং গঙ্গার পানসি ও অন্যান্য নৌকোগুলো তাদের উন্মত্ত গতি দেখে ত্রস্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

সুন্দরবাবু বললেন, "ওরে, কেউ আমাকে হুখানা ডানা দে না রে! তাহলে আমি এখনি বাজপাখির মতো ভবতোষের ঘাড়ে গিয়ে ছোঁ মারি!"

মানিক চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে বললে, "ত্রিবেণীর কাছেই আমরা এসে পড়েছি। কিন্তু আকাশের গায়ে ও-আগুনের শিখা কিসের?"

জয়ন্ত দূরবীনটা মানিকের হাত থেকে নিয়ে নিজের চোখে লাগিয়ে বললে, "হুঁ। ওখানে কোথাও আগুন লেগেছে। ত্রিবেণীও তো ঐখানেই!"

অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, গঙ্গার ঠিক ধারেই একখানা বাড়ি অগ্নির কবলে প'ড়ে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে! টকটকে-লাল শত শত সাপের মতো আঁকাবাঁকা ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে অগ্নিশিখারা ক্রমাগত আকাশকে ছোবল মারবার জন্যে নিষ্ফল চেষ্টা করছে, গঙ্গার তীরে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আছে, অনেকে ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করছে, তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের হৈ-হৈ রবে, ভীত পশুপক্ষীদের আর্তনাদে ও অগ্নির প্রচণ্ড গর্জনে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে!

জয়ন্ত হঠাৎ চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, "ভাই সব! যেখানে আগুন লেগেছে ঐখানে চল!"

সুন্দরবাবু তার চেয়েও জোরে চেঁচিয়ে বললেন, "খবর্দার, সিধে চল। আমার মাথার ভেতরে এখন আগুন জ্বলছে, ও-বাজে আগুন দেখবার শখে আর কাজ নেই!"

জয়ন্ত বললে, "কি মুশকিল! দেখছেন না, যে-বাড়িতে আগুন লেগেছে তার সামনের ঘাটেই একখানা বজরা আর মোটরবোট বাঁধা রয়েছে? এই তো ত্রিবেণী। আর আগুন লেগেছে নিশ্চয়ই ভবতোষের বাগান-বাড়িতেই।"

সুন্দরবাবু পরম বিস্ময়ে মুখব্যাদান ক'রে বললেন, "অ্যাঁ!"

জয়ন্ত বললে, "খুব সম্ভব, আমরা আসছি দেখে ভবতোষ বুঝে নিয়েছে, তার লীলাখেলার দিন ফুরিয়েছে। সে পালাবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু পথ বন্ধ দেখে আবার এখানে ফিরে এসে নিজের বাড়িতেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম। কেন?"

জয়ন্ত বললে, "তার বিরুদ্ধে যে-সব প্রমাণ আছে সেগুলো নষ্ট ক'রে ফেলবে ব'লে। এই বাগানবাড়িতেই বোধ হয় তার প্রধান আড্ডা।"

মানিক বললে, "তুমি কি বলতে চাও যে, এই বাড়িতেই ভবতোষের পাপসঙ্গীদের অচেতন দেহগুলো গুদামজাত করা আছে?"

—"আমার তো বিশ্বাস, তাই।"

মানিক শিউরে উঠে বললে, "কী ভয়ানক! ভবতোষ কি তার বন্ধু-দের ঘুমন্ত দেহ আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে চায়?"

জয়ন্ত বললে, "তাছাড়া তার পক্ষে উপায় কি? ঐ দেহগুলোই যে এখন তার বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী!"

কথা কইতে কইতে জয়ন্ত বরাবরই অগ্নিময় বাড়িখানার দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল। হঠাৎ সে ব্যস্ত স্বরে বললে, "মানিক, দূরবীন দিয়ে দেখ তো, কে একটা লোক মোটরবোটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আবার ঐ বাগানবাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে?"

মানিক দেখেই উত্তেজিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "ঐ তো ভবতোষ!"

জয়ন্ত বললে, "শীগগির ঐখানে চল! ভবতোষ বাড়িতে আগুন লাগিয়ে আবার চম্পট দিচ্ছিল। কিন্তু এবারেও পালাতে পারলে না,—চল, চল!"

পুলিসের 'লঞ্চ' ও 'মোটরবোট' তীরবেগে তীরের দিকে চলল।

মানিক বললে, "বাতাসে কী পেট্রলের গন্ধ!"

জয়ন্ত বললে, "পেট্রল ঢেলেই ঐ আগুন সৃষ্টি করা হয়েছে।"

সুন্দরবাবু ভয়ঙ্কর চিৎকার ক'রে বললেন, "সেপাইরা, শোনো! বন্দুকে গুলি ভ'রে নাও! ঐ বাগানবাড়ির চারিদিক ঘেরাও কর! ওখান থেকে একটা মাছ বেরুলেও গুলি ক'রে মেরে ফেলবে।"

মানিক হেসে বললে, "সুন্দরবাবু, আপনার ভুল হ'ল যে! মাছি মারবার জন্যে তো জন্মায় খালি কেরানীরাই। মাছি মারবার জন্যে বন্দুক তৈরি হয় না!"

সুন্দরবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, "এমন সময়ে ও-রকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না মানিক! হুম, উনি এলেন আবার কথার ছল ধরতে।"

'লঞ্চ' ও 'বোট' তীরে গিয়ে লাগল। বন্দুকধারী পুলিস দেখে তখন সেখানকার জনতা আরো বেড়ে উঠেছে—সকলেরই মুখে নতুন বিস্ময় ও কৌতূহল, অগ্নিকাণ্ডের দিকে তখন আর কারুরই দৃষ্টি নেই!"

সুন্দরবাবু এত চটপট বোট থেকে লাফিয়ে প'ড়ে বাগানবাড়ির দিকে ছুটে গেলেন যে, দেখলে সন্দেহ হয় না, তাঁর দেহের মাঝখানে মস্ত-ভারী একটা দোদুল্যমান ভুঁড়ি ব'লে কোন নিরেট উপসর্গ আছে!

অগ্নিদেবের নৃত্যোৎসব চলেছে তখনো পূর্ণ উদ্যমে। তার চিৎকারও তেমনি নিষ্ঠুর ও প্রচণ্ড! রক্তের আভায় চারিদিক লাল হয়ে উঠেছে, কুণ্ডলী-পাকানো ধূমে নিঃশ্বাস রুদ্ধ ও দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, জ্বালাকর উত্তাপে তার কাছে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব!

কেবল 'পেট্রলে'র নয়, আর-একটা ভয়াবহ দুর্গন্ধে বাতাস যেন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে!

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মানিকের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত অভিভূত স্বরে বলল, "মানিক, শ্মশানের শবদাহের গন্ধ! কতগুলো জীবন্ত দেহ আজ ঐখানে পুড়ে ছাই হচ্ছে, কে তা জানে?"

মানিক কিছু বলতে পারলে না, তার প্রাণ তখন যেন স্তম্ভিত হয়ে

গিয়েছিল! মনে মনে সে ভাবলে, ওরা পাপ করেছিল ব'লেই ওদের এমন শোচনীয় পরিণাম হ'ল—কিন্তু পাপীর হাতেই পাপীর কি ভয়ানক শাস্তি! জীবন্ত পুড়লেও অচেতন ওরা যে সে-যন্ত্রণা ভোগ করছে না, এইটুকুই যা সান্ত্বনার কথা।

আচম্বিতে সেই অগ্নিময় বাড়ির ভিতর থেকে একটা মূর্তি টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এল। তার জামা-কাপড়ে আগুন জ্বলছে!

সে ভবতোষ, আগুন তাকে বাড়ির ভিতর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে!

আগুনের উত্তাপকে গ্রাহ্য না ক'রে সুন্দরবাবু দ্রুতপদে তার দিকে অগ্রসর হলেন।

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তুলে বজ্রকঠিন কণ্ঠে ভবতোষ বললে, "যদি বাঁচতে চাও, আমার পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও!"

সুন্দরবাবু তবু এগুতে লাগলেন।

ভবতোষ গর্জন ক'রে কি-একটা জিনিস ছুঁড়লে!

জিনিসটা সুন্দরবাবুর কাছ থেকে খানিক তফাতে এসে মাটির উপরে প'ড়ে বিষম শব্দে ফেটে গেল এবং পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সুন্দরবাবুর দেহ!

জয়ন্ত উদ্বিগ্ন স্বরে ব'লে উঠল, "বোমা, বোমা! ভবতোষ বোমা ছুঁড়েছে!"

সকলে ছুটে গিয়ে দেখলে, রক্তাক্ত দেহে সুন্দরবাবু মাটির উপরে বসে আছেন!

কর্কশ কণ্ঠে ভবতোষ বললে, "এখনো সরে যাও, নইলে আবার আমি বোমা ছুঁড়ব!"

আহত সুন্দরবাবু হঠাৎ পাশের সেপাইয়ের হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে বললেন, "প্রাণ থাকতে আমি এখান থেকে নড়ব না!"

ভবতোষ শুষ্ক, নিষ্ঠুর অট্টহাস্য ক'রে বললে, "আমি তো মরবই, তবে তোরা বেঁচে থাকতে নয়!"—ব'লেই সে আবার বোমাসুদ্ধ হাত তুললে।

কিন্তু চোখের পলক পড়বার আগেই সুন্দরবাবুর বন্দুক গর্জন ক'রে উঠল।

শূন্যে দুই বাহু ছড়িয়ে ভবতোষ ঘুরে মাটির উপর প'ড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের বোমাটা ফেটে গিয়ে রাশীকৃত ধোঁয়ার আড়ালে তাকে একেবারে ঢেকে দিলে।

সেপাইরা যখন ছুটে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল তখন দেখলে, নিজেরই বোমার আঘাতে ভবতোষের কলঙ্কিত দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

জয়ন্ত চমৎকৃত গাঢ় স্বরে বললে, "সুন্দরবাবু, এতদিনেও আমি আপনাকে চিনতে পারি নি। আপনার বীরত্ব আমার মাথা আজ শ্রদ্ধায় নত ক'রে দিয়েছে!"

দেহের রক্ত মুছতে মুছতে সুন্দরবাবু হাসিমুখে বললেন, "হুম!"

পরিশিষ্ট

যাঁরা "জয়ন্তের কীর্তি" শেষ পর্যন্ত পড়বেন, তাঁরা যে খালি গল্পের জন্যই পড়বেন, এ কথা জানি। কিন্তু "জয়ন্তের কীর্তি"র মধ্যে গল্প ছাড়াও আর একটি যা লক্ষ্য করবার বিষয় আছে তা হচ্ছে এই: এটি হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অপরাধের কাহিনী এবং বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে নতুন। এর আখ্যানবস্তু কাল্পনিক হ'লেও কতকগুলি সত্য তথ্য ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপর নির্ভর ক'রেই তা কল্পনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে মানুষের দেহকে জিইয়ে রেখে তাকে যে মৃত্যু ও বার্ধক্যের কবল থেকে রক্ষা করা যেতে পারে, প্রথম দৃষ্টিতে এটা ঔপন্যাসিকের অসম্ভব কল্পনা ব'লে মনে হ'তে পারে বটে, কিন্তু আসলে বহু পরীক্ষার পর আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকরা ঐ অভাবনীয় বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন। অবশ্য, কি এদেশে ও কি পাশ্চাত্ত্য দেশে,

ঐ বিচিত্র তথ্য বা আবিষ্কার নিয়ে আজ পর্যন্ত উপন্যাস লেখবার কল্পনা আর কোন লেখক করেছেন ব'লে জানি না।

তারপর, এই উপন্যাসের মধ্যে অপরাধীরা যে-সব নতুন উপায় অবলম্বন করেছে এবং জয়ন্ত যে-সব পদ্ধতিতে সেই-সব অপরাধ আবিষ্কার করেছে, তাও আধুনিক অপরাধ-বিজ্ঞানসম্মত। এদেশে ও-রকম বৈজ্ঞানিক অপরাধী ও বৈজ্ঞানিক ডিটেক্‌টিভ এখনো আত্মপ্রকাশ করেনি বটে, কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকায় তারা যথেষ্ট সুলভ।

বৈজ্ঞানিক চোর, ডাকাত ও খুনেদের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পাশ্চাত্য পুলিসও এখন বিজ্ঞানের সাহায্য না নিয়ে পারে না। কথাসাহিত্যে বিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমস্ অল্পবিস্তর বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য পুলিস তাঁর চেয়েও ঢের-বেশি অগ্রসর হয়ে প্রমাণিত করেছে, বাস্তব জীবনের সত্য উপন্যাসের চেয়েও অধিকতর বিস্ময়কর।

ইউরোপে এখন চারিটি দেশের পুলিস সবচেয়ে বিখ্যাত। ঐ চারিটি দেশ হচ্ছে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড। আজকাল সব দেশেরই পুলিস কমবেশি বিজ্ঞানের সাহায্য নেয় বটে, কিন্তু বিশেষ ক'রে অষ্ট্রিয়ার পুলিসকে বিজ্ঞানের দাস বললেও চলে। অষ্ট্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত অধ্যাপকরা আপন আপন রসায়ন-পরীক্ষাগারে ব'সেই অনেক সময়ে পুলিসকে আশ্চর্যরূপে সাহায্য ক'রে অপরাধী গ্রেপ্তার করবার উপায় বাতলে দেন! একবার পুলিসের সাহায্যকারী এক বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ঘটনাস্থলে হাজির না থেকেও আপন পরীক্ষাগারে ব'সে এমন অভাবিত উপায়ে একটি রহস্যময় আত্মহত্যার কিনারা ক'রে দেন যে, ঔপন্যাসিক কন্যান ডইল সাহেব তাঁর শার্লক হোমসের কীর্তি-কাহিনীর মধ্যে পাত্র-পাত্রীর নাম বদলে সেই ঘটনাটিকে অবিকল বর্ণনা করেছিলেন।

দুজন মানুষের হাতের আঙুলের ছাপ একরকম হয় না—এই মস্ত আবিষ্কার হয় প্রথমে বঙ্গদেশের পুলিস কমিশনার স্যর উইলিয়ম হার্শেলের দ্বারা ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এখানে অপরাধীদের টিপ-সই নেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। (কিন্তু তার আগেও চীনারাও

আঙুলের টিপ-রহস্য জানত, যদিও অপরাধী ধরবার জন্যে তারা কখনো আঙুলের ছাপ ব্যবহার করত না)। এই প্রথা যখন পাশ্চাত্ত্য দেশেও অবলম্বিত হয়, তখন সেখানকার অপরাধীদের মধ্যে দস্তুরমতো বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ ঘটনাস্থলে গিয়ে অপরাধী কোন কাঁচের জিনিসে হাত দিলেই আর রক্ষা নেই। কাঁচের উপরে অতি সহজেই আঙুলের দাগ পড়ে এবং পুলিস অনায়াসেই সেই দাগের ফোটো তুলতে পারে। বিলাতী অপরাধীরা তখন হাতে দস্তানা প'রে চুরি-ডাকাতি খুন করতে লাগল। তাতেও নিস্তার নেই। কারণ, দস্তানা ঘামে ভিজে গেলেই আবার সেই আঙুলের রেখার ছাপ পাওয়া যায়। তখন অপরাধ করবার পর অনেকে শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে আঙুলের রেখা এমন ভাবে তুলে ফেলতে শুরু করল যে, আগেকার আঙুলের ছাপের সঙ্গে এখনকার ছাপ যাতে আর না মিলতে পারে। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হ'ল না। কারণ, ঘষা আঙুলের আগেকার রেখা কিছুদিন পরে অবিকল ফুটে বেরোয়।

এই আঙুলের ছাপ এখন অপরাধী ধরবার একটা প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-বিষয়ে এখনো নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কৃত হচ্ছে। যে-উপায়ে আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করা হয়, তাকে বলে লোকার্ডের পোরোস্কোপিক পদ্ধতি (Locard's poroscopic method)। 'ফোটোমাইক্রোগ্রাফি'র (photomicrography) সাহায্যে ঐ পদ্ধতিটি অধিকতর ফলপ্রদ হয়েছে। ফোটোমাইক্রোগ্রাফির দ্বারা আঙুলের খুব ছোট্ট রেখাগুলোর প্রকাণ্ড ছবি তুলতে পারা যায়। এই আঙুলের ছাপ বিচার করবার জন্যে যে রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়, তা micro-chemical examination নামে বিখ্যাত।

সাহিত্যে খুব প্রাচীন একটি ডিটেক্‌টিভের গল্প পাওয়া যায় বাইবেলে।

বেল ছিলেন বাবিলনের দেবতা। তাঁর পূজার ও সেবার জন্যে রাজা অনেক রকম খাবার সাজিয়ে নৈবেদ্য পাঠাতেন। রাত্রে মন্দিরের দরজা

বাহির থেকে বন্ধ করা হ'ত। কিন্তু সকালে উঠে দেখা যেত—কি আশ্চর্য! পাথরের দেবতা বেল জ্যান্তো হয়ে সব খাবার খেয়ে ফেলেছেন!

দেবতার শক্তি দেখে বেলের মূর্তির প্রতি রাজার ভক্তি-শ্রদ্ধার সীমা নেই! তার ফলে দেব-মন্দিরের পুরোহিত-সম্প্রদায়ের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও লাভের অঙ্ক বেড়ে উঠল রীতিমত।

দানিয়েল ছিলেন চালাক লোক। তিনি জানতেন, পাথুরে দেবতা বেলের পেটের ভিতরটাও নিরেট পাথরে ভর্তি হয়ে আছে, রাশি রাশি মিষ্টান্ন, ফল ও মাংস খাবার লোভে সে পেট কখনো ফাঁপা হ'তে পারে না।

অতএব একদিন তিনি বললেন, "মহারাজ, এ-সব হচ্ছে জোচ্চুরি আর ধাপ্পাবাজি! বেল এ-সব খাবার খান না!"

মহারাজা বললেন, "কী যে বল তার ঠিক নেই! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, রাত্রে মন্দিরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ থাকে। মন্দিরের ভিতরে জনপ্রাণী থাকে না, তবু খাবার কোথায় উড়ে যায়?"

দানিয়েল বললেন, "আচ্ছা মহারাজ, কাল সকালেই আপনাকে দেখাব, বেল খাবার খান না।"

সে রাত্রেও ষোড়শোপচারে বেল-দেবকে ভোগ দেওয়া হ'ল।

তারপর দানিয়েল এসে প্রথমে মন্দিরের মেঝের উপরে সর্বত্র ভাল ক'রে ছাই ছড়িয়ে দিলেন এবং তারপর মন্দিরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ ক'রে চলে গেলেন!

সকালবেলায় মহারাজা মন্দিরে এলেন দানিয়েলকে সঙ্গে ক'রে। দরজা খোলা হ'ল। মন্দিরের ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, সমস্ত নৈবেদ্যের থালা একেবারে খালি!

মহারাজ দেবমূর্তির দিকে তাকিয়ে ভক্তিভরে গদগদ স্বরে বললেন, "হে প্রভু, হে বেল, তোমার অসীম মহিমা! সত্যই তুমি জাগ্রত দেবতা!"

দানিয়েল হেসে বললেন, "মহারাজ, ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখুন।"

মহারাজা ছাই-ছড়ানো মেঝের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বললেন, "একি, এখানে এত পায়ের দাগ এল কেমন ক'রে ? এ যে দেখছি পুরুষের পায়ের দাগ, মেয়ের পায়ের দাগ, শিশুর পায়ের দাগ ! ব্যাপার কি ?"

দানিয়েল বললেন, "ব্যাপার আর কিছুই নয় মহারাজ ! পুরুতরা তাদের বৌ আর ছেলে-মেয়ে নিয়ে পিছনের একটা গুপ্তদ্বার দিয়ে মন্দিরে ঢুকে রোজ রাত্রে দেবতার নৈবেদ্য পেট ভ'রে খেয়ে যায় !"

রাজার চোখ ফুটল ! পুরুতদের প্রাণদণ্ড হ'ল।

পায়ের ছাপ অবলম্বনে বাবিলনের ঐ দানিয়েল মান্ধাতার আমলে গোয়েন্দাগিরি করেছেন। এবং তারপর ঐ পায়ের ছাপ আজ হাজার হাজার বৎসর ধরে হাজার হাজার চোর-ডাকাত-খুনীর ধরা পড়বার প্রধান কারণ হয়ে আছে !

পায়ের ছাপ দেখে অনায়াসেই ব'লে দেওয়া যায়, কোন লোক রোগা না মোটা, বেঁটে না ঢ্যাঙা, সে খোঁড়া কিনা, সে স্ত্রী না পুরুষ, এবং যদি স্ত্রীলোক হয় তবে গর্ভবতী কিনা ! আস্তে আস্তে চললে একরকম পায়ের ছাপ পড়ে এবং দৌড়লে পড়ে আর একরকম। পায়ের ছাপ পরীক্ষা করবার জন্যে এখনকার ইউরোপীয় পুলিস সূক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে।

মাটি থেকে পায়ের ছাপের ছাঁচ তোলবার জন্যে অনেকরকম জিনিসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে—গঁদ, চর্বি, পাউরুটির গুঁড়ো প্রভৃতি। অনেক পরীক্ষার পর দেখা গেছে যে, 'প্লাস্টার অফ প্যারিস'ই হচ্ছে এ-কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। কোথাও পায়ের ছাপ পড়লে আগে নেওয়া হয় তার মাপ ও ফোটোগ্রাফ এবং তারপর প্লাস্টারের ছাঁচ তোলা হয়। বালি, কাদা, ধুলো ও তুষারের উপর থেকে রীতিমত নিখুঁত পদচিহ্নের ছাঁচ তোলা যায়। হালে পরীক্ষা-পদ্ধতি এতটা উন্নত হয়েছে যে, আসবাব-পত্তরে, সামান্য মিহি ধুলোয় বা চকচকে গৃহতলে বা যে-কোন রকম কাগজে অস্পষ্ট পায়ের ছাপ পড়লেও তার ছাঁচ তোলা কঠিন হয় না।

পায়ের ছাপ যে পুলিসের কত কাজে লাগে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের একটি গ্রামে এক খুন হয়। মাঠের মাঝখানে একটি লোকের লাশ পাওয়া যায়—হত্যাকারী তার মাথা গুঁড়ো ক'রে দিয়ে তার জিনিস-পত্তর লুট ক'রে অদৃশ্য হয়েছিল।

পাশেই খানিকটা তার দিয়ে ঘেরা জমি ছিল। সেই তারের বেড়ার জন্যে যে-সব কাঠের খুঁটি ব্যবহৃত হয়েছিল তার একটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ওপড়ানো খুঁটির গর্তের পাশেই ছিল একটা জুতোসুদ্ধ পায়ের ছাপ। সেই ছাপটা মাটির ভিতরে খুব গভীর হয়ে বসে গিয়েছিল।

পুলিস অনুমান করলে যে, এই খুঁটিটা উপড়ে নিয়ে হত্যাকারী তার সাহায্যেই খুন করেছে। খুঁটিটা খুব জোরে টানাটানি করবার সময়েই তার পায়ের জুতো চেপে মাটির ভিতরে বসে গিয়েছে।

ছাপ পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, খুনীর পায়ে বুটজুতো এবং জুতোর তলায় ছিল বড় বড় পেরেক। একটা পেরেক আবার অসাধারণ ও আকারে অন্যগুলোর চেয়ে ঢের বড়। পুলিস সেই ছাপের ছাঁচ তুলে রেখে দিলে।

ঘটনাস্থলের আশপাশে কড়া পাহারা বসল। এক রবিবার স্থানীয় গীর্জা থেকে একটি যুবক বেরিয়ে এল, যার ভাবভঙ্গি সন্দেহজনক। পুলিসের লোক তার পিছু নিলে। পথে এক জায়গায় নরম মাটির উপর দিয়ে যাবার সময়ে, কাদায় তার জুতোর ছাপ পড়ল। তাতেও দেখা গেল একটা বড় আকারের অসাধারণ পেরেকের দাগ। যুবককে তখনি গ্রেপ্তার ক'রে তার জুতোর ছাপের ছাঁচ নেওয়া হ'ল। হত্যাকারীর জুতোর ছাপের ছাঁচের সঙ্গে অবিকল মিল হয়ে গেল! যুবক তখন অপরাধ স্বীকার ক'রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ করলে।

রক্তের দাগ হচ্ছে পুলিসের পক্ষে খুনের কিনারা করবার আর এক উপায়। খুনী ব'লে যার উপরে সন্দেহ করবার কারণ থাকে, তার ঘরে যদি রক্তমাখা জামা-কাপড়, অস্ত্র বা অন্য কোন জিনিস পাওয়া যায়, তাহলে পুলিসের পক্ষে যারপরনাই সুবিধা হয়।

কিন্তু সেকালে খুনীর কাপড়ে রক্তের দাগ থাকলে অনেক সময়ে

পুলিসের কিছুই বলবার থাকত না। সেদিন পর্যন্ত অনেক আসল খুনীই নিজের জামা-কাপড়ের বা ব্যবহার্য অস্ত্রের উপরকার রক্ত পশু-পক্ষীর রক্ত ব'লে আইনকে কলা দেখাতে পেরেছে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এটা আর হবার যো নেই! এখন কোন কিছুতে রক্ত লাগলে কিছুকাল পরেও পুলিস ব'লে দিতে পারে যে, সে রক্ত মানুষের কি না? এমন কি, তা গোরু বা ভেড়া বা শূকর বা অন্য কোন পশুর রক্ত কি না, তাও ধরতে পারা যায়। কারণ, মানুষের এবং অন্যান্য পশুর রক্তাণু বা অণুকোষের (corpuscles) মধ্যে নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। এমন কি, রক্তের বিশেষত্ব অনুসারে মানুষদেরও এখন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। কাপড়ে রক্তের দাগ দেখলে তা বিশেষ কোন মানুষের রক্ত ব'লে এখনো প্রমাণিত করা যায় না বটে, কিন্তু বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের রক্ত ব'লে অনায়াসে ধরা যায়।

"জয়ন্তের কীর্তি"র মধ্যে অপরাধীদের ফোটোগ্রাফের সাহায্যে আখ্যানবস্তুকে অধিকতর জোরালো ক'রে তোলা হয়েছে। এই ফোটোগ্রাফির আবিষ্কার কেবল সাধারণ মানুষকে উপকৃত করে নি, পুলিসের কাজ অনেকদিক দিয়েই যথেষ্ট সহজ ক'রে এনেছে। ধরতে গেলে আঙুলের ছাপ ছাড়া ফোটোগ্রাফির মতো আর কোন আবিষ্কারই পুলিসকে এত-বেশি সাহায্য করে নি।

সকলেই হয়তো জানেন যে, অপরাধীরা প্রায়ই পেশাদার হয়, অর্থাৎ অপরাধই হয় তাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়। কাজেই প্রত্যেক পেশাদার অপরাধীই জীবনে অনেক বার আইনভঙ্গ করে।

কিন্তু এখন সব দেশেরই পুলিসের চিত্রশালায় প্রত্যেক নবীন ও প্রবীণ অপরাধীর ফোটোগ্রাফ সযত্নে তোলা থাকে। কাজেই কোন অপরাধের সঙ্গে কোন পলাতক পুরাতন অপরাধীর সম্পর্ক আবিষ্কৃত হ'লেই এই ফোটোগ্রাফের সাহায্য নেওয়া হয় নানা ভাবে, এবং ঐ অপরাধী পৃথিবীর শেষ-প্রান্তে পলায়ন করলেও কেবল ফোটোর সাহায্যেই তাকে আবার গ্রেপ্তার করবার সুবিধা হয়। আসলে, অপরাধীদের দেহ মুক্তি

পেলেও পুলিসের চিত্র-কারাগারে তারা চিরকালের জন্যে বন্দী হয়ে থাকে।

কেবল ফোটোর মহিমায় নির্দোষ ব্যক্তির প্রাণ বা সম্মান রক্ষা পেয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমেরিকার রাইও-ডি-জেনিরো বন্দর থেকে এক ইংরেজ তার এক ব্রেজিলিয়ান বন্ধুর সঙ্গে প্রমোদ-তরণীতে (yacht) চ'ড়ে সমুদ্রে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল। কিন্তু সে ফিরে এল তার ব্রেজিলিয়ান বন্ধুর মৃতদেহ নিয়ে!

ইংরেজ বললে, তার বন্ধু নাকি মাস্তুল থেকে প'ড়ে গিয়ে মাথায় আহত হয়ে মারা পড়েছেন।

প্রমোদ-তরীর একখানা দাঁড় পাওয়া গেল না। ডাক্তাররা বললেন, মৃত ব্যক্তির মাথায় যে ক্ষত রয়েছে, দাঁড়ের বাড়ি আঘাত করলেও সে-রকম ক্ষত হতে পারে!

তারপরে জানা গেল, নৌকো নিয়ে বেড়াতে বেরুবার দুইদিন আগেই দুই বন্ধুর ভিতরে অত্যন্ত ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল।

ইংরেজ বললে, "কিন্তু সে ঝগড়া স্থায়ী হয় নি। আবার আমাদের ভাব হয়ে গিয়েছিল।"

পুলিস তার কথা বিশ্বাস করলে না। খুনের অপরাধে তাকে চালান দেওয়া হ'ল।

আসামীর বাঁচবার কোন উপায়ই রইল না; কিন্তু হঠাৎ আসামীর সপক্ষে এক আশ্চর্য প্রমাণ পাওয়া গেল।

বন্দর থেকে আসামীর প্রমোদ-তরী যখন বাইরে যাচ্ছিল, তখন একখানা বড় জাহাজ বন্দরের ভিতরে প্রবেশ করছিল।

একজন শখের ফোটোগ্রাফার সেই সময়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে ছবি (snapshot) তুলেছিলেন।

ছবি 'ডেভালপ' ক'রে দেখা গেল, একখানা নৌকোর উপরে শূন্যে কি একটা কালো দাগ রয়েছে।

'এনলার্জ' করবার পর বোঝা গেল, ঐ কালো দাগটা আর কিছু নয়, মাস্তুলের উপর থেকে একটি লোক নৌকোর পাটাতনের দিকে প'ড়ে যাচ্ছে!

ইংরেজ-বেচারার বিপদের কথা ফোটোগ্রাফার শুনেছিল। সে তখনি ঐ ফোটোখানি পুলিসে দাখিল করলে। ফলে ইংরেজটির ফাঁড়া কেটে গেল, সে বেকসুর খালাস পেলে।

লাশ বেশিদিন অবিকৃত থাকে না। কিন্তু তার দেহ হত্যাকাণ্ডের অনেকদিন—সময়ে সময়ে কয়েক বৎসর—পরেও পুলিসের কাজে বিশেষ দরকার হয়। এক্ষেত্রেও ক্যামেরার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। উপরন্তু ঘটনাস্থলের সাময়িক ও স্থায়ী ছবি এবং অপরাধকালে ব্যবহৃত নানা জিনিসের ছবিও ঐ ক্যামেরার সাহায্যে দেশ-বিদেশে যখন-তখন কাজে লাগানো যায়।

বিশেষ ক'রে আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করবার সময়ে এখন সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে ঐ ক্যামেরাই (triple extension camera)। আগেই বলেছি, আঙুলের ছাপ ক্যামেরার প্রসাদে তিন-চারগুণ বেশি বড় ক'রে তুললে পরীক্ষার যে কত সুবিধা হয়, তা আর বলবার নয়। দলিল-পত্র সম্পর্কীয় অনেক জটিলতাই আজকাল কেবল ক্যামেরার সাহায্যেই পরিষ্কার ক'রে ফেলা হয়।

কিন্তু কিছু-বেশি অর্ধ শতাব্দীর আগে ক্যামেরার সঙ্গে পুলিসের কোন সম্পর্কই ছিল না—যদিও সত্যিকার ফোটোগ্রাফি আবিষ্কৃত হয়েছে তার বহু পূর্বে—১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে।

আধুনিক ডিটেক্‌টিভের আর একটি প্রধান সাহায্যকারী হচ্ছে 'মাইক্রোস্কোপ' বা অণুবীক্ষণ। কিন্তু এ-জিনিসটির সঙ্গেও সেকেলে পুলিস পরিচিত ছিল না। এমন-কি ঔপন্যাসিক কন্যান ডইলের মানসপুত্র ডিটেক্‌টিভ শার্লক হোমস্ যখন অপরাধ-রহস্য আবিষ্কারের জন্যে বিশেষ-রূপে বীক্ষণ-কাঁচের সাহায্য নিতেন, সত্যিকার পুলিস তখনো ঐ বিষয় নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে রাজি হয় নি।

কিন্তু আজ তাদের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে। পুলিসের খাতাপত্র খুঁজলে জানা যাবে, অণুবীক্ষণ অভাবে বহু ক্ষেত্রেই আধুনিক গোয়েন্দাগিরি অচল হয়ে পড়ে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে কোল নামে এক কনেস্টবল চোর ধরতে গিয়ে মারা পড়ে। সেই খুনী চোর ভার দুর্ভাগ্যক্রমে লাশের কাছে একখানা বাটালি ফেলে গিয়েছিল।

বাটালির তলায় কতকগুলো হিজিবিজি কি দাগ ছিল। খালি চোখ দিয়ে দেখে দাগগুলো বাজে ব'লেই মনে হয়। কিন্তু ইনস্পেক্টার গম যখন বীক্ষণ-কাঁচ দিয়ে দেখলেন তখন সেই হিজিবিজির ভিতর থেকে হত্যাকারীর নাম স্পষ্ট হয়ে উঠল! ফলে ধরা প'ড়ে তার ফাঁসি হয়। বীক্ষণ কাঁচ না থাকলে এ মামলার কোনই কিনারা হ'ত না। এমন অসংখ্য মামলার কাহিনী এখানে বলা যায়। কিন্তু আমাদের জায়গা নেই!

বীক্ষণ-কাঁচ আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করবার সময়েও অপরিহার্য। ঘটনাস্থলে চোর বা হত্যাকারী হয়তো নিজের জামা-কাপড়ের দু-একটা অতি-ক্ষুদ্র কণা-পরিমাণ টুকরোও ফেলে গিয়েছে, পরে বীক্ষণ-কাঁচের সাহায্যে সেই তুচ্ছ জিনিস পরীক্ষা ক'রেও বড় বড় অপরাধীকে ধ'রে ফেলা হয়েছে! জালিয়াতি আবিষ্কার করতেও বীক্ষণ-কাঁচ অদ্বিতীয় এবং রক্ত-পরীক্ষাকালেও বৈজ্ঞানিক পুলিস অণুবীক্ষণ ব্যবহার না ক'রে পারে না।

এই বৈজ্ঞানিক পুলিসের আবির্ভাবে আধুনিক অপরাধ-কাহিনী নতুনতায় বিচিত্র হয়ে উঠেছে, এর কাছে সেকেলে গোয়েন্দা-কাহিনী অনেক সময়ে ছেলেভুলানো গল্প ব'লেই মনে হয়।

●

কুমারের বাঘা গোয়েন্দা

ট্রেনের উপরে হানা

প্রথম

সন্ধ্যা হয়-হয়।

সূর্য অস্ত গিয়েছে, কিন্তু তার সমুজ্জ্বল ও আরক্ত আশীর্বাদের কিছু-কিছু আভাস এখনো দেখা যাচ্ছে আকাশের এখানে-ওখানে, মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে।

যাকে বলে তেপান্তরের মাঠ। ধু-ধু-ধু-ধু ময়দানের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে বন্য বাতাস হু-হু-হু-হু। এবং সেই বন্য বাতাসের গতিকে অনু-সরণ করবার জন্যেই যেন বাঁধা লাইনের উপর দিয়ে তীব্র বেগে ধেয়ে চলেছে একখানা রেলগাড়ি।

ছুটতে ছুটতে ট্রেনখানা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—সম্ভবত ট্রেনের বিপদসূচক ঘণ্টার দড়িতে টান মেরে রেলগাড়িকে কেউ থামতে বাধ্য করলে।

তারপরই একটা হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড।

ঠিক যেন কোন অদৃশ্য জাদুকরের আশ্চর্য মন্ত্রশক্তিবলে আচম্বিতে প্রায় শতাধিক মনুষ্য-মূর্তি আবির্ভূত হ'ল সেই বিজন তেপান্তর মাঠের উপরে। তারা যে এতক্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিল, তা অনুমান করাও অসম্ভব। তাদের প্রত্যেকেই সশস্ত্র। অনেকেরই হাতে রয়েছে বন্দুক বা রিভলবার এবং যাদের আগ্নেয়াস্ত্র নেই তাদেরও হাতে আছে ভয়াবহ বর্শা, তরবারি, কুঠার বা মোটামোটা লোহা-বাঁধানো বাঘ-মারা লাঠি।

তারা সবাই বেগে ছুটে গেল ট্রেনের দিকে। তারপরই সেই বিজন মাঠের নিদ্রাতুর নিস্তব্ধতা হঠাৎ যেন আর্তনাদ ও ছটফট ক'রে উঠল ঘন-ঘন বন্দুকের শব্দে, বহু মনুষ্য-কণ্ঠের হুঙ্কারে এবং আর্ত চিৎকারের

পর চিৎকারে!

সেই ট্রেনেরই একটি কামরায় বসেছিল বিমল এবং কুমার। কলকাতা ছেড়ে তারা কোন জমিদার-বন্ধুর নিমন্ত্রণ রাখতে চলেছে। কিন্তু এই আকস্মিক গোলমাল শুনে তারা ছুটো জানালার কাছে এসে বাইরে দিকে মুখ বাড়িয়ে দিলে। মিনিট-খানেক এদিক-ওদিকে দৃষ্টিচালনা ক'রে কুমার শুধোলে, "এ আবার কি কাণ্ড বিমল?"

বিমল বললে, "কাণ্ডটা অনুমান করা একটুও কঠিন নয়। একদল ডাকাত লুটপাট করবার জন্যে ট্রেনখানাকে আক্রমণ করেছে! তাদেরই দলের কোন লোক গাড়ির ভিতরে ছিল, নির্দিষ্ট স্থানে এসে হঠাৎ 'এলার্ম চেন' টেনে গাড়িখানাকে থামিয়ে দিয়েছে।"

দলে-দলে লোক বিকট চিৎকার ও অস্ত্রশস্ত্র আস্ফালন করতে করতে বেগে ছুটে আসছে তাদের কামরার দিকেই!

কুমার বললে, "এখন আমাদের কি করা উচিত?"

বিমল তাড়াতাড়ি কামরার অন্যদিকের একটা জানালার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, "এদিকটা দেখছি একেবারেই নির্জন। এস কুমার, জানালা দিয়ে গ'লে মারো লাফ বাইরের দিকে!"

বিমলও তাই করলে, কুমারও তাই করলে। তারপর তারা দু'জনে দ্রুতপদে উঁচু রেলপথ ছেড়ে ঢালু জমির উপর দিয়ে নেমে নিচের মাঠের উপরে গিয়ে পড়ল।

কুমার বললে, "ট্রেন তো ছাড়লুম। এখন যাই কোনদিকে?"

বিমল বললে, "দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানহারা হয়ে ছুটে চল এই মাঠের উপর দিয়ে। এই বিপজ্জনক রেলপথ ছেড়ে যত দূরে গিয়ে পড়তে পারি ততই ভাল!"

সামনেই ছিল একটা মস্ত-বড় ঝুপসী অশথ গাছ। তারই উপরের কোন ডাল থেকে হঠাৎ কে পেত্নীর মতন রোমাঞ্চকর ও খনখনে কণ্ঠস্বরে খল-খল অট্টহাস্য ক'রে ব'লে উঠল, "আরে বিমল, আরে কুমার, পালিয়ে যাবে কোথায়? এত সহজে অবলাকান্তকে ফাঁকি দেওয়া চলে না!"

বিমল এবং কুমার সচমকে ও সবিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে গাছের উপরদিকে ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে দেখল! পরমুহূর্তেই সেই বৃহৎ বৃক্ষটা করলে যেন দলে-দলে মনুষ্য বৃষ্টি!

পিছনদিকে উঁচু রেলপথ ও ট্রেন ও দস্যুদল এবং সামনের দিকেও এই আকস্মিক ভাবে আবির্ভূত শত্রুর দল! বিমল আর কুমারের পালাবার কোন পথই আর খোলা রইল না।

একটা কৃষ্ণবর্ণ, সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ মূর্তি চকচকে রিভলবার হাতে ক'রে বিমলের সামনে এগিয়ে এসে আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠে ব্যঙ্গপূর্ণকণ্ঠে বললে, "মহামহিমার্ণব বিমলবাবু, অধীনকে চিনতে পারছেন কি?"

বিমল কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে শান্ত কণ্ঠেই বললে, "চিনতে পারছি বৈকি! তুমি হচ্ছ অবলাকান্ত, পৃথিবীর একটা নিতান্ত নিকৃষ্ট কীট।"

অবলাকান্ত তার সেই অস্বাভাবিক নারীকণ্ঠে আবার একবার অট্টহাস্য ক'রে উঠল। তারপর হাতের রিভলবারটা নাচাতে-নাচাতে বললে, "কে যে নিকৃষ্ট আর কে যে উৎকৃষ্ট এখনো তার প্রমাণ কি পাও নি বাপু? সেই "জেরিনার কণ্ঠহারে"র* মামলার সময় থেকেই বারবার তোমরা আমাকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছ। কিন্তু কোন বারেই তোমাদের আক্রমণ সফল হয় নি। উলটে প্রত্যেক বারেই আমি তোমাদের নাজেহাল ক'রে নাকের জলে আর চোখের জলে এক ক'রে ছেড়েছি। কেমন, এ-কথা মানতে রাজি আছ কি?"

বিমল মাথা নেড়ে বললে, "মোটেই নয়। তুমি তোমার ঐ ক্ষুদ্র প্রাণ নিয়ে বারবার আমাদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করেছ—এইমাত্র। যতবারই তুমি ফাঁদ পেতেছ, ততবারই আমরা সেই ফাঁদ ভেঙে বাইরে আসতে পেরেছি। জেরিনার কণ্ঠহারের কথা বলছ? তোমার হাত থেকে আমরা কি সেটা ছিনিয়ে নিতে পারি নি?"

অবলাকান্তের সেই বৃহৎ দেহ বিপুল ক্রোধে ফুলে যেন দ্বিগুণ হয়ে

* আমার লেখা "জেরিনার কণ্ঠহার" উপন্যাস দেখুন।

উঠল। নিজের একটিমাত্র চক্ষুর ভিতর দিয়ে প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণ ক'রে সচিৎকারে সে বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! সেইজন্যেই তো তোদের সকলকার ওপরে আমার এমন জাতক্রোধ! আমার নিজের কথা বলছিস ? আমাকে তোরা ধরবি কি রে, আমার যখন খুশি তোদের খোকার মতন ভুলিয়ে ফাঁকি দিতে পারি! কিন্তু জেরিণার কণ্ঠহার—জেরিণার কণ্ঠহার! হ্যাঁ, তোদের জন্যেই আমি হারিয়েছি জেরিণার কণ্ঠহার! সে দারুণ দুঃখ এ-জীবনে আমি আর ভুলব না।"

বিমল মৃদু-মৃদু হাসি হেসে বললে, "বেশ, সেই দুঃখ নিয়েই ইহলোকে তুমি তোমার পাপজীবন যাপন কর, তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই ? কিন্তু আজকের এই ঘনঘটার অর্থটা কি ?"

—"অর্থ ? হুঁ, অর্থের ভিতরেই আছে অনর্থ! তোদের ওপরে আমি বরাবরই নজর রেখেছি। তোরা যে আজ এই ট্রেনে আসবি সে-খবরও আমি পেয়েছি যথাকালেই! আমি কেবল এই ট্রেনখানাকে আক্রমণ করতে আসি নি, আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তোদের দু'জনকে গ্রেপ্তার করা।"

কুমার হাসতে-হাসতে বললে, "আমরা হচ্ছি তুচ্ছ ব্যক্তি। মনে আছে, বিমল তোমাকে প্রথমে আক্রমণ করে নি, প্রথম আক্রমণ করে-ছিলে তুমিই তাকে ? তবে আমাদের ওপরে এতটা সুনজর দেওয়ার কারণটা কি ?"

অবলাকান্ত ভুরু নাচিয়ে বললে, "কারণ ? কারণ নিশ্চয়ই আছে! তোরা আর জয়ন্তরা যতদিন বেঁচে থাকবি, ততদিন আমি এই পৃথিবীতে নিরাপদ নই! তোদের আমি তিল-পরিমাণ তুচ্ছ লাল পিঁপড়ের মতনই মনে করি। কিন্তু জানিস তো, ক্ষুদ্র লাল পিঁপড়েও কামড়ালে মানুষ তাকে বধ না ক'রে পারে না ? সেইজন্যেই আগে আমি তোদের ক'জনকে এই পৃথিবী থেকে একেবারে সরিয়ে দিতে চাই।"

বিমল বললে, "তুমি তো বারবার নতুন-নতুন উপায়ে আমাদের পৃথিবী থেকে সরাবার চেষ্টা করেছ। কিন্তু পেরেছ কি ?"

অবলাকান্ত আবার খলখলে অট্টহাসি হেসে বললে, "ঠিক বলে-ছিস। ধরলুম আর মারলুম, এ-ভাবে মানুষ মেরে আমার হাতের সুখ হয় না। যদি শত্রুর মতন শত্রু পাই, নতুন-নতুন উপায়ে তাকে বধ করতে পারলেই সীমা থাকে না আমার আনন্দের।"

কুমার বললে, "এবারেও একটা নতুন উপায়েই আমাদের হত্যা করবে নাকি?"

—"নিশ্চয়।"

—"উপায়টা কি দাদা?"

—"আগে থাকতে বলবার দরকার কি? একটু পরেই স্বচক্ষে আর স্বকর্ণে সমস্তই দেখতে আর শুনতে পাবি।" অবলাকান্ত হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে তার অনুচরদের ডেকে বললে, "এই! তোরা সঙের মতন দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? বন্দুকের পাহারার ভিতরে রেখে এই দুটো ছুঁচোকে আমাদের আড্ডার দিকে নিয়ে চল।"

দ্বিতীয়

সাঁকোর উপরে অভিনয়

বহু—বহুদূর থেকে শোনা গেল একটা বংশীধ্বনি।

তারপর আরো কাছ থেকে শোনা গেল আর একটা বাঁশির তীক্ষ্ণ আওয়াজ।

তারপর খুব নিকটেই জেগে উঠল তীক্ষ্ণতর আর একটা বংশীধ্বনি।

অবলাকান্ত ব্যস্ত ভাবে বললে, "এ-সব বাঁশি বাজাচ্ছে আমাদের চররাই। খুব সম্ভব পরের স্টেশনের কর্তাদের টনক নড়েছে, আর ব্যাপার কি জানবার জন্যে এদিকে ছুটে আসছে রেলওয়ে পুলিসের দল! ব্যাস, আর নয়, এইবারে সময় থাকতে-থাকতে জাল গুটিয়ে ফ্যাল।" ব'লেই

পকেট থেকে নিজে একটা বাঁশি বার ক'রে খুব জোরে উপর-উপরি তিনবার ফুঁ দিলে।

পর মুহূর্তেই ট্রেনের এদিক-ওদিক থেকে দলে দলে সব যমদূতের মতন মূর্তি দ্রুতবেগে অবলাকান্তর কাছে এসে তার চারিদিক ঘিরে দাঁড়াল। তাদের হাতে কেবল অস্ত্রশস্ত্র নেই, সেই সঙ্গে অধিকাংশেরই কাঁধ বা পিঠের উপরে রয়েছে পোঁটলা-পুঁটলি, ব্যাগ, সুটকেস বা 'ট্রাঙ্ক' প্রভৃতি। নরহত্যা ও ট্রেন লুণ্ঠন ক'রেই তারা যে হতভাগ্য যাত্রীদের এই-সব মালপত্তর হস্তগত করেছে, সে-বিষয়ে নেই কোনই সন্দেহ।

সকলকার দিকে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি-সঞ্চালন ক'রে নিয়ে অবলাকান্ত অত্যন্ত প্রফুল্ল কণ্ঠে বললে, "বাহাদুর, তোরা সবাই বাহাদুর। দেখছি আজ আমাদের এক ঢিলে দুই-পাখি মারা উৎসব যোড়শোপচারে সু-সম্পন্ন হ'ল। আর দেরি নয়। এই দুই ব্যাটা নচ্ছারকে একেবারে সামনের দিকে রেখে গোরু-তাড়ানোর মতন তাড়িয়ে নিয়ে চল। এদের ঠিক পিছনেই দু'জন লোক বন্দুক নিয়েই তৈরি হয়ে থাকুক। কেউ

পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি ক'রে তাকে মেরে ফেলা হবে। সবাই মনে রাখিস, এরা হচ্ছে পাঁড়ঘুঘু, অসম্ভব রকম সব চালাকি জানে।"

ঠিক অবলাকান্তের হুকুম মতোই ব্যবস্থা হ'ল। মাঠের উপর দিয়ে সর্বাগ্রে অগ্রসর হ'তে বাধ্য হ'ল বিমল এবং কুমার। দু'জন লোক বন্দুক তুলে চলল তাদের পিছনে-পিছনে। এবং তাদের পরে আসতে লাগল প্রায় শতাধিক ডাকাতের দল, বিপুল আনন্দে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করতে করতে।

অবলাকান্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে বললে, "এই সব গাধার দল! সবাই একেবারে চুপ ক'রে থাক! কেউ যদি টুঁ শব্দটি করবি, আমি তখনি গলা টিপে তাকে মেরে ফেলব! ব্যাটারা ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আর পৃথিবী জাগাতে জাগাতে পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে! ওদিকে যে পুলিসের টনক নড়েছে সে-খেয়াল কারুর নেই!"

বিমল বললে, "অবলাকান্ত, তুমি আগে ছিলে গুণ্ডা আর চোর! তারপর হয়েছিলে সুন্দরবনের নদী-নালার খুনে বোম্বেটে! তারপর আজ তোমাকে দেখছি লুণ্ঠনকারী দস্যুরূপে! এরপর তোমাকে আর কোন মূর্তিতে দেখতে পাব, সেটা আমি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছি না!"

নারীকণ্ঠ অবলাকান্ত হো-হো স্বরে হেসে উঠে বললে, "ওরে বিমল, ভোল না ফেরালে ভিখ মেলে কি? তোদের উৎপাতে কলকাতা শহর ছাড়তে হ'ল! গেলুম সুন্দরবনে জলের বাসিন্দা হতে। সেখানে গিয়েও তোরা নাক গলাতে ছাড়লি না! কাজেই আমি এখন আবার নতুন কর্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি! আমি হচ্ছি পারার মতন পিচ্ছিল, ধরি-ধরি ক'রেও তোরা আমাকে কোনদিনই ধরতে পারবি না!"

তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে সন্ধ্যা। প্রান্তরের দিকে দিকে নেমে এসেছে নিবিড় অন্ধকারের কালো যবনিকা। বাসায় ফিরে-যাওয়া পাখিদের কলরব পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে শোনা যাচ্ছে কেবল ঝিল্লী-দের কর্কশ কণ্ঠের অবিশ্রান্ত ধ্বনি।

বোধহয় সেদিন আকাশে উঠেছিল অষ্টমীর চাঁদ। তার স্বল্প কিরণে অন্ধকারের নিবিড়তা খানিকটা পাতলা হয়ে গেল। এবং সেই ম্লান আলোকেই দেখা গেল সামনেই রয়েছে একটি সাঁকো এবং তার তলায় শোনা যাচ্ছে কোন নদীর কলকণ্ঠ স্বর।

বিমল আর কুমার সর্বাগ্রে সাঁকোর উপর গিয়ে দাঁড়াল।

হঠাৎ বিমল অনুচ্চকণ্ঠে তামিল ভাষায় কুমারকে সম্বোধন ক'রে বললে, "কুমার, আমি যেই 'পুলিস' ব'লে চিৎকার ক'রে উঠব, তুমি তখনি এই সাঁকোর উপর থেকে নদীর উপরে মারবে এক লাফ! তারপর জলের উপরে আর না মাথা জাগিয়ে ডুব-সাঁতার দিয়ে চলে আসবে ঠিক এই সাঁকোর তলায়। আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকব। তারপর যা করতে হবে যথাসময়েই ব'লে দেব।"

পিছন থেকে অবলাকান্ত খাপ্পা হয়ে ব'লে উঠল, "তোরা ইণ্ডিল-মিণ্ডিল ক'রে কি কথা কইছিস রে?"

বিমল বললে, "আমরা কইছি নিজেদের কথা।"

—"নিজেদের কথা? কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন?"

—"সেটা তোমার বিদ্যা-বুদ্ধির দোষ, আমরা কি করব বল?"

—"খবরদার! তোরা আর কোন কথাই কইতে পারবি না!"

—"যো হুকুম, জনাব!"

তারা তখন সাঁকোর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় এসে পড়েছে।

বিমল আচম্বিতে পিছনপানে তাকিয়ে প্রচণ্ড উল্লাস-ভরা কণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠল, "পুলিস! পুলিস! কুমার, আর আমাদের ভয় নেই! পিছনদিকে তাকিয়ে দেখ দলে দলে পুলিসের লোক এইদিকে ছুটে আসছে! জয় ভগবান!"

অপরাধীদের কাছে 'পুলিস' নামের চেয়ে ভয়াবহ আর কিছুই নেই। বিমলের সেই উল্লসিত উক্তি শুনেই দস্যুদলের সবাই সচমকে আত্মহারার মতন পিছনদিকে ফিরে দাঁড়াল।

—এবং সেই সুযোগে বিমল ও কুমার সাঁকো থেকে লাফ মেরে নদীর

জলের ভিতরে গিয়ে পড়ল।

ডুব-সাঁতার দিয়ে তারা দু'জনে ঠিক সাঁকোর তলায় গিয়ে আবার জলের উপরে ভেসে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনলে উপর-উপরি বন্দুকের গর্জন!

বিমল বললে, "ছুঁড়ুক ওরা বন্দুক! স্বভাবতই ওরা ভাববে আমরা নদীর এদিক বা ওদিক দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছি! কিন্তু কুমার, আমরা তা করব না! আমরা এই সাঁকোর তলা দিয়েই বারংবার ডুব-সাঁতার কেটে যে-দিক থেকে এসেছি, আবার সেই দিকেই চলে যাব। তারপর পায়ের কাছে যখন মাটি পাব, সেইখানেই আমরা গোপনে অপেক্ষা করব কিছুক্ষণ। সাঁকোর তলাটা ওরা দেখতে পাচ্ছে না। আর ওরা কল্পনাও করতে পারবে না যে, যেদিক থেকে আমরা এসেছি আমরা আবার সেইদিকেই ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করছি।"

এক-একবার ভেসে উঠে নিঃশ্বাস নিয়েই আবার ডুব-সাঁতার দিতে দিতে তারা হাজির হ'ল সাঁকোর প্রান্তদেশে।

সাঁকোর তলায় নদীর জলের উপর বিরাজ করছে কালো ছায়া। সেইখানে তারা জলের উপরে কেবল নাক পর্যন্ত জাগিয়ে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে চুপ করে বসে রইল। সেই অবস্থায় থেকে তারা শুনতে পেলে বহু দ্রুতপদের শব্দ, চিৎকার এবং মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ।

তারপরেই শোনা গেল অবলাকান্তের খনখনে কণ্ঠস্বর! সে ব'লে উঠল, "ওরে, দরকার নেই আর এখানে গোলমাল ক'রে! ঐ হতভাগা ব্যাটাদের নিয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে বেশি মাথা ঘামাতে গেলে এখনি সত্য-সত্যই পুলিস-ফৌজ এসে পড়বে! তার চেয়ে হাতে যা পেয়েছিস তাই নিয়েই এখন তাড়াতাড়ি লম্বা দেবার চেষ্টা কর!"

তৃতীয়

ঈশ্বর-প্রেরিত বৃষ্টি

তখন সবে প্রাতরাশ শেষ হয়েছে। সুন্দরবাবু মস্ত বড় একটা 'বার্মা-সিগার' ধরালেন। জয়ন্ত আলমারির ভিতর থেকে অপরাধতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা বই নিয়ে আবার নিজের সোফায় এসে বসল। মানিক টেনে নিলে খবরের কাগজখানা।

হঠাৎ সিঁড়ির উপর শোনা গেল একাধিক ব্যক্তির দ্রুত পদশব্দ। জয়ন্ত হাতের বইখানা সামনের টেবিলের উপর রেখে মানিকের দিকে তাকালে জিজ্ঞাসু চোখে। মানিক তাকিয়ে রইল ঘরে ঢোকবার দরজার দিকে।

ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল বিমল এবং কুমার। তাদের দু'জনেরই চেহারা ছন্নছাড়ার মতো।

সুন্দরবাবু তাঁর মস্ত চুরোটে একটা জোর টান দিতে-দিতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বিমল এবং কুমারের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, "হুম!"

জয়ন্তও তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ ক'রে অত্যন্ত বিস্মিত স্বরে ব'লে উঠল, "বিমলবাবু, কুমারবাবু! আপনাদের এ কী চেহারা? কী হয়েছে? আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

বিমল অত্যন্ত শ্রান্তভাবে একখানা চেয়ারের উপরে ধপাস ক'রে বসে প'ড়ে বললে, "আমরা আসছি যমালয় থেকে।"

—"মানে?"

—"মানে হচ্ছে এই যে, আমরা আবার গিয়ে পড়েছিলুম সেই অবলাকান্তের পাল্লায়।"

সুন্দরবাবু ধড়মড় ক'রে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতের চুরোটটা দূরে নিক্ষেপ ক'রে ব'লে উঠলেন, "বলেন কি, আপনারা আবার অবলাকান্তের দেখা পেয়েছেন নাকি ?"

—"পেয়েছি বৈ-কি। যথেষ্ট রূপেই পেয়েছি।"

—"হুম।"

—"আর একদিন অবলাকান্তের পাল্লা থেকে মুক্তি পেয়ে আপনি যেমন এইখানে এসেই হাজির হয়েছিলেন, আমরাও আজ এসেছি তেমনি ভগ্নদূতরূপেই।"*

সুন্দরবাবু মুখব্যাদান ক'রে প্রায় দুই-তিন সেকেণ্ড অবাক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "অবলাকান্ত আবার সুন্দরবনের নদীতে-নদীতে নৌবিহার আরম্ভ করেছে নাকি ?"

—"না, এবারে সে সুন্দরবনের বাইরে স্থলপথে আবির্ভূত হয়ে রেলগাড়ি লুণ্ঠন করেছে। সেই গাড়িতেই ছিলুম আমরা, আমাদেরও সে গ্রেপ্তার করেছিল। রেলগাড়ি লুণ্ঠন বা আমাদের গ্রেপ্তার করা, কোন্‌টা ছিল যে তার মুখ্য উদ্দেশ্য, সে-কথা আমরা ঠিক ক'রে বলতে পারি না।"

মানিক দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললে, "বলেন কি মশাই ? অবলাকান্ত আপনাদেরও গ্রেপ্তার করেছিল ? কিন্তু আপনারা মুক্তি পেলেন কেমন ক'রে ?"

বিমল হাসতে হাসতে বললে, "চিন্তাশক্তি প্রয়োগ ক'রে।"

—"কি-রকম ?

—"তাহলে আগে সব কথা শুনুন।"

তারপরে বিমল যে কাহিনী বললে, পাঠকদের কাছে তার অধিকাংশই বলেছি প্রথম পরিচ্ছেদে। কাজেই সে-সব কথার আর পুনরুক্তি না ক'রে এখানে কেবল তারপরের ঘটনা বিমলের ভাষাতেই তুলে দেওয়া হ'ল :

"সাঁকোর আচ্ছাদন মাথার উপরে রেখে আমি আর কুমার বারংবার ডুব-সাঁতার কাটতে কাটতে, যে-দিক থেকে এসেছিলুম সাঁকোর ঠিক সেই

* "সুন্দরবনের রক্তপাগল" দ্রষ্টব্য।

প্রান্তে গিয়ে পায়ের তলায় খুঁজে পেলুম পৃথিবীর মাটি।

"যে-কারণেই হোক, অবলাকান্ত তার দলবল নিয়ে আমাদের আর পুনরাবিষ্কার করবার চেষ্টা করলে না। খুব সম্ভব বেশি খোঁজাখুঁজি করবার সময় তার হাতে ছিল না, কেন না সেখানে রেলওয়ে-পুলিসের এসে পড়বার সম্ভাবনা ছিল যে-কোন মুহূর্তেই। সাঁকোর উপরে ব্যস্ত পদশব্দ শুনে বুঝতে পারলুম, ডাকাতের দল দ্রুতবেগে ছুটে চলে গেল নদীর অন্য পারের দিকে।

"ঠিক সেই সময়েই নামল ঝমঝম ক'রে প্রবল বৃষ্টির ধারা। সেই বৃষ্টিকে আমার মনে হ'ল স্বর্গের অভাবিত আশীর্বাদের মতন। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, অবলাকান্ত তার দলবল নিয়ে আজ পালিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তার গুপ্ত আস্তানা আবিষ্কার করতে আমাদের আর বিশেষ বেগ পেতে হবে না।"

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "আমিও বুঝতে পেরেছি বিমলবাবু। সত্যসত্যই এ বৃষ্টি হচ্ছে ঈশ্বর-প্রেরিত।"

সুন্দরবাবু অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, "এই রে! তুই পাগলে আবার হেঁয়ালি শুরু করলে! বৃষ্টি তো চিরকালই ঈশ্বর-প্রেরিত হয়। কিন্তু বৃষ্টিপাতের সঙ্গে অবলাকান্তের আড্ডার সম্পর্কটা কি বাবা? হুঁম, তোমাদের কথার কিচ্ছু মানে হয় না।"

বিমল ও জয়ন্ত কোন উত্তর না দিয়ে হাসতে লাগল।

কুমার বললে, "সুন্দরবাবু, বৃষ্টিপাতের সঙ্গে অবলাকান্তের আস্তানার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শুনেছেন তো, সে তার দলের শতাধিক লোক নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে বটে, কিন্তু তারা পাখি নয়, তারা হচ্ছে মানুষ।"

—"হুম, তারা যে পাখি নয় সে-কথা আমিও জানি। আপনি আবার একটা নতুন হেঁয়ালির সৃষ্টি করলেন। এখানে হঠাৎ পাখির কথা উঠল কেন?"

—অবলাকান্তরা হচ্ছে মানুষ। পাখির মতন তারা শূন্যপথ দিয়ে উড়ে পালাতে পারে না। স্থলপথ দিয়ে তাদের পালাতে হবেই, আর

তাদের যেতে হবে এই পৃথিবীর মাটি মাড়িয়েই। এইবারে কিঞ্চিৎ আলোকিত হলেন কি?"

—"মোটেই নয়, মোটেই নয়! দুই চক্ষে আমি দেখছি গভীর অন্ধকার!"

মানিক সকৌতুকে বললে, "সুন্দরবাবু, আপনি যে অন্ধকারের বন্ধু সেটা আমরা চিরদিনই জানি! কিন্তু দয়া ক'রে আজ একটিবার কল্পনা-শক্তি প্রয়োগ ক'রে সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করুন না কেন?"

—"কী আবার বোঝবার চেষ্টা করব? আমি তোমাদের এ-সব হেঁয়ালির কোন ধারই ধারি না। ধাঁধার জবাব দেবার বয়েস আমার নেই।"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, আপনি ঠিক বালকের মতন কথা বলছেন। আপনার মতন পুরাতন পুলিস-কর্মচারীর বোঝা উচিত যে, বৃষ্টিপাতের ফলে মাঠ হয় কর্দমাক্ত। আর সেই ভিজে মাটির উপরে যারা পদচালনা ক'রে যাবে, পৃথিবী তাদের সকলেরই পদচিহ্ন রক্ষা করবে সযত্নে। আমরা যদি অবিলম্বে কলকাতা ছেড়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হতে পারি, তাহলে সেইসব পদচিহ্নের অনুসরণ ক'রে অনায়াসেই খুঁজে বার করতে পারব ডাকাতদের গোপন আস্তানা। এখনো আমাদের কথা হেঁয়ালি ব'লে মনে হচ্ছে কি?"

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু ভাঁটার মতন ক'রে তুলে বললেন, "বুঝতে পেরেছি ভাই জয়ন্ত, বুঝতে পেরেছি। এইবারে আমি স্বীকার করছি, এতক্ষণ আমি একটা আস্ত গাধার মতন কথা বলছিলুম! ঠিক বলেছ, ঐ বৃষ্টিই অবলাকান্তের হাতে পরিয়ে দেবে চকচকে লোহার হাতকড়ি।"

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "কিন্তু আমাদের হাতে আর মোটেই সময় নেই। মাঠের উপর দিয়ে কত মানুষ কত জন্তু চলে বেড়ায়। আমরা যে-সব পদচিহ্ন অনুসরণ করতে চাই, সেগুলো অদৃশ্য হ'তে বেশি দেরি লাগবে না। সুতরাং—"

বিমলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জয়ন্ত বললে, "সুতরাং অবিলম্বেই আমাদের ঘটনাস্থলে যাত্রা করা উচিত।"

"বিমলবাবু, ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছতে আমাদের কত দেরি লাগবে?"

—"ঘণ্টা আড়াই। কিন্তু যে ট্রেন আমাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে, এখনো দেড় ঘণ্টার আগে সে কলকাতার স্টেশন ত্যাগ করবে না। ইতিমধ্যে আপনারও প্রস্তুত হয়ে নিন, আমি আর কুমারও এই জামা-কাপড় ত্যাগ ক'রে খানিকটা ভদ্রলোক সাজি আর কিঞ্চিৎ আহার্য গ্রহণ ক'রে খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠি, কি বলেন?"

জয়ন্ত বললে, "তথাস্তু। সুন্দরবাবু, আপনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন নাকি?"

—হুম। যাব না আবার? ঐ অবলাকান্ত ব্যাটা সুন্দরবনের নদীতে-নদীতে আমাকে নাকানি-চোবানি খাইয়েছে। তার আগে আর পরেও সে আমাদের কম জ্বালিয়ে মারে নি। তাকে হাতের কাছে পেলে আমি তার আস্ত মুণ্ডুটা চিবিয়ে খেতে আপত্তি করব না। আমি এখনি বড়-সায়েবের কাছে ছুটলুম, অবলাকান্তরা দলে খুব ভারী শুনছি, সঙ্গে মিলিটারি পুলিস থাকা দরকার।"

কুমার বললে, "আর আপনাদের ঐ মিলিটারি পুলিসের চেয়েও বেশি কাজ করতে পারবে আমাদের প্রিয়তম বাঘা। পদাচক্রের গন্ধ শুঁকতে সে হচ্ছে মস্ত বড় ওস্তাদ! কি বল বিমল, তাকেও সঙ্গে নেওয়া উচিত নয় কি?"

বিমল গাত্রোত্থান ক'রে বললে, "নিশ্চয়, সে-কথা আবার বলতে!"

চতুর্থ

ঝরা ঘেসো ফুল

বিমল ও জয়ন্ত প্রভৃতি সদলবলে যখন আবার সেই নদী এবং সেতুর কাছে এসে দাঁড়াল, বেলা তখন চারটে বেজে গেছে।

সেতু পার হয়ে তারা নদীর অন্য তীরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সর্বাগ্রে মহা আনন্দে লাফাতে লাফাতে ছুটে যাচ্ছে বাঘা, বোধহয় সে আন্দাজ করতে পেরেছিল যে, আজ আবার কোন একটা নতুন অভিযানের সূত্রপাত হবে।

বাঘার পরেই ছিল বিমল এবং জয়ন্ত। সেতুর অন্য প্রান্তে গিয়ে জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, "সুন্দরবাবু, পুলিস-ফৌজ এখন সাঁকোর উপরই অপেক্ষা করুক। এখানকার মাটির উপরে আমাদের পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে যত কম লোকের পদচিহ্ন পড়ে ততই ভাল।"

সুন্দরবাবু বললেন, কিন্তু আজ সারাদিন ধ'রে এই সাঁকোর উপর দিয়ে স্থানীয় কত লোক যে আনাগোনা করেছে, তুমি কি সেটা হিসাব ক'রে বলতে পারো?"

জয়ন্ত একবার মাঠের মাটির উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "বিমলবাবু, যারা ট্রেন আক্রমণ করেছিল তাদের পায়ে জুতো ছিল কিনা বলতে পারেন?"

বিমল বললে, "আমি যত লোককে দেখেছি তাদের কারুরই পা খালি ছিল না।"

জয়ন্ত বললে, "এ জায়গাটা দেখছি বেশ নির্জন। এখানে কাদার উপরে যতগুলো পায়ের দাগ রয়েছে, তার অধিকাংশই হচ্ছে খালি পায়ের দাগ। কয়েকটা জুতো-পরা পায়ের দাগও রয়েছে বটে, কিন্তু

ওগুলো ডাকাতদের পায়ের দাগ নয় বলেই মনে হচ্ছে।"

বিমল বললে, "আমারও সেই বিশ্বাস।"

সুন্দরবাবু বললেন, "এ-রকম বিশ্বাসের কারণ কি কিছুই বুঝতে পারছি না। আসামীদের জুতোর দাগের ওপর কি 'ডাকাত' কথাটা ছাপ মারা থাকবে?"

জয়ন্ত বললে, "না সুন্দরবাবু, তা থাকবে না। কিন্তু আমি এখানে ডাকাতদের পায়ের দাগ দেখবার আশাই করি না।"

—"কেন? তারা সাঁকোর ওপর থেকে মাটিতে পা না ফেলে পাখির ঝাঁকের মতন কি হুস ক'রে উড়ে পালিয়েছে?"

—"তাও নয়। কিন্তু আমি বিমলবাবুর মুখে শুনেছি, ডাকাতরা সাঁকো পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল। তখনও এখানকার মাটি ভাল ক'রে ভিজতে পারে নি, তাই এখানে ডাকাতদের পায়ের দাগ আবিষ্কার করা সম্ভবপর নয়। ডাকাতদের দলে লোক ছিল নাকি শতাধিক। অতগুলো লোক এই মাঠের উপর দিয়ে যখন একসঙ্গে অগ্রসর হয়েছে, তখন আর কিছুদূর এগুলে আমরাও তাদের পদচিহ্ন নিশ্চয়ই খুঁজে বার করতে পারব। এখানে যে-সব পথিক পায়ের দাগ রেখে গিয়েছে, বৃষ্টি আসবার অনেক পরেই তাদের আবির্ভাব হয়েছিল।"

মাঠের উপর দিয়ে সকলে কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আবার থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে পুরু ঘাস-ভরা জমি। এতক্ষণ কাদার উপরে যে-সব পথিকের পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছিল, সে-গুলো পায়ে-চলা মেটে পথ ধরে সেইখান থেকে বেঁকে ডানদিক ধরে বরাবর চলে গিয়েছে। কিন্তু সে পথের উপরে তখনও কোন বৃহৎ জনতার পদচালনার চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "কি আশ্চর্য, ডাকাত-গুলো তবে কি সত্যিসত্যিই মাটিতে পদার্পণ না ক'রেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে! কি হে জয়ন্ত, কাল বৃষ্টি পড়েছিল ব'লে তোমরা তো খুব খুশি হয়ে উঠেছিলে, কিন্তু এখন কোথায় গেল ডাকাতদের পায়ের দাগ?"

জয়ন্ত বললে, "আপনারা এখানেই খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন, মাঠের ঘাসের উপর দিয়ে আমি একবার এদিক-ওদিক ঘুরে আসি।" ব'লেই সে মুখ নামিয়ে নতদৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকিয়ে মাঠের উপর দিয়ে নানাদিকে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। মাঝে মাঝে সে আবার মাটির উপরে বসে পড়ে এবং কখনো-বা দস্তুরমতন হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! দ্যাখো একবার জয়ন্তের কাণ্ড! মাঠের উপরে হামাগুড়ি দিয়ে ও কি করছে বল দেখি মানিক?"

মানিক বললে, "বোধহয় ঘাস খাবার চেষ্টা করছে।"

হঠাৎ দূর থেকে জয়ন্ত সানন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললে, "পেয়েছি, পেয়েছি! আপনারা সবাই এইখানে আসুন।"

সকলে যখন তার কাছে গিয়ে হাজির হ'ল, জয়ন্ত প্রফুল্ল ভাবে বললে, "গোড়াতেই আমি আন্দাজ ক'রেছিলুম যে, কাঁচা মেটে পথ দিয়ে নিরীহ মানুষরা আনাগোনা করে, ডাকাতরা নিশ্চয়ই সে-পথের পথিক হবে না। কারণ, কাছাকাছি কোন লোকালয়ে নিশ্চয়ই তাদের আস্তানা নেই। অপথ, বিপথ কিংবা কুপথ দিয়ে তারা নিশ্চয়ই যাবে এমন কোন বিজন নিরালা জায়গায়, যেখানে পৃথিবীর সাধারণ লোকের দৃষ্টি থেকে সহজেই নিজেদের আড়ালে রাখা যায়। এই পথহীন মাঠের উপরে আমি তাদের পদচিহ্ন আবিষ্কার করেছি। এই দেখুন!" সে মাঠের উপরে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

সুন্দরবাবু এধারে-ওধারে দৃষ্টি চালনা ক'রে বললেন, "ধ্যেৎ, যত-সব বাজে কথা! কোথা এখানে পায়ের দাগ?"

জয়ন্ত বিমলের দিকে ফিরে বললে, "আপনি কিছু বুঝতে পারছেন কি?"

বিমল হেসে বললে, "পারছি বৈকি! এখানকার ঘাসের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে অনেক লোক এগিয়ে গিয়েছে!"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ। দেখুন সুন্দরবাবু, মাঠের এই অংশের জমির

উপরের ঘাসগুলো কত বেশি নেতিয়ে পড়েছে। কেবল তাই নয়, ভারী-ভারী পায়ের চাপে অনেক ঘাসই কাল মাটির উপরে একেবারে শুয়ে পড়েছিল, আজও তারা আর খাড়া হয়ে উঠতে পারে নি। কত ঘেসো ফুল একেবারে পিষে ম'রে গিয়েছে সেটাও দেখতে পাচ্ছেন কি? অথচ একটু এপাশে আর ওপাশে ঘুরে এসে দেখুন, সেখানকার ঘাসগুলো কেমন সজীব ও সতেজভাবে খাড়া হয়ে হাওয়ায় দুলছে, তাদের একটা ফুলও খ'সে পড়ে নি।"

সুন্দরবাবু লজ্জিত-কণ্ঠে বললেন, "তাই তো, সত্যিই তো। এ-সব তো আমারও লক্ষ্য করা উচিত ছিল।"

মাঠের জমির ঘাস যেখানে নিস্তেজ বা ফুল ঝরিয়ে মাটির উপরে শুয়ে পড়েছে সেইখান দিয়ে সকলে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। জয়ন্তের কথায় সুন্দরবাবু সশস্ত্র পুলিস-বাহিনীকেও পিছনে পিছনে আসবার জন্যে ইশারা করলেন।

পঞ্চম

ভিজে আর শুকনো পায়ের দাগ

মাঠের প্রান্তে ছিল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত নিবিড় এক অরণ্য। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল দিক্‌চক্রবাল-রেখাকে আচ্ছন্ন ক'রে সেই অরণ্যের উপরে পাহারা দিচ্ছে বিপুলদেহ বনস্পতির দল। এক-একটি বৃক্ষ আবার তাল-নারিকেল-কুঞ্জেরও মাথা ছাড়িয়ে আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে পত্রবহুল অসংখ্য বাহুর দ্বারা যেন বন্দী করবার জন্যে শূন্যতাকেই।

সকলে যখন সেই মাঠের প্রান্তদেশে গিয়ে দাঁড়াল, তখন দেখা গেল সেখানে এমন একটি মেটে পথের রেখা রয়েছে, যার উপরে তৃণদের শ্যামল আবরণ আর নেই।

অরণ্যের বক্ষ ভেদ ক'রে সোজা চলে গিয়েছে সেই পথের রেখা।

কুমার বললে, "বাঃ, পায়ের দাগগুলো এইবারে খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একজন নয়, দু'জন নয়, পথের দু'দিক জুড়ে অগুন্তি লোকের পায়ের দাগ!"

সুন্দরবাবু বললেন, "বাঁচা গেল বাবা, বাঁচা গেল! শুয়ে-পড়া মরা ঘাস আর ঝরা ঘেসো-ফুল দেখে আসামীদের পিছু নেওয়া কি চাট্টি-খানেক কথা? এতক্ষণ আমার সন্দেহ হচ্ছিল, ভাবছিলুম জয়ন্ত আমাদের ধাপ্পা মারছে। কিন্তু আর সন্দেহ করবার কোন উপায়ই নেই, এই পায়ের দাগগুলো নিশ্চয়ই আমাদের যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। চল, অগ্রসর হও!"

মানিক মুখ টিপে হেসে বললে, "ঘাসের উপরে সূক্ষ্ম প্রমাণ দেখে সুন্দরবাবু যে খুশি হচ্ছিলেন না, সেটা আমি অনেকক্ষণ ধরে টের পাচ্ছিলুম। তা খুশি হবেন কেমন ক'রে? মোটা দেহ আর মোটা বুদ্ধি দিয়ে ভগবান এমন অনেক জীবকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, মোটা প্রমাণ না পেলে যারা মোটামুটি কিছুই বুঝতে পারে না।"

সুন্দরবাবু তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে বললেন, "তুমি জানো মানিক, আমরা চলেছি এখন দস্যু-বাহিনীর সঙ্গে জীবন পণ ক'রে যুদ্ধ করতে? এই কি হালকা আর পলকা ঠাট্টা করবার সময়? তোমার স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান নেই?"

মানিক আবার সকৌতুকে ভুরু নাচিয়ে সুন্দরবাবুকে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে মুখ খোলবার আগেই বিমল তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "চলুন, চলুন! এখানে দাঁড়িয়ে এখন কথা-কাটাকাটি করবার সময় নেই। শিগগির এগিয়ে চলুন!"

আবার সবাই হ'ল অগ্রসর। পথের দুই-ধারে ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষের দল এমন ভাবে দুই দিক থেকে শাখা-বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যে, উপরদিকে তাকালে দেখা যায় না আর সমুজ্জ্বল নীলাকাশকে—দেখা যায় কেবল ছায়া-ভরা মর্মরিত সবুজ পত্রদের চন্দ্রাতপ।

লাঙ্গুলকে পতাকার মতন উর্ধ্বে তুলে সর্বাগ্রে সগর্বে এগিয়ে যাচ্ছিল বাঘা এবং তারপরেই জয়ন্ত। সে বললে, "সবাই চটপট পা চালিয়ে দিন! এখনো দিনের আলো আছে, এখনো বনের ভিতরে নজর চলছে। অন্ধকারে অন্ধ হবার আগেই আমাদের অবলাকান্তের আস্তানায় গিয়ে হাজির হ'তে হবে।"

প্রায় মিনিট-পনেরো ধ'রে সবাই এগিয়ে চলল দ্রুতপদে।

হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে জয়ন্ত বললে, "দেখুন বিমলবাবু, দেখুন! পায়ের দাগগুলো এইখানে মোড় ফিরে আরো সরু একটা পথ দিয়ে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে!" তারপর হেঁট হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে বিপুল বিস্ময়ে সে ব'লে উঠল, "কিন্তু একি ব্যাপার, এ কী?"

বিমলও মাটির দিকে হেঁট হয়ে ভাল ক'রে দেখে বললে, "ব্যাপার কি জয়ন্তবাবু? যে পায়ের দাগগুলো বাঁ-দিকের ঐ সরু পথের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে, সেগুলোকে মাড়িয়ে আরো অসংখ্য পায়ের দাগ আবার বেরিয়ে এসেছে বাইরের দিকে!"

কুমার বললে, "পদচিহ্নগুলো বাইরের দিকে বেরিয়ে এসে বাঁদিকে—অর্থাৎ আমরা যে পথের উপরে দাঁড়িয়ে আছি এই পথ ধ'রেই সোজা চলে গিয়েছে! এরই বা মানে কি?"

সুন্দরবাবু বললেন, "ধেৎ, মানে আবার কি? ডাকাত-ব্যাটারা কাল কোন কারণে একবার ঐ বাঁ-দিকের পথ ধ'রে জঙ্গলের ভিতরে গিয়েছিল, তারপর আবার বেরিয়ে এসে আমরা যে বড় পথের উপরে দাঁড়িয়ে আছি সেইটে ধ'রেই আবার এগিয়ে গিয়েছে নিজেদের আড্ডার দিকে।"

জয়ন্ত নীরবে সেইখানে হাঁটু-গেড়ে মাটির উপরে বসে পড়ল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে একবার এদিকে আর একবার ওদিকে গিয়ে বললে, "সুন্দরবাবু, আপনি যা ভাবছেন, সেটা ঠিক নয়!"

—"কেন, বেঠিকটা কোন্‌খানে?"

—"ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন। আমরা এতক্ষণ যে পায়ের দাগগুলো

দেখে এগিয়ে আসছিলুম, আর যেগুলো মোড় ফিরে ঐ বাঁ-দিকের সরু পথের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে, তাদের অনেকগুলোই ভিজে মাটির ভিতরে চেপে বসে গিয়েছে। এখানে রোদ আসে না ব'লে ঐ-সব পদচিহ্নের উপর থেকে এখনো বৃষ্টির জল শুকিয়ে যায় নি। দেখুন, এক-একটা পদ-চিহ্ন কত গভীর ভাবে মাটির ভিতরে বসে গিয়েছে—এর মানে হচ্ছে, এগুলো হৃষ্টপুষ্ট সুবৃহৎ দেহের পায়ের দাগ। এগুলোর মধ্যে এখনো কিছু-কিছু বৃষ্টির জল জমে আছে। কিন্তু যে পায়ের দাগগুলো বাঁ-দিকের ঐ সরু পথটার ভিতর থেকে আবার বাইরে বেরিয়ে এসে এই বড় পথটা ধ'রে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে জলের কোন চিহ্নই নেই। এথেকে আমাদের কি বুঝতে হবে বলুন দেখি ?"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! বুঝতে হবে ঘোড়ার ডিম! শুকনো আর ভিজে পায়ের দাগ—খালি হেঁয়ালি, খালি হেঁয়ালি!"

বিমল বললে, "সুন্দরবাবু, হেঁয়ালি বোঝাই হচ্ছে গোয়েন্দার ব্যবসা। যদি অপরাধ না নেন তো, ব্যাপারটা কি হয়েছে আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।"

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বললেন, "হাতি গেল, ঘোড়া গেল, ভেড়া বলে কত জল! আমি হচ্ছি পুরানো পুলিসের লোক, আর আপনি পুলিসও নন, জয়ন্তের মতন শখের গোয়েন্দাও নন, আপনি আবার আমাকে কী বোঝাতে চান ?"

বিমল হাসতে-হাসতে শান্ত স্বরেই বললে, "না সুন্দরবাবু, আপনার কাছে আমি কিছুই নই! আপনার মতন মাতঙ্গের কাছে আমি হচ্ছি সামান্য একটা পতঙ্গ মাত্র! তবে কি জানেন, মুনিরও মতিভ্রম হয়।"

সুন্দরবাবু আরো রেগে গিয়ে বললেন, "আমার মতিভ্রমটা হ'ল কোথায়, সেইটেই আমি জানতে চাই ?"

—"চেয়ে দেখুন সুন্দরবাবু। এতক্ষণ আমরা যে পায়ের দাগগুলো অনুসরণ করছিলুম, তাদের অনেকগুলোর ভিতরে যে বৃষ্টির জল জমে আছে, জয়ন্তবাবু তো সেটা এখনি আমাদের দেখিয়ে দিলেন। এর অর্থ

কি তাও আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কাল বৃষ্টির ভিতর দিয়ে ডাকাতের দল এই পথ ধ'রে এগিয়ে এসেছিল, তারপর তারা ঢুকেছিল বাঁ-দিকের পথ ধ'রে ঐ জঙ্গলের ভিতরে। কিন্তু তখনো বৃষ্টি পড়ছিল, তাই ঐ পদ-চিহ্নগুলোর উপরে এখনো অল্প-বিস্তর বৃষ্টির জল জমে আছে। কিন্তু যে পদচিহ্নগুলো ঐ বাঁ-দিকের ছোট পথ ধ'রে বাইরে বেরিয়ে এসে আবার এই বড় পথ ধ'রেই আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, সেগুলো হচ্ছে একেবারে শুকনো। এখানকার মাটি ভিজে, তাই এই ভিজে মাটির উপরে পদচিহ্ন পড়েছে বটে, কিন্তু আমাদের এই সামনের দিকের পদ-চিহ্নগুলোর কোনটার ভিতরেই যখন বৃষ্টির জল জমে নেই, তখন বুঝতে হবে যে, এই পদচিহ্নগুলোর উৎপত্তি হয়েছে, বৃষ্টি থেমে যাবার পরেই।"

সুন্দরবাবু বললেন, "বেশ তো, তাতে হয়েছে কি?"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "বাঁ-দিকের ঐ সরু পথের ভিতর দিয়ে এই যে অসংখ্য শুকনো পদচিহ্ন আবার বাইরে এসে বড় পথটা ধ'রেই সোজা এগিয়ে গিয়েছে, সেগুলোর প্রত্যেকটাই কত গভীর ভাবে মাটির ভিতরে বসে গিয়েছে সেটাও দেখতে পাচ্ছেন কি?"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম, গেলই বা মাটির ভিতরে গভীরভাবে বসে, তা নিয়ে আমাদের এতটা মাথা-ব্যথা হবার কারণ কি?"

জয়ন্ত বিরক্ত-কণ্ঠে বললে, "কারণ কি জানেন? এই নতুন শুকনো পায়ের দাগগুলো হচ্ছে এমন একদল লোকের, যারা ঐ জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রাণপণ বেগে ছুটে আবার এই বড় পথ ধ'রে এগিয়ে গিয়েছে। মানুষ যখন খুব বেগে ছোটে তখন প্রত্যেক পদেই তাকে লাফ মারতে হয়। আর সেইজন্যেই তখন তার পদচিহ্ন গভীরভাবে বসে যায় ভিজে মাটির ভিতরে।"

—"হুম! তোমাদের এই আবিষ্কারে নতুনত্ব আছে। তারপর?"

এইবারে জয়ন্তের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল রীতিমত ক্রুদ্ধ। সে বললে, "সুন্দরবাবু, আপনি বোঝালেও যদি না বোঝেন, তাহলে আমাদের হার মানতে হয়! আপনাকে বোঝাবার জন্যে আমরা এখানে আসি নি,

আমরা এসেছি এক দুর্ধর্ষ দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করতে। এখানকার মাটি ভিজে না হলে আমরাও কিছুই বুঝতে পারতুম না, কারণ তাহলে সামনের দিকের এই নতুন পদচিহ্নগুলো আমাদের কারুরই চোখে পড়ত না। কিন্তু মাটি ভিজে বলেই আন্দাজ করতে পারছি যে, একদল লোক অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এখান থেকে ছুটে চলে গিয়েছে। তাদের এতটা তাড়াতাড়ির কারণ কি? নিশ্চয়ই তারা কোন-কিছু বিভীষিকা দেখেছে। কী সেই বিভীষিকা?"

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ হতভম্ব হয়ে বাঁ-হাতে টুপি খুলে ডান-হাতে মাথা

চুলকোতে লাগলেন নীরবে।

কুমার বললে, "বিভীষিকা হচ্ছি আমরা! নতুন ঐ পায়ের দাগগুলো যখন সজল নয় তখন খুব সম্ভব ওগুলোর সৃষ্টি হয়েছে আজকে— হয়তো একটু আগেই!"

মানিক বললে, "ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আমরা যে সদলবলে

এই বনের ভিতরে এসে ঢুকেছি, ডাকাতরা সেটা আগেই টের পেয়েছে! তারা তাই ঐ বাঁ-দিকের সরু পথ দিয়েই আবার বেরিয়ে এই বড় পথটা ধরে ছুটে চম্পট দিয়েছে।"

সুন্দরবাবু ভেঙেও মচকাবার পাত্র নন। বললেন, "চম্পট দিয়ে যাবে কোথায়? তাদের পায়ের দাগগুলো তো এখনো ঐ মাটির উপরেই আঁকা আছে? তারা কালকেই পালাক আর আজকেই পালাক, দাগগুলো তো তারা আর মুছে দিয়ে যেতে পারে নি! সুতরাং তোমাদের এ-সব গবেষণার কোন অর্থই হয় না। চল, আমরা এই শুকনো পায়ের দাগগুলো ধরেই সামনের দিকে এগিয়ে যাই।"

মানিক বললে, "সুন্দরবাবু, আপনি হচ্ছেন অসম্ভব মানুষ! যুক্তির দ্বারা আপনাকে দমাতে পারে এমন পাষণ্ড বোধহয় ত্রিভুবনে জন্মগ্রহণ করে নি! দাদা, একবার পায়ের ধুলো দিন!"

সুন্দরবাবু হেসে ফেলে বললেন, "মানিক হে, তুমিই আমাকে চিনতে পেরেছ! যাক, আজ আর তোমার কথায় রাগ করব না!"

মানিক বললে, "ধন্যবাদ!"

জয়ন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "বাজে কথায় সময় কাটাবার সময় নেই। আমরা যতক্ষণ এইখানে দাঁড়িয়ে কথা-কাটাকাটি করব, ততক্ষণে ডাকাতরা আরো—আরো দূরে গিয়ে পড়বে! পায়ের দাগ অত্যন্ত স্পষ্ট—এই দাগ দেখেই আমাদের এখন ছুটে এগিয়ে যেতে হবে!"

সর্বাগ্রে বাঘাই যেন বুঝতে পারলে জয়ন্তের কথা। ঘন-ঘন ল্যাজ নাচিয়ে সামনের দিকে মারলে সে এক লম্বা দৌড়।

ষষ্ঠ

খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগের যুদ্ধ-কৌশল

দু'ধারে প্রায় যেন নিরেট জঙ্গলের প্রাচীর, তারই মাঝখান দিয়ে সোজা চলে গিয়েছে তাজা পায়ের-দাগ-আঁকা সেই পথটা।

বিমল ও জয়ন্ত প্রভৃতি প্রায় মিনিট-দশ ধরে অগ্রসর হয়েও দেখলে, সেখানকার কাঁচা মাটি তখনো পদচিহ্নগুলোর ছাঁচ তুলেছে তেমনি গভীর রূপেই। বোঝা গেল ডাকাতরা এতদূর এগিয়েও তাদের দ্রুতগতি বন্ধ করে নি।

সুন্দরবাবু ফোঁস ফোঁস ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "বাপ-রে, আমার এই দেহ নিয়ে এত দৌড়োদৌড়ি কি পোষায় বাবা?"

মানিক ছুটতে ছুটতেই চোখ মটকে বললে, "কেন পোষাবে না মশাই? আপনি তো হাতির ছোট্ট সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নন। হাতিরা যে তাদের অমন ভারী আর বিরাট দেহ নিয়ে বিলক্ষণ ছোটা-ছুটি করতে পারে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "মানিক, এইবারে তুমি ঠকলে! যখন-তখন তুমি আমাকে হাতি ব'লে গালাগাল দাও। আজ তোমার নিজের কথাতেই প্রমাণ হয়ে গেল যে, আমি মোটেই হাতি নই। কারণ হাতি হলে আমিও খুব ছোটাছুটি করতে পারতুম।"

জয়ন্ত হঠাৎ চেঁচিয়ে বললে, "সবাই দাঁড়িয়ে পড়ুন! পায়ের দাগ-গুলো আর সামনের দিকে এগোয় নি, এখান থেকেই বেঁকে ডান-পাশের ঐ জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। এখন আমাদের কি করা উচিত বিমলবাবু? চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, একটু পরেই আমাদের চোখও অন্ধ হয়ে যাবে।"

বিমলের জবাব দেওয়ার আগেই আচম্বিতে অরণ্য কাঁপিয়ে কোথা থেকে গর্জন ক'রে উঠল কয়েকটা বন্দুক! সকলকার মাথার উপর দিয়ে কতকগুলো বুলেটও যে সশব্দে বাতাস কেটে ছুটে চলে গেল, তা বুঝতেও কারুর দেরি হ'ল না!

জয়ন্ত আবার চিৎকার ক'রে বললে, "ঐ ডান-পাশের বনের ভিতর থেকে গুলি ছুটে আসছে! আমাদের বধ করবার জন্যে ডাকাতরা এই-খানে ফাঁদ পেতে রেখেছে!" সবাই ডান-পাশের বনের দিক মুখ ক'রে মাটির উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন। তারপর হতভাগাদের বুঝিয়ে দিন যে, আমাদেরও বন্দুকের অভাব নেই!"

বিমল তাড়াতাড়ি বললে, "কুমার, জয়ন্তবাবু, মানিকবাবু, আসুন আমরা চারজনে মাটির উপরে হামাগুড়ি দিয়ে এই পথটা ধরেই সোজা এগিয়ে যাই!"

মানিক সবিস্ময়ে বললে, "কেন বিমলবাবু? ওদিকে তো ডাকাতদের পায়ের দাগ নেই. ও-দিকে গিয়ে আমরা কি করব?"

বিমল বললে, "এখন কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। কেবল জেনে রাখুন, আমার মাথায় একটা ফন্দি এসেছে।"

বিমল, জয়ন্ত, কুমার ও মানিক একসঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে সেই পদ-চিহ্নহীন পথ ধরে যতটা সম্ভব দ্রুতবেগে অগ্রসর হ'ল।

সুন্দরবাবু তাদের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে বললেন, "হুম। বিপদ দেখে কাপুরুষের মতন পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে? তোমরাই আবার 'এ্যাড্-ভেঞ্চার' চাও? গোয়েন্দাগিরি করতে চাও? আরে ছোঃ!"

বিমল, জয়ন্ত ও কুমার হাসতে লাগল, কিন্তু দুষ্টু মানিক সেইভাবে যেতে যেতেই পিছনদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, "জয়, বীরপুরুষ সুন্দর-বাবুর জয়! আপনার মতন বীরপুরুষের কাছে আমাদের মতন কাপুরুষ-দের থাকা উচিত নয় ব'লেই তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়ছি!"

সুন্দরবাবু বোধ করি কি-একটা খুব কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তখনি ও দিক থেকে তেড়ে এল আর এক-ঝাঁক উত্তপ্ত বুলেট।

একটা বুলেট তাঁর মাথা বাঁচিয়েও টুপির উপর দিকটা ছ্যাঁদা ক'রে বেরিয়ে গেল। দুই চক্ষে অগণ্য সর্ষেফুল দেখে এবং 'বাপ' ব'লে চিৎকার ক'রে তিনি তখনি লম্বা হয়ে মাটির উপরে শুয়ে পড়লেন। তারপর বিপুল ক্রোধে চিৎকার ক'রে বললেন, "এই সেপাই! চালাও গুলি, চালাও গুলি! শূয়োরের বাচ্চাদের বুঝিয়ে দাও, আমাদের কাছে ওদের চেয়ে ঢের বেশি বন্দুক আছে!"

সেপাইরা তাঁর আগেই বুদ্ধিমানের মতন ভূমির উপরে লম্বমান হয়েছিল। তারাও অদৃশ্য শত্রুদের উদ্দেশে বারংবার বন্দুক ছুঁড়তে শুরু করলে।

দুই পক্ষের বন্দুকের চিৎকারে সেই বনভূমির শান্তিপূর্ণ আবহ যখন ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত ও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মানিক তখন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে বেশ খানিকটা।

হঠাৎ বিমল লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "ব্যাস, আর আমাদের চতুষ্পদ জন্তুর মতন পথ চলতে হবে না! শত্রুদের গুলিগুলো ছুটোছুটি করছে এখান থেকে অনেকদূরে। এইবারে আমরাও দুই পদে নির্ভর করে দাঁড়িয়ে দু-একটা কথা কইতে পারি।"

জয়ন্ত উঠে বিমলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললে, "এতক্ষণে আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি।"

বিমলও সহাস্যে বললে, "কি বুঝতে পেরেছেন বলুন না!"

—"এইবারে আপনি এই ডানদিকের বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে চান, তাই নয় কি?"

—"ঠিক! তারপর?"

—"ডানদিকের এই বনের ভিতরে ঢুকে আমরা যদি সোজাসুজি খানিকটা এগিয়ে যাই, তাহলে হয় শত্রুদের পিছনে নয় পাশে গিয়ে পড়তে পারব।"

—"তারপর?"

—আমরা যে এইভাবে লুকিয়ে তাদের পিছনে বা পাশের দিকে

এসে হাজির হয়েছি, শত্রুরা নিশ্চয়ই সে-সন্দেহ করতে পারবে না। ইতিহাসে পড়েছি, এই রকমই একটা উপায়ে গ্রীসের আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট্ নাকি ভারতের মহারাজা পুরুকে কাবু ক'রে ফেলেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে আপনি সেই খ্রীষ্ট-পূর্বযুগের যুদ্ধ-কৌশলকে কাজে লাগাতে চান।"

—"কিন্তু এটা যুদ্ধ নয় জয়ন্তবাবু, এটা হচ্ছে তুচ্ছ দাঙ্গারই সামিল।"

—"খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগের যুদ্ধের বর্ণনা পড়লে কি মনে হয় জানেন বিমলবাবু?"

—"কি মনে হয়, বলুন।"

—"এই আণবিক বোমার যুগে পৃথিবীতে যে-সব দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগের যুদ্ধ ছিল তারও চেয়ে তুচ্ছ।"

—"কিন্তু এ-যুগের বড়-বড় যুদ্ধেও প্রকাশ পায় কেবল তথাকথিত যোদ্ধাদের কাপুরুষতা। শত্রুদের দেখতে পায় না, তবু গর্তের ভিতরে লুকিয়ে এ-যুগের যোদ্ধারা ছোঁড়ে খালি বন্দুকের পর বন্দুক—লড়াই ক'রে যেন তারা বাতাসের সঙ্গে। কিংবা বিমানপোত নিয়ে তারা শূন্যে ওড়ে বিপদের সীমানা ছাড়িয়ে, তারপর অশ্রুতপূর্ব নিষ্ঠুরতা আর কাপুরুষতার প্রমাণ দেবার জন্যে অসামরিক, নির্দোষ, আবালবৃদ্ধ-বনিতার উপরে আণবিক বোমা নিক্ষেপ ক'রে, লক্ষ লক্ষ মানুষ যেখানে বাস করে এমন এক বৃহৎ নগর-কে-নগরকেই পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত ক'রে দেয়। কিংবা তারা ডুবোজাহাজ নিয়ে সমুদ্রের তলায় ডুব মেরে সামরিক হোক আর অসামরিক হোক যে-কোন জাহাজকেই গুপ্ত উপায়ে অতলে তলিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ নরহত্যা করে। কিন্তু সেকালের যুদ্ধে প্রকাশ পেত মানুষের বীরত্ব আর রণকৌশল। তখনকার যোদ্ধাদের লড়াই করতে হ'ত শত্রুদের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, যার শক্তি আর নিপুণতা বেশি, জয়ী হ'ত সেই-ই। এই মধ্যযুগের মহাবীর তৈমুরলংয়ের জীবনচরিত পড়েছেন?"

—"না, কিন্তু বিমলবাবু, এখন—"

বিমল বাধা দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "তৈমুরলং গিয়েছেন, এক মস্ত-বড় রাজার দুর্ভেদ্য কেল্লা দখল করতে। দুই পক্ষেই সৈন্য-সামন্তের সংখ্যা নেই।—বিশেষত তৈমুরের সঙ্গে ছিল এমন-এক বিপুল বাহিনী, সে-যুগের রুশিয়াকে পর্যন্ত যে বাহিনীর মহাবীরেরা অনায়াসেই পায়ের তলায় নত করতে পেরেছিল—উনিশ শতকের নেপোলিয়ন বা বিশ শতকের হিটলার পর্যন্ত যা করতে পারে নি। তবু তৈমুর তাঁর অপরাজেয় বাহিনীর উপর নির্ভর করলেন না, ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে নির্ভয়ে এগিয়ে চললেন বিপক্ষের দুর্গ-তোরণের দিকে। তাঁর সেনাপতিরা সভয়ে তাঁকে বাধা দিয়ে অনুরোধ-উপরোধ করতে লাগলেন, 'সুলতান, আমরা যখন এখানে রয়েছি, তখন আমাদের পিছনে রেখে আপনি কেন এগিয়ে যাচ্ছেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে? আপনার যদি কিছু হয়, তাহলে আমরা থাকব কোথায়?' তৈমুর তরবারি কোষমুক্ত ক'রে শূন্যে বিদ্যুৎ নাচিয়ে বললেন, 'তোমরা সরে দাঁড়াও আমার সুমুখ থেকে! যে আমাকে বাধা দেবে তাকেই আমি হত্যা করব।' তৈমুরের চক্ষে কঠিন প্রতিজ্ঞার ইঙ্গিত দেখে সেনাপতিরা ভীত ভাবে তাঁর নাগালের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর তৈমুরের ঘোড়া মাটির উপরে ক্ষুরের আঘাতে ধূলি উড়িয়ে সিধে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল বিপক্ষদের দুর্গ-তোরণের সামনে। দুর্গ-প্রাকারের উপরে নানান-রকম নিষ্ঠুর অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল হাজার হাজার শত্রুসৈন্য। একাল হলে তারা নিশ্চয়ই সেই মুহূর্তে তৈমুরকে বধ করত। কিন্তু তারা তা করলে না, নির্বাক বিস্ময়ে তৈমুরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিস্পন্দ মূর্তির মতো। দুর্গ-তোরণের সামনে গিয়ে তৈমুর ঊর্ধ্বমুখে চিৎকার ক'রে বললেন, 'যুদ্ধ এখনি হতে পারে, আর যুদ্ধ হলে দুই পক্ষের অনেক মানুষের প্রাণও যাবে। শেষ পর্যন্ত আমি যে এই কেল্লা ফতে করব সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই! কিন্তু অত-বেশি গোলমালে দরকার কি? এই দুর্গ-তোরণ দিয়ে বেরিয়ে আসতে বল তোমাদের নায়ককে—আমি এখানে একলা এসেছি, সেও এখানে থাকবে একলাই। লড়াই করুক সে কেবল আমার সঙ্গে। যে

হারবে, তার পক্ষকে সেই পরাজয়কেই সকলের পরাজয় ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে হবে!' ...জয়ন্তবাবু, আমি একেই বলি বীরত্ব—একালের যুদ্ধ যে-বীরত্বকে স্বীকার করে না।"

জয়ন্ত বললে, "বিমলবাবু, আপনি চমৎকার প্রসঙ্গ তুলেছেন। কিন্তু আজ এইখানেই এ-প্রসঙ্গ ধামা-চাপা দেওয়াই নিরাপদ! ও-দিকে ঘন ঘন বন্দুকের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন না?"

উত্তেজিত হয়ে বিমল সত্য-সত্যই স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গিয়েছিল। জয়ন্ত আজকের কথা মনে করিয়ে দিতেই সে অত্যন্ত লজ্জিত স্বরে বললে, "মাপ করবেন জয়ন্তবাবু, মাপ করবেন! ছেলেমানুষের মতন আমি গাইছিলুম ধান ভাঙতে শিবের গীত! ছিঃ ছিঃ, আমাকে ধিক্!"

জয়ন্ত বললে, "এখন নিজেকে ধিক্কৃত করবারও সময় নয়। আপনারই নির্দেশে আমরা এদিকে এসেছি। এখন কি করতে হবে বলুন?"

বিমল তৎক্ষণাৎ অতি-জাগ্রত হয়ে ডান-দিকের জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে এগুতে এগুতে বললে, "আসুন আমার সঙ্গে! আগে খানিকটা এগিয়ে দেখি, তারপরই বুঝতে পারব আমার অনুমান সত্য কিনা।"

সেখানে জঙ্গলের ভিতরে পথ ব'লে কোন-কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। ঝোপ-ঝাপ সরিয়ে, কাঁটাগাছে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে, কখনো দাঁড়িয়ে কখনো-বা হামাগুড়ি দিয়ে তারা অগ্রসর হতে লাগল কোনরকমে। ও-দিকে তখনো দুইপক্ষের বন্দুক দুই-পক্ষের শত্রুদের দিচ্ছিল অবিশ্রান্ত ভাবে প্রচণ্ড ধমকের পর ধমক!

অবশেষে তারা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়াল, যার পরেই আছে সাত-আট-হাত গভীর এবং সাত-আট-হাত চওড়া একটা সুদীর্ঘ খানা। গতকল্যকার বৃষ্টি খানার তলায় জমিয়ে রেখেছে হাত-দেড়েক গভীর জল।

বাঘা তাদের সঙ্গ ছাড়ে নি। খানার ভিতরে লাফিয়ে পড়ল সে সর্বাগ্রে। তারপরেই বিমল খানার ভিতরে গিয়ে অবতীর্ণ হ'ল। এক-দিকে তাকিয়ে সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল মিনিটতিনেক। তারপর মুখ

ফিরিয়ে বাকি সবাইকেও খানার ভিতরে নামবার জন্যে হাত নেড়ে ইশারা করলে।

জয়ন্ত, কুমার ও মানিকও খানার ভিতরে গিয়ে নামল। তারপর বিমলের ইঙ্গিতে একদিকে তাকিয়ে যা দেখলে, তা হচ্ছে এই :

খানাটা লম্বালম্বি অনেকদূর অগ্রসর হয়ে হারিয়ে গিয়েছে কোথায়, আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে। খানার দুই তীরেই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বড়-বড় গাছের পর গাছ। তাদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা তফাতে সেই-সব গাছের উপরে ঘন-ঘন বন্দুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্বলে জ্বলে উঠছিল অগ্নিশিখার পর অগ্নিশিখা।

খানার ভিতরে বড়-বড় সব আগাছা এখানে-ওখানে তৈরি করেছিল রীতিমত ঝোপঝাপ। বিমলের দেখাদেখি বাকি তিনজনও সেই-রকম এক-একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করলে।

বিমল অনুচ্চ স্বরে বললে, "ডাকাতরা গাছের উপরে চ'ড়ে পুলিস-বাহিনীর উপরে গুলিবৃষ্টি করছে। ওরা আমাদের বন্দুকের সীমানার মধ্যেই আছে। আমরা চারজনেই 'অটোমেটিক' বন্দুক নিয়ে এসেছি—এগুলো ওদের অস্ত্রের চেয়ে ঢের-বেশি শক্তিশালী আর অল্প সময়ের মধ্যেই অশ্রান্ত ভাবে ঢের-বেশি গুলি-বৃষ্টি করতে পারে। সকলে তৈরি হয়ে থাকো। গাছের উপরের শত্রুদের আমরা দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু ওখানে যখনই বন্দুকের আগুন জ্বলবে তখনি আন্দাজে শত্রুদের উদ্দেশে গুলির পর গুলি চালাও। কেউ একবারও থেমো না, শত্রুরা মনে করুক তাদের পিছনদিক থেকেও অনেক পুলিসের লোক আক্রমণ করতে এসেছে।"

মিনিট-খানেক পরই 'অটোমেটিক' বন্দুকগুলো শত্রুদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল ভয়াবহ ও অশ্রান্ত আগ্নেয় ভাষায়।

উপরি-উপরি জেগে উঠল কয়েকটা বিকট আর্তনাদ। 'অটোমেটিক' বন্দুকদের বুলেট তাহলে অদৃশ্য শত্রুদেরও সন্ধান পেয়েছে।

বিমল উৎসাহ-ভরে ব'লে উঠল, "চালাও, আরো তাড়াতাড়ি গুলি

চালাও! ওরা ভেবে নিক দলে আমরা দস্তুরমত ভারী।"

বিমল, জয়ন্ত, কুমার ও মানিক মহা উৎসাহে বন্দুক ছুঁড়তে আরম্ভ করলে। তাদের আধুনিক বন্দুকগুলো ধূম্র উদ্গীরণ করছিল না, সুতরাং এই নতুন আক্রমণকারীরা যে কোথায় অবস্থান করছে ডাকাতরা সেটাও আন্দাজ করতে পারলে না।

মিনিট তিন-চার পরেই গাছের উপরকার সমস্ত বন্দুক একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। খুব সম্ভব, দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে ডাকাতরা গাছের উপর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে প'ড়ে যে-যেদিকে পারলে পলায়ন করলে।

বিমলরাও আর বন্দুক ছুঁড়লে না। সেইখানে চুপ ক'রে বসে রইল প্রায় দশ মিনিট। তখনো দূর থেকে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল পুলিসের বন্দুকগুলোর শব্দ। তারপর পুলিসদের বন্দুকও হয়ে গেল বোবা।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনো সেখানে রীতিমত ঘনীভূত হয় নি বটে, কিন্তু আট-দশ হাত দূরে চোখ আর চলছিল না। আট-দশ হাত ভিতরেও যা দেখা যাচ্ছে সবই ঝাপসা ঝাপসা। মাথার উপরে আকাশের বুকে মাঝে মাঝে তখনও একটু-আধটু আলোর আভাস দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু সে আলো দূর করতে পারছিল না পৃথিবীর আসন্ন অন্ধতাকে।

জয়ন্ত বললে, "শত্রুরা পালিয়েছে। বিমলবাবু, এখন আমাদের কি করা উচিত?"

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আসুন, এই নোংরা ঘোলা জল ছেড়ে আপাততঃ আমরা খানার উপরে গিয়ে ওঠবারই চেষ্টা করি।"

যেদিক থেকে সকলে এসেছিল তারা আবার খানার সেই তীরে গিয়েই উঠল।

জয়ন্ত বললে, "আর এখানে থেকে লাভ কি? আজ আর ডাকাতদের ধরা অসম্ভব। এখন বোধহয় যেখান থেকে এসেছি সেইখানেই গিয়েই দেখা উচিত, সুন্দরবাবু কতখানি বীরত্ব প্রকাশ করছেন।"

বিমল বললে, "ঠিক বলেছেন। আজ আমাদের কাদা ঘেঁটে মরাই সার হ'ল! চলুন, আমরা যেখানকার মানুষ সেইখানেই ফিরে যাই।"

সকলে যে অপথ বা বিপথ দিয়ে এসেছে, ঘন জঙ্গল ভেদ ক'রে কখনো দাঁড়িয়ে এবং কখনো বা হামাগুড়ি দিয়ে আবার সেই দিকেই চলতে লাগল।

তারা মিনিট-তিনেক এইভাবে অগ্রসর হবার পর আচম্বিতে ঘটল এক অভাবিত ঘটনা। অন্ধকার ভেদ ক'রে আবির্ভূত হ'ল দলে দলে অস্পষ্ট সব যমদূতের মতন মূর্তি এবং তারা কেউ কিছু বোঝবার আগেই সেই মূর্তিগুলো তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিপুল বিক্রমে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই তাদের নিষ্ঠুর বাহুবন্ধনে বন্দী হ'ল বিমল ও জয়ন্ত, কুমার ও মানিক। বিমলরা কেউ একখানা হাত পর্যন্ত তোলবার সুযোগ পেলে না।

তারপরেই খনখনে নারী-কণ্ঠে জেগে উঠল সেই সুপরিচিত তীক্ষ্ণ অট্টহাসি। খিলখিল খিলখিল করে অট্টহাসি হাসতে হাসতে হঠাৎ একটা তীব্র কণ্ঠস্বর বললে, "আজ আমার অনেকদিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল হ'ল। আজ গ্রেপ্তার করেছি একসঙ্গে চারজনকে। আজ আমার সমস্ত বুক নেচে উঠছে উৎকট আনন্দে। কি হে বিমল-গাধা, কি হে জয়ন্ত-ছুঁচো, আমি কে তা বুঝতে পারছ?"

বিমল শান্তকণ্ঠে বললে, "বিশ্রী অবলাকান্ত, তোমার গলা শুনলে কালা ছাড়া সবাই তোমাকে চিনতে পারবে।"

অবলাকান্ত আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বললে, "হ্যাঁ রে গাধা, ঠিক তাই। আমার বাইরে এক রূপ, ভিতরে আর এক রূপ। ভগবান জানতেন দুনিয়ায় এসে আমি কি করব, তাই আমার ভিতরের রূপ ঢাকবার জন্যে আমি পেয়েছি নারীর কণ্ঠস্বর আর মেয়েলি একটা নাম—অবলাকান্ত। কিন্তু আসলে আমার কি নাম হওয়া উচিত তা জানিস? প্রবলাকান্ত।"

জয়ন্ত বললে, "তোমার বক্তৃতা তুমি তোমার চ্যালা-চামুণ্ডাদের শুনিও। এখন আমাদের নিয়ে কি করতে চাও, তাই বল।"

—"কি করতে চাই? তোদের নিয়ে কি করতে চাই? দুনিয়ার খাতা

থেকে তোদের নাম একেবারে মুছে দিতে চাই।"

—"সেটা তো অনেকদিন ধ'রেই করতে চাইছ! কিন্তু পেরেছ কি?"

—"পারব, এবারে ঠিক পারব। এখনি আমার বাসনা চরিতার্থ করতে পারি, কিন্তু আমার আবার কেমন একটা বদ-রোগ আছে জানিস তো? আমি নরবলি দিতে চাই নতুন পদ্ধতিতে।"

—"পদ্ধতিটা কি, শুনতে পাই না?"

—"শুনবি কি, একেবারে হাড়ে হাড়ে টের পাবি। পদ্ধতিটা যে কি আমি নিজেই তা এখনো জানি না, পরে ভেবে-চিন্তে বুদ্ধি খাটিয়ে স্থির করব। কিন্তু এটা ভাল ক'রেই মনে ক'রে রাখিস, এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে তোদের আমি পরলোকে পাঠিয়ে দেবই দেব।"

—"বেশ, আমরা তাহলে এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছি।"

আবার অট্টহাস্য ক'রে অবলাকান্ত বললে, "হ্যাঁ, এখন থেকে ইষ্টমন্ত্র জপ ক'রতে শুরু ক'রে দে, কারণ পরলোকে যাত্রা করবার সময় সেই-টেই হবে তোদের একমাত্র পাথেয়।"

ঠিক এই সময়ে যখন অন্যান্য সকলে একমনে এদের কথাবার্তা শুনছিল, কুমার আচম্বিতে এক হ্যাঁচকা মেরে দু'জনের হাত ছাড়িয়ে সামনের দিকের অন্ধকারের ভিতরে বেগে ছুটে যাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু শত্রুদের সকলেই অন্যমনস্ক হয়ে ছিল না, একজন বেগে ছুটে গিয়ে কুমারের মাথার উপরে করলে প্রচণ্ড এক লাঠির আঘাত। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে কুমার তৎক্ষণাৎ ঘুরে মাটির উপর প'ড়ে গিয়ে একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল।

কুমারকে হয়তো এরা হত্যা করলে, এই ভেবেই বিমল একেবারে আত্মহারা হয়ে গেল। সেও এক বিষম টান মেরে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে আঘাতকারীর উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মহা বলিষ্ঠ দুই বাহু সেই বিপুলবপু দস্যুর দেহটাকে অনায়াসে শিশুর মতন মাথার উপরে তুলে নিয়ে মাটির উপরে আছড়ে ফেলে দেবার উপক্রম করলে।

কিন্তু ডাকাতরা দল বেঁধে ছুটে গিয়ে আবার তাকে চারিপাশ থেকে চেপে ধরলে প্রাণপণে। যে ডাকাতটাকে সে ধরেছিল, তিন-চারজন লোক এসে আবার তাকে তার কবল থেকে উদ্ধার করলে।

অবলাকান্ত ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বললে, "মরতে বসেও তোরা চালাকি করবি? ওরে, তোরা হতভাগাদের হাতগুলো পিছমোড়া ক'রে বেঁধে এখুনি এখান থেকে নিয়ে চল। সেইসঙ্গে ওদের চোখগুলোও বাঁধতে ভুলিস নে। বনে পুলিস হানা দিয়েছে, আর এখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়।"

একজন শুধোলে, "কর্তা ওদিকে তো পুলিস আমাদের পথ আগলে আছে, আমরা এখন কোথায় যাব?"

অবলাকান্ত বললে, "কেন, আমরা এখন বানের জলে ভাসছি নাকি? বনের উত্তরদিকে এখান থেকে মাইল-দশ পরে আমবাগানে আমাদের পোড়ো-বাড়ির আড্ডা আছে, সে-কথা কি ভুলে গেলি? চল্ সেখানে।"

আর একজন জিজ্ঞাসা করলে, "যে-ব্যাটা ওখানে মাটির উপর প'ড়ে রয়েছে, ওকেও আমাদের কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে নাকি?"

অন্ধকারের ভিতরে হেঁট হয়ে কুমারের ঝাপসা দেহের উপরে ভাল ক'রে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবলাকান্ত বললে, "না রে শঙ্কর, এর ভার আর তোদের কারুকে বইতে হবে না। এর মাথা ফেটে দু-ফাঁক হয়ে গিয়েছে, এ পটল তুলেছে বলেই মনে হচ্ছে! চল, আমরা এখান থেকে অদৃশ্য হই।"

সপ্তম

ভুত না মানুষ?

কুমার কিন্তু মারা পড়ে নি, বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল মাত্র। গাঢ় অন্ধকারের ভিতরে অল্পে অল্পে যখন তার জ্ঞান ফিরে আসছে, আচ্ছন্ন ভাবের ভিতরে থেকেও এইটে সে অনুভব করতে পারলে, তার মাথার উপরে কি যেন একটা সজল ও সজীব পদার্থের চঞ্চল অস্তিত্ব! সে অন্ধকারেই ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে সেটা যে কি তা বোঝবার চেষ্টা করলে। বুঝতে দেরি লাগল না। তাকে আগলে মাথার কাছে বসে আছে তার প্রিয় কুকুর বাঘা, সেইই স্নেহভরে জিহ্বা দিয়ে তার রক্তাক্ত মস্তককে লেহন করছে বারংবার!

এতক্ষণে কুমারের সব কথা মনে পড়ল। এ-পাশে ও-পাশে ফিরে তাকিয়ে সে শত্রু বা মিত্র কারুরই সাড়া পেলে না। গভীর অন্ধকারের মধ্যে নির্জন অরণ্যের মর্মর শব্দ এবং অদৃশ্য ঝিল্লীদের ঐকতান ছাড়া সেখানে আর কোন শব্দই নেই।

অবিরাম রক্তপাতে তার দেহ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, বাঘার গলা জড়িয়ে ধরে সে কোনক্রমে আস্তে আস্তে উঠে বসল।

ঠিক সেই সময়েই বনের একদিকে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল কতকগুলো চঞ্চল আলো এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষদের কণ্ঠস্বর!

শত্রুরা আবার ফিরে আসছে ভেবে কুমার হামাগুড়ি দিয়ে পাশের একটা ঝোপের ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে, এমন সময় সে শুনতে পেলে উচ্চকণ্ঠের একটা চিৎকার—"বিমলবাবু! কুমারবাবু! জয়ন্ত! মানিক!" সুন্দরবাবুর কণ্ঠস্বর!

কুমারও সানন্দে চিৎকার ক'রে ডাকলে, "সুন্দরবাবু, সুন্দরবাবু! এইদিকে আসুন, এইদিকে! আমি কুমার!"

সুন্দরবাবু বিপুল উৎসাহে সচিৎকারে ব'লে উঠলেন, "হুম! বাব্বা, বনে বনে ঘুরে ঘুরে আমি হয়রান হচ্ছি, আর আপনারা এখানে মজা ক'রে দিব্যি আরামে লুকিয়ে আছেন? বেড়ে মানুষ তো আপনারা! এইবারে দয়া ক'রে আত্মপ্রকাশ করুন, এইদিকে এগিয়ে আসুন।"

কুমার বললে, "আপনার কথা রাখতে পারলুম না, ক্ষমা করবেন। আমি আহত। আমার চলবার শক্তি নেই।"

—"কি বললেন? আপনি আহত? আমারও ঠিক ঐ দশাই জানবেন। আমার বাঁ-হাতের ভিতর দিয়ে বন্দুকের 'বুলেট' ছোটাছুটি করেছে। কিন্তু আর তিন-মূর্তির সাড়া পাচ্ছি না কেন? তাঁরা কি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসে লজ্জায় বোবা হয়ে আছেন?"

—"জয়ন্তবাবু, মানিকবাবু আর বিমলকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গিয়েছে। আমি একলা আহত হয়ে এইখানে প'ড়ে আছি। সব কথা পরে শুনবেন, আগে এইদিকে আসুন।"

সুন্দরবাবু একেবারে চুপ মেরে গেলেন। তারপরই কুমার দেখলে জঙ্গলের ওপাশ থেকে আলোগুলো তার দিকেই ছুটে আসছে।

মিনিট-তিনেক পরেই ঘটনাক্ষেত্রে হ'ল সুন্দরবাবুর আবির্ভাব। হাতে টর্চের আলো এদিকে এবং ওদিকে নিক্ষেপ ক'রে সুন্দরবাবু উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, "কুমারবাবু, আপনি কোথায়?"

কুমার বললে, "আপনার বাঁ-দিকে পিছনে তাকিয়ে দেখুন!"

সুন্দরবাবু তখন টর্চের আলোটা মাটির উপরে নিক্ষেপ ক'রে শিউরে উঠে বললেন, "কি ভয়ানক, এখানে এত রক্ত কেন?"

কুমার বললে, "ও-রক্ত আমার!"

ততক্ষণে পুলিসের অন্যান্য লোকরা অনেকগুলো আলো নিয়ে সেখানে এসে তাড়িয়ে দিলে চারিদিকের ঘনীভূত অন্ধকারকে।

সুন্দরবাবু ঝোপের পাশে কুমারকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে বসে পড়লেন, তারপর তার ক্ষতস্থান লক্ষ্য ক'রে উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে বললেন, "সর্বনাশ, এ-যে মারাত্মক আঘাত!"

কুমার ম্লান হাসি হেসে বললে, "কিন্তু আমি মরি নি সুন্দরবাবু! আর শীঘ্র মরব ব'লেও আমার সন্দেহ হচ্ছে না।"

সুন্দরবাবু প্রবল ভাবে মস্তক আন্দোলন ক'রে বললেন, "না, না, না! আপনাকে যত তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে দেখছি। তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে নিশ্চয়ই আপনি মারা পড়বেন। ইস, এখনো যে মাথা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। দাঁড়ান, খান-কয় রুমাল দিয়ে আগে আপনার মাথাটা যতটা ভাল ক'রে পারি বেঁধে দি।"

সুন্দরবাবু নিজের পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে এবং এর-ওর-তার কাছ থেকে আরো কয়েকখানা রুমাল চেয়ে নিয়ে কুমারের ক্ষতস্থানে 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধতে নিযুক্ত হলেন। এবং সেই সঙ্গেই বললেন, "তাহলে বিমলবাবু, জয়ন্ত আর মানিক ডাকাতদের হাতে বন্দী হয়েছে? কেন যে আপনারা ভয়ে পালিয়ে এলেন, আমাদের সঙ্গে থাকলে এমন দুর্ঘটনা তো ঘটত না!"

কুমার মৃদু-হাসি হেসে বললে, "আমরা পালিয়ে আসি নি সুন্দরবাবু, আমরা একটা কৌশল অবলম্বন করেছিলুম মাত্র! আমরা লুকিয়ে ডাকাতদের পিছনে এসে তাদের আক্রমণ করেছিলুম, আর সেই আক্রমণের ফলেই ডাকাতরা ঘটনাস্থল থেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পালাবার সময় তারা আমাদের দেখতে পেয়েছিল।"

সুন্দরবাবু দুই ভুরু কপালের উপর দিকে তুলে বললেন, "তাই নাকি, তাই নাকি? তাহলে আমি তো ভুল বুঝেছিলুম। কিন্তু বলতে

পারেন কুমারবাবু, ডাকাতরা কোনদিকে লম্বা দিয়েছে।"

—"আমি কিছুই বলতে পারব না, কারণ তখন আমার জ্ঞান ছিল না।"

সুন্দরবাবু তিক্ত কণ্ঠে বললেন, "ডাকাতরা কোনদিকে গিয়েছে এখন তা আর জেনেই বা লাভ কি! আমি আহত, আপনারও এই সাংঘাতিক অবস্থা। আমাদের পক্ষে এখন ডাকাতদের অনুসরণ করা একেবারেই অসম্ভব। এখন আগে আমাদের লোকালয়ে ফিরে না গেলে কিছুতেই চলবে না। তাড়াতাড়ি ডাক্তার না দেখালে রক্ত বিষিয়ে আমরা দু'জনেই মারা পড়তে পারি। খালি আমরা দু'জন নই, আমাদের পক্ষে আরো সাতজন লোক আহত আর তিনজন নিহত হয়েছে। ডাকাতদের কি হয়েছে জানি না।"

কুমার বললে, "আপনাদের গুলিতে ডাকাতদের কি হয়েছে আমিও বলতে পারি না, কিন্তু আমাদের গুলি খেয়ে ক'জন ডাকাতকে গাছের উপর থেকে প'ড়ে যেতে দেখেছি।"

—"হুম! এত দুঃখের মধ্যে এও হচ্ছে একটা সুসংবাদ!······কিন্তু থাক-গে এখন ও-সব কথা। এই সেপাইরা, কুমারবাবুকে তোমরা সাবধানে ধরাধরি ক'রে তুলে নিয়ে চল। আর এখানে থেকে কোনই লাভ নেই।"

ঠিক সেই সময়ে অরণ্যের নিবিড় অন্ধকারের ভিতর থেকে জেগে উঠল একটা অদ্ভুত, তীব্র ও ভয়াবহ অট্টহাসি! হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা! সেই ভীষণ অট্টহাস্য গভীর অরণ্য এবং নৈশ আকাশকে যেন স্তম্ভিত ক'রে দিলে! সে প্রচণ্ড হাসির যেন আর বিরাম নেই!

কুমার নিজের অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল এবং সুন্দরবাবু সচকিত কণ্ঠে সভয়ে ব'লে উঠলেন, "ও কে? ও কে হাসে? ও কেন হাসে? ও কাদের দেখে হাসছে? ও কি মানুষের হাসি?"

তখন কুমারেরও সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। সেও ও-রকম অস্বাভাবিক হাসি জীবনে কখনো শোনে নি। সে অভিভূত কণ্ঠে বললে, "সুন্দরবাবু, কে-যে হাসছে আমি এখন তা জানতে চাই না। আমাকে

তাড়াতাড়ি এখান থেকে নিয়ে চলুন।"

বাঘা এতক্ষণ কুমারের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে ঝোপের এক পাশে চুপ ক'রে বসে ছিল। সেও এখন তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠল—তার সর্বাঙ্গে বিস্ময়ের লক্ষণ। হঠাৎ সে এক লাফ মেরে কুমারের দেহকে টপকে বিষম ক্রোধে গর্জন ক'রে কোনদিকে ছুটে যেতে উদ্যত হ'ল, কিন্তু কুমার তাড়াতাড়ি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বাঘাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "তুই আমার কাছ থেকে যাস-নে বাঘা, যাস-নে, এ-বন হচ্ছে অদৃশ্য বিপদে পরিপূর্ণ।"

সুন্দরবাবু বিকৃত স্বরে বললেন, "এ-বনে প্রেতযোনি আছে, প্রেত-যোনি আছে! ও-রকম হাসি মানুষে হাসতে পারে না। ডাকাতদের সঙ্গে আমরা লড়াই করতে পারি, কিন্তু ভূতের সঙ্গে লড়বার শক্তি মানুষের নেই। এই সেপাইরা, পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? বলছি না, কুমারবাবুকে তুলে নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে?"

হঠাৎ থেমে গেল সেই অট্টহাসির তরঙ্গ। তারপরেই জেগে উঠল একটা প্রচণ্ড কণ্ঠস্বর। কে যেন কোথা থেকে ভীষণ চিৎকার ক'রে বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! চলে যা এখান থেকে, আজ তোদের এখান থেকে চলে যেতে হবেই। তোরা চলে যা, কিন্তু আমি এখানে জেগে থাকব দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা! আমি আজ আর তোদের পৃথিবীর কেউ নই, আজ আমি রক্তলোলুপ, আজ আমি হত্যা করতে চাই, করতে চাই রক্তপাত!......হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা! জানি, জানি, আজ তোরা চলে গেলেও আবার তোরা এখানে ফিরে আসবি, আবার তোরা এই বনে বনে ঘুরবি শিকার খোঁজবার জন্যে! আজ আর তোদের দেখা দেব না, কিন্তু আবার তোরা যেদিন এখানে ফিরে আসবি, সেদিন আমি তোদের সাহায্য করব! হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা!"

সেই বীভৎস এবং আকাশ-বাতাস-কাঁপানো অট্টহাসি অরণ্যের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর হ'তে আরো দূরে গিয়ে হঠাৎ আবার

থেমে গেল।

সুন্দরবাবু শিউরোতে শিউরোতে আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন, "একি ব্যাপার কুমারবাবু, কে এমন ক'রে হাসলে, কে ও-সব কথা বলে গেল?"

কুমার তখন ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে রক্তপাতের ফলে আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই অস্ফুট স্বরে বললে, "আমি আর কিছু বুঝতে পারছি না সুন্দরবাবু, চোখেও আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আমাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলুন।" ব'লেই সে সমস্ত চেতনা হারিয়ে ধপাস ক'রে আবার মাটির উপরে শুয়ে পড়ল।"

অষ্টম

একখানা হাত-আয়না

অবলাকান্ত বললে, "শম্ভু, এইবার ব্যাটাদের চোখ খুলে দে। এরা কোন দিক দিয়ে কোথায় এসেছে কিছুই দেখতে পায় নি। ব্যাটাদের ঐ ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে. তোরা ওদের হাত-পা বেঁধে ঘরের মেঝেতে ফেলে রাখ। আজ ভয়ানক খাটুনি হয়েছে, ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে, আমি ঘুমুতে চললুম। ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ক'রে শম্ভু যেন জেগে সারারাত এখানে পাহারা ছায়।"

শম্ভু লণ্ঠন হাতে ক'রে একটা মাঝারি-আকারের ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তারপর কয়েকজন লোক বিমল, জয়ন্ত ও মানিককে নিয়ে সেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে। বিমলদের হাত তো আগেই পিছমোড়া ক'রে বাঁধা ছিল, ডাকাতরা এখন তাদের মাটির উপরে শুইয়ে সকলকার পা-গুলোও শক্ত দড়ি দিয়ে ভাল ক'রে বেঁধে বাইরে বেরিয়ে গেল।

শম্ভু তার হাতের লণ্ঠনটা উপরদিকে তুলে বন্দীদের দিকে আলোক-পাত ক'রে বললে, "বাপধনরা, পৃথিবীতে আজই হচ্ছে তোমাদের শেষ

রাত। কারণ কাল থেকে তোমরা যে ঘুম ঘুমোবে, সে-ঘুম আর কখনো ভাঙবে না। হা-হা-হা-হা, কর্তা নিজে চললেন ঘুমোতে আর আমাকে বললেন সারারাত জেগে থাকতে। আমার যেন খাটুনি হয় নি! ঘুমে আমারও চোখ ঢুলে আসছে, জেগে থাকব কিসের জন্যে, কার ভয়ে? এ-ঘরের দরজা তো বাইরে থেকে তালা বন্ধ থাকবে, তবে আর ভয়টা কিসের? এ-ব্যাটাদের হাত-পা বাঁধা, আর বাইরের দরজায় তালা বন্ধ! আমার জেগে থেকে লাভ?" বলতে বলতে আলো নিয়ে বাইরে গিয়ে সে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে সশব্দে।

ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভিতরে তিনজন বন্দী আড়ষ্ট হয়ে মাটির উপরে শুয়ে রইল নীরবে।······মিনিট-পনেরো যেতে-না-যেতেই ঘরের বাইরে দরজার ও-পাশ থেকে শোনা গেল খুব সম্ভব পাহারাওয়ালা শত্তুরই উচ্চ নাসিকাগর্জন।

জয়ন্ত নিম্নকণ্ঠে ডাকলে, "বিমলবাবু!"

—"বলুন।"

—"আমাদের পাহারাওয়ালার নাক তো ডাকছে! এইবার বোধহয় মরবার আগে আমরা অল্পস্বল্প গল্প করতে পারি, কি বলেন?"

—"কিন্তু, ভায়া, এখন গল্প ক'রে কোন লাভ আছে কি?"

—"তাছাড়া আর কি করব বলুন? সামনে যখন জাগছে চিরনিদ্রা, তখন পৃথিবীর এই শেষ-রাতটা ঘুমিয়ে নষ্ট করা কি উচিত?"

—"আমি চিরনিদ্রার ভক্ত নই জয়ন্তবাবু। আমি বেঁচে এই পৃথিবীতে জেগে থাকতেই চাই।"

—"কিন্তু বাঁচবেন কেমন ক'রে? অজানা শত্রুপুরী, আমাদের হাত-পা বাঁধা, বাইরে দরজার সামনেও প্রহরী, বাঁচবার কোন উপায় আছে কি?"

—"নিরুপায় আমি কখনো হই না জয়ন্তবাবু! হয়তো আমরা বাঁচলেও বাঁচতে পারি।"

—"আপনি এ কী অসম্ভব কথা বলছেন!"

—"ঘরের ভিতরে যখন আলো ছিল তখন আমি কি দেখেছি জানেন জয়ন্তবাবু ?"

—"কী দেখেছেন ?"

—"আমি যেখানে শুয়ে আছি, ঠিক এইখানেই আমার উপরে দেয়ালের গায়ে আছে কতকগুলো তাক। আর মাঝের একটা তাকের উপরে আছে একখানা দাঁড়-করানো হাত-আয়না।"

—"কিন্তু ও হাত-আয়না নিয়ে আমাদের কি উপকার হবে ?"

—"কিছু উপকার হলেও হ'তে পারে বৈ-কি !"

—"মানে ?"

—"আমার হাত আর পা বাঁধা আছে বটে, কিন্তু এই বাঁধা পা-ছু'টো আমি উপরদিকে তুলে লাথি মেরে ঐ হাত-আয়নাকে মাটির উপরে ফেলে দিতে পারি।"

জয়ন্ত উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, "বুঝেছি, বুঝেছি !"

মানিকও চমৎকৃত স্বরে বললে, "জয়ন্ত, বিমলবাবু আজ তোমাকে হারিয়ে দিলেন।"

জয়ন্ত বললে, "বিমলবাবু চিরদিনই আমাকে হারাতে পারেন, কারণ ওঁর অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে ঢের বেশি। একদিন পৃথিবীর বাইরে গিয়েও উনি আবার এই পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন।"

ততক্ষণে বিমল তার বাঁধা পা-ছু'টো উপরদিকে তুলে আন্দাজ ক'রে আয়নার উপরে এমন ভাবে পদাঘাত করলে যে, সেখানা মাটির উপরে পড়ে সশব্দে চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু সে-শব্দে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন শম্ভুর নাসিকার সঙ্গীত একবারও বন্ধ হ'ল না।

বিমল বললে, "জয়ন্তবাবু, গড়িয়ে গড়িয়ে আমার কাছে আসুন। আপনি এখনি এই ভাঙা আয়নার একখানা কাঁচ দাঁত দিয়ে ধরে মাটি থেকে তুলে নিন। ভাঙা কাঁচের ধার হচ্ছে ক্ষুরের মতন। কাঁচখানা দাঁতে চেপে ধরে আপনার হাতের দড়ি কাটতে একটুও বিলম্ব হবে না। তারপরে যা করতে হবে সেটা আপনাকে বলাই বাহুল্য !"

তিন মিনিট পরে জয়ন্তের দুই হস্ত হ'ল মুক্ত! সে অন্ধকারে হাতড়ে আয়নার আর-একখানা ভাঙা কাঁচ তুলে নিয়ে আগে নিজের পায়ের দড়ি ফেললে কেটে। তারপর সেই কাঁচখানা নিয়ে শীঘ্রহস্তে বিমলের হাতের দড়িও কেটে ফেললে। তারপর বিমলের পায়ের দড়ি এবং মানিকের হাত ও পায়ের দড়ি কাটতেও আর বেশি দেরি লাগল না। সবাই যদিও ঘরের ভিতরে বন্দী, তবু তারা এখন রজ্জুর বন্ধন থেকে মুক্ত!

বিমল বললে, "জয়ন্তবাবু, মানিকবাবু, আপনারা ঘরের দরজার ওপাশে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ান। আমি দাঁড়াচ্ছি দরজার এপাশে। এইবারে দেখা যাক, কেমন ক'রে শ্রীমান শম্ভুচন্দ্রের নাসিকার সঙ্গীত বন্ধ করা যায়।" সে হেঁট হ'য়ে মেঝের উপরে হাত বুলিয়ে ভাঙা-আয়নার ফ্রেমখানা কুড়িয়ে নিলে। তারপর সেখানা বারংবার দেয়ালের উপরে ঠুকতে লাগল সজোরে ও সশব্দে!

দরজার ওপাশে শুয়ে শম্ভু ঘুমোচ্ছিল। বিমলকে বেশিক্ষণ শব্দ সৃষ্টি করতে হ'ল না। প্রথমে থামল শম্ভুর সবাক নাসিকা, তারপর জাগল তার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ। সে বললে, "কী রে, কী রে, ঘরের ভেতরে তোরা কি করছিস রে?"

বিমলের হাতের আয়নার ফ্রেম আরো জোরে করলে দেয়ালকে আক্রমণ।

—"বটে, বটে, ভাল কথায়, কান পাতা হচ্ছে না? দেখবি মজাটা?"

শব্দ থামবার নাম করলে না।

—"নাঃ, জ্বালালে দেখছি। ব্যাটারা ভেবেছে আমাকে ঘুমোতে দেবে না! আচ্ছা, পিঠের ওপরে দমাদ্দম লাথি পড়লেই সব ঠাণ্ডা হয় কিনা দেখি!"

একটু পরেই বাহির থেকে দরজার কুলুপ খোলার আওয়াজ হ'ল এবং তারপর খুলে গেল দরজার পাল্লা দু'খানা। লণ্ঠন হাতে ক'রে ঘরের

ভিতরে শম্ভুর প্রবেশ।

কিন্তু সে চোখে কিছু দেখবার আগেই জয়ন্তের শিক্ষিত মুষ্টি তার চিবুকের উপরে দিলে প্রচণ্ড এক "নক-আউট ব্লো"। একটিমাত্র
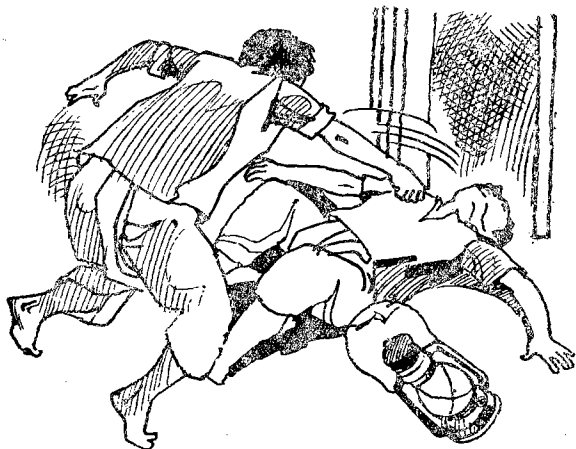
টুঁ শব্দ উচ্চারণ না ক'রেই শম্ভু মেঝের উপর লম্বা হয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে।

শম্ভুর হাত পা মুখ ভাল ক'রে বাঁধতে বাঁধতে বিমল বললে, "অবলাকান্ত সুচতুর বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে সে অতি চালাকি করতে গিয়ে সব পণ্ড ক'রে দেয়। সে বারবার আমাদের বন্দী করছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে যদি আমাদের বধ করত তাহলে বহুদিন আগেই তার মনের বাসনা পূর্ণ হ'ত। কিন্তু তার নিষ্ঠুর মন হচ্ছে বিড়ালের মতো। শিকারকে একেবারে মেরে না ফেলে তাকে নিয়ে সে আগে খেলা করতে চায়। তার এই বুদ্ধির দোষেই আমরা বারবার তাকে ফাঁকি দিতে পারছি।"

মানিক বললে, "আকাশে আধখানা চাঁদ আছে বটে, কিন্তু বনের

ভিতরে অন্ধকারের রাজত্ব। তার উপরে ওরা চোখ বেঁধে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। এখান থেকে যদি বাইরে বেরুতে পারি, তাহলে পথ চিনব কেমন ক'রে?"

জয়ন্ত বললে, "পথ চেনবার দরকার নেই। আমাদের দক্ষিণদিকে যেতে হবে।"

—"কি ক'রে জানলে?"

—"চোখ বন্ধ থাকলেও আমাদের কানও তো বন্ধ ছিল না! ভুলে যাচ্ছ কেন, এখানে আসবার সময়ে অবলাকান্ত সবাইকে উত্তরদিকে যেতে বলেছিল।"

বিমল ব্যস্তভাবে বললে, "আর দেরি করা নয়। আমাদের আগে কুমারের সন্ধান নিতে হবে। তার জন্যে আমার মন ছটফট করছে।"

মানিক বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, "কুমারবাবুর যে অবস্থা দেখে এসেছি, জানি না গিয়ে কি দেখব!"

বিমল জোর-গলায় বললে, "ভালই দেখব, ভালই দেখব! এত সহজে মরবার জন্যে আমি আর কুমার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমার মন বলছে, কুমার জখম হয়েছে বটে, কিন্তু বেঁচে আছে!"

নবম

তিন ভূতের আবির্ভাব

'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতখানি বুকের কাছে ঝুলিয়ে সুন্দরবাবু নিজের আপিসে একখানা চেয়ারের উপরে বসেছিলেন অত্যন্ত বিমর্ষের মতো। হঠাৎ ঘরের ভিতরে একসঙ্গে প্রবেশ করলে, জয়ন্ত, মানিক, বিমল এবং কুমার—তারও মাথায় 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধা।

সুন্দরবাবু বিপুল বিস্ময়ে ধড়মড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঠে কেবলমাত্র বলতে

পারলেন—"হুম !"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "সুন্দরবাবু, আপনার মুখের পানে তাকালে মনে হয়, আপনি যেন ভূত দেখেছেন !"

—"ঠিক তাই জয়ন্ত, ঠিক তাই। একটা-আধটা নয়, তিন-তিনটে ভূত !"

—"আপনি কি আমাদের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন ?"

—"একেবারেই।"

—"কেন ?"

—"অবলাকান্ত মানুষ নয়, দানব। তার কবল থেকে তোমরা যে মুক্তি পাবে, এতটা আশা আমি করতে পারি নি।"

—"কিন্তু দেখছেন তো, মুক্তি আমরা পেয়েছি ?"

—"কেমন ক'রে পেলে ?"

জয়ন্ত সংক্ষেপে তাদের কাহিনী বর্ণনা করলে।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম। এ-যাত্রায় দেখছি আমাদের উপরে টেক্কা মারলেন বিমলবাবুই।"

বিমল বললে, "মোটেই নয়, মোটেই নয়। জয়ন্তবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আছি ব'লেই আমার ভোঁতা বুদ্ধি একটু সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। একেই বলে সঙ্গগুণ !"

জয়ন্ত বললে, "বিলক্ষণ। বিনয় দেখিয়ে বিমলবাবু লোককে লজ্জা দিতে ভালবাসেন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "অতঃপর আমাদের কি কর্তব্য ?"

জয়ন্ত বললে, "আবার আমরা সদলবলে অবলাকান্তের উদ্দেশে যাত্রা করব।"

—"কবে ?"

—"আজকেই।"

—"অসম্ভব !"

—"কেন ?"

—"অন্তত এই হাত নিয়ে আমার, আর ঐ মাথা নিয়ে কুমারবাবুর পক্ষে আজ যাত্রা করা অসম্ভব। দেখছ না, আমরা দস্তুরমত আহত?"

কুমার তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না সুন্দরবাবু, যাত্রা করবার জন্যে আমি দস্তুরমত প্রস্তুত।"

—"আরে, বলেন কি মশাই?"

—"হ্যাঁ। আহত হলেও আমি অক্ষম নই।"

—"আপনারা সকলেই পাগলা-গারদের লোক। আর এতটা তাড়াতাড়ির দরকার কি জয়ন্ত? অবলাকান্ত নিশ্চয়ই এতক্ষণে সেই আম-বাগানের পোড়ো বাড়ি ছেড়ে সরে পড়েছে।"

—"আমরাও তা জানি।"

—"তবে তাকে পাবে কোথায়? তোমরা তার ঠিকানা জানো?"

—"হয়তো জানি।"

—"হয়তো মানে?"

—"মনে ক'রে দেখুন সুন্দরবাবু, ট্রেন আক্রমণের পরে লুটের মাল নিয়ে অবলাকান্ত প্রথমেই কোনদিকে গিয়েছিল?"

—"বনের যে পথে পদচিহ্ন দেখে আমরা ডাকাতদের পিছু নিয়েছিলুম, তারা সেই পথের বাঁ-দিকের জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিল আরো-সরু একটা পথ ধ'রে।"

—"তারপর তারা আমাদের দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি আবার বেরিয়ে এসেছিল পালিয়ে যাবার জন্যে।"

—"হ্যাঁ।"

—"এখন সমস্ত ব্যাপারটা একবার তলিয়ে বুঝে দেখুন। লুটের মাল নিয়ে পালিয়ে সর্ব-প্রথমেই ডাকাতদের কোথায় যাওয়া উচিত? নিশ্চয়ই নিজেদের প্রধান আস্তানায়।"

সুন্দরবাবু ঘাড় নেড়ে সমর্থন ক'রে বললেন, "হ্যাঁ, তোমার এ-কথা মানি বটে।"

—"তাহলেই বোঝা যাচ্ছে, ডাকাতদের সব চেয়ে বড় আস্তানা

আছে ঐ বনের ভিতরেই।"

—"তাও মানলুম। কিন্তু ওখানকার অরণ্য তো ছোট্ট নয়—বিশ-পঁচিশ মাইল ছুটোছুটি করলেও আমরা হয়তো তার শেষ খুঁজে পাব না। আর ডাকাতদের আস্তানাও নিশ্চয়ই কোন গুপ্তস্থানেই আছে, যা আবিষ্কার করা মোটেই সহজ নয়।"

—"অবলাকান্ত কি-রকম জায়গায় লুকিয়ে আছে সেটাও হয়তো আমরা অনুমান করতে পারি। যাঁরা অপরাধ-তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ তাঁরা জানেন যে, এক-একজন অপরাধীর এক-এক রকম বিশেষ অভ্যাস থাকে। গোয়েন্দা-কাহিনীর নয়, পৃথিবীর সত্যিকার গোয়েন্দারা কোন মামলা হাতে পেলে আগে দেখবার চেষ্টা করেন, তার ভিতরে অপরাধীর কোন বিশেষ অভ্যাস প্রকাশ পেয়েছে কিনা। যে-মামলায় সেই বিশেষ অভ্যাসের প্রমাণ থাকে তার কিনারা করতেও বিশেষ বিলম্ব হয় না। এই অবলাকান্তের একটা বিশেষ অভ্যাস বরাবরই আমরা লক্ষ্য করেছি। 'জেরিণার কণ্ঠহার' মামলা স্মরণ করুন। সে মামলায় অবলাকান্তকে আমরা পেয়েছিলুম কলকাতার টালিগঞ্জ-অঞ্চলের একটা বুনো জায়গায় একখানা প্রকাণ্ড ভাঙা অট্টালিকার মধ্যে। তারপর 'সুন্দরবনের রক্ত-পাগল' মামলাটাতেও অবলাকান্তকে আমরা খুঁজে বার করেছিলুম কোথায়? সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাচীন মৃত্তিকাস্তূপের নিচে প্রোথিত সেকেলে একটা মঠের ভিতরে গিয়ে সে আড্ডা গেড়েছিল। বর্তমান মামলাতেও দেখছি এখানকার বনজঙ্গলেও তার বিভিন্ন আড্ডা আছে, আর সম্প্রতি তার যে আড্ডা থেকে আমরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি তাও আছে একখানা পোড়ো ভাঙা বাড়ির ভিতরে। অবলাকান্ত ভারী চালাক। সে আড্ডা তৈরি করেছে অনেকগুলো, আর এক আড্ডায় বেশিদিন থাকে না। তাই তাকে ধরাও সহজ হয় না। আমার বিশেষ সন্দেহ হচ্ছে যে, ঐ বনের ভিতরে তার আর একটা আস্তানা আছে, আর সেইটেই হচ্ছে তার প্রধান আস্তানা। ওর ঐ প্রধান আস্তানাও হয়তো পাওয়া যাবে একখানা মান্ধাতার আমলের ভাঙা-চোরা বাড়ি বা

অট্টালিকার ভিতরে। বাংলাদেশের বহুস্থানেই দেখা যায় এমন গভীর অরণ্য, কিন্তু সেই-সব অরণ্যের ভিতরে অন্বেষণ করলে আজও পাওয়া যায় অনেক পুরাতন প্রাসাদ বা বাড়ি, পরিত্যক্ত নগর আর গ্রামের চিহ্ন। অবলাকান্তের বিশেষ অভ্যাস হচ্ছে, সে খুঁজে খুঁজে এই রকম সব জায়গাই বাস করবার জন্যে নির্বাচন করে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "সবই তো বুঝলুম, কিন্তু আর দু'দিন পরে গেলেই কি ভাল হ'ত না?"

—"না। যদিও সেদিনের বৃষ্টিতে-ভেজা মাটি আজ আর নরম নেই, কিন্তু তবু চেষ্টা করলে শুকনো কাদার উপরে এখনো হয়তো তাদের পায়ের ছাপ দেখে বুঝতে পারব তারা কোনদিকে গিয়েছে। পায়ের দাগ পাওয়া গেলে অবলাকান্তের আড্ডা খুঁজে বার করতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না। এমন সুযোগ হারাতে আমি প্রস্তুত নই।"

বিমল বললে, "আমারও ঐ মত। শুভস্য শীঘ্রম!"

কুমার ও মানিক হাসতে হাসতে বললে, "আমরাও জয়ন্তবাবুর এই প্রস্তাব সমর্থন করি!"

সুন্দরবাবু মুখের উপরে বিপুল গাম্ভীর্যের বোঝা নামিয়ে বললেন, "সব বুঝতে পারছি—হুম। অগত্যা ভাঙা হাত নিয়ে আমাকেও যেতে হবে দেখছি—নইলে মানিক চিরদিনই আমাকে কাপুরুষ ব'লে যখন-তখন ঠাট্টা করতে ছাড়বে না। মানিক হচ্ছে পাজির পা-ঝাড়া। বরাবরই সে ছিনে জোঁকের মতন আমাকে কামড়ে থাকতে ভালবাসে। আমি যে কেন ওর এমন চোখের বালি হ'লুম, ভগবানই তা জানেন! হুম!"

দশম

ভয়াবহ বন্ধু

আবার সেই ঘটনাস্থল।

ট্রেন থেকে সদলবলে নেমে পড়ে জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, সেবারে আমরা বৃহৎ একটা দল নিয়ে দস্যুদের পিছনে অনুসরণ করেছিলুম বলে সফল হতে পারি নি। এবারে আর সে-ভ্রম করতে চাই না।"

—"মানে?"

—"আপনি আহত। আপাতত আপনি সেপাইদের নিয়ে স্টেশনেই অপেক্ষা করুন। ইচ্ছা করলে কুমারবাবুও এখানে অপেক্ষা করতে পারেন, কারণ তিনিও আহত হয়েছেন।"

কুমার বললে, "খুব কথাই বললেন যে দেখছি! আমার উপরে এতটা সদয় নাহলেও পারতেন। আপনারা আমাকে অক্ষম ভাবছেন, না? তাহলে আমি একটা প্রস্তাব করতে চাই, সমর্থন করবেন?"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "আজ্ঞা করুন!"

—"আপনারা সকলেই খানিকক্ষণের জন্যে এখানে বিশ্রাম করুন। বাঘাকে নিয়ে আমিই ঐ বনের দিকে যাত্রা করি। পদচিহ্ন আবিষ্কার করবার শক্তি আমারও আছে—বাঘার তো আছেই! হয়তো এ-বিষয়ে বাঘা আমাদের সকলের চেয়েই শক্তিশালী। আমি একলা গেলে নিশ্চয়ই ডাকাতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব না।"

কুমারের একখানা হাত চেপে ধরে জয়ন্ত বললে, "কুমারবাবু, মাপ করবেন। আপনি অক্ষম ব'লে কোন ইঙ্গিতই করছি না। বিমলবাবু আর আপনি হচ্ছেন অসাধারণ লোক—আপনারা সব করতে পারেন তা আমি জানি। বেশ, সুন্দরবাবুই তাহলে সেপাইদের নিয়ে এখানে

অপেক্ষা করুন, আর আমরা চারজনে মিলে বনের দিকে যাত্রা করি।"

সুন্দরবাবু বললেন, "বা-রে, আমার কাছে তোমাদের কেউই থাকবে না? তাহলে আমার সময় কাটবে কেমন ক'রে? ঐ সেপাইদের সঙ্গে তো আমি গল্প করতে পারি না? অন্তত মানিককেও আমার কাছে রেখে যাও।"

মানিক বললে, "পাগল! আমিও জয়ন্তদের সঙ্গে যেতে চাই।"

সুন্দরবাবু মিনতি-ভরা কণ্ঠে বললেন, "না মানিক, তুমি লক্ষ্মীছেলে। তুমি যখন-তখন আমাকে নিয়ে বড় বাজে ঠাট্টা কর বটে, কিন্তু তবু তোমাকে আমি ভারী ভালবাসি। প্রায় বুড়ো হতে চলেছি, আমাকে এখানে একলা ফেলে যেও না।"

জয়ন্ত বললে, "মানিক, আমারও ইচ্ছা তুমি সুন্দরবাবুর কাছে কিছুক্ষণ বসে থাকো।"

মানিক নাচারের মতন বললে, "বেশ, তাহলে আপাতত আমি হুম-বাবুরই পার্শ্বচর হলুম।"

সুন্দরবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, "মানিক, মানিক! আবার তুমি আমাকে হুম-বাবু বলে ডাকছ? ও-নাম আমি পছন্দ করি না! তুমি যদি আবার আমাকে হুম-বাবু বলে ডাকো তাহলে এখনি আমি নিজেই তোমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেব! ব'য়ে গেল, না-হয় আমি একলাই থাকব, না-হয় আমি সেপাইদের সঙ্গেই গল্প করব, ওরাও মানিকের চেয়ে ভদ্দরলোক! হুম-বাবু! হুম-বাবু আবার একটা নাম নাকি? কোন ছোটলোকও ও-নাম ধরে কারুকে ডাকতে পারে না! হুম।"

মানিক দক্ষিণবাহু দিয়ে সুন্দরবাবুকে সাদরে বেষ্টন ক'রে মিষ্ট-কণ্ঠে বললে, "না সুন্দরবাবু, অন্তত আজ আমি আপনাকে হুম-বাবু বলে ডাকব না! আজ আপনার সঙ্গে খালি ভাল-ভাল গল্প করব, আর যদি ভাল-ভাল খাবার পাওয়া যায় তাহলে দু'জনে মিলে বেশ পেট ভ'রে খাব!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুঁঃ, এটা আবার একটা স্টেশন নাকি, এখানে

'প্যাসেঞ্জার' ছাড়া আর কোন ট্রেনই থামে না। এখানে বসে তুমি খেতে চাও ভাল-ভাল খাবার? মরুভূমিতে তুমি খুঁজতে চাও রজনীগন্ধার চারা? সত্যি মানিক, তুমি অত্যন্ত বোকা কিন্তু।"

মানিক সকৌতুকে খিল-খিল ক'রে হেসে উঠে বললে, "উঁহু, উঁহু! কে বলে আমি অত্যন্ত বোকা? অত্যন্ত বলছেন কি মশাই, আমি অল্প বোকাও নই। ভাল-ভাল খাবারের জন্যে আমি স্টেশনের মুখ চেয়েই বসে আছি নাকি?"

—"হুম! তোমার এ-কথার অর্থ কি?"

—"অর্থ হচ্ছে এই, আমার হাতে এই যে 'টিফিন কেরিয়ার'টি দেখছেন, এর মধ্যে কি-কি খাবার আছে জানেন?"

—"তাই নাকি, তাই নাকি, তাই নাকি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ! এই 'টিফিন কেরিয়ারে'র ভিতরে আছে 'ফাউল রোস্ট', 'মটন কাটলেট' 'পোলাও', 'চিংড়ি-মাছের মালাইকারি', 'রুই-মাছের কালিয়া', আর 'ভেটকি-মাছের ফ্রাই।"

—"তাই নাকি, তাই নাকি? হুম, হুম, হুম, হুম! মানিক, তোমার মতন মধুর ছেলে জীবনে আমি আর কখনো দেখি নি! কিন্তু লক্ষ্মী-ভাইটি আমার, তুমি দয়া ক'রে আমাকে আর হুম-বাবু বলে ডেকো না, ও-নামে ডাকলেই আমার মেজাজ কেমন বিগড়ে যায়। এই সেপাই! স্টেশন-মাস্টারকে গিয়ে বল-গে যা, আমার জন্যে এখনি যেন 'ওয়েটিং রুম' খুলে দ্যায়। ভয়ঙ্কর ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, আমরা এখন ওখানে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করব, কি বল মানিক?"

মানিক অতিশয় গম্ভীর মুখে বললে, "নিশ্চয়ই।"

বিমল, কুমার ও জয়ন্ত হাসতে-হাসতে সেতুর দিকে চলে গেল এবং বিমলের ডাক শুনে তাদের সঙ্গে-সঙ্গে লাঙ্গুল আন্দোলন করতে-করতে ছুটে গেল বাঘাও।

আবার বনের সেই পথ। সেখানে বড়-পথের বাঁ-দিক দিয়ে একটি ছোট পথ গভীর জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করেছে।

জয়ন্ত নিচের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে বললে, "দেখুন বিমলবাবু, শুকনো কাদার উপরেও এখনো রয়েছে কত পদচিহ্ন। দু'দিন পরে এলে এ-চিহ্ন হয়তো আমরা দেখতে পেতুম না। চলুন, আমরাও এগিয়ে যাই।"

বাঘার মাথার উপরে হাত দিয়ে কুমার তাকে দেখিয়ে দিলে সেই পদ-চিহ্নগুলো। সুশিক্ষিত সারমেয়-অবতার বাংলার স্বদেশী জীব বাঘা! কুমারের ইঙ্গিত বুঝতে তার একটুও দেরি লাগল না। সে তৎক্ষণাৎ মাটির উপরে মুখ নামিয়ে মিনিট-খানেক ধরে আঘ্রাণ নিলে, তারপর অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে কুমারের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করতে লাগল, "ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ।"

কুমার আদর ক'রে তার মাথা চাপড়াতে-চাপড়াতে বললে, "তাহলে বাঘা, তুই আমার কথা বুঝতে পেরেছিস তো? তবে চল ঐ পায়ের দাগগুলো ধরে আমাদের আগে-আগে।"

বাঘা সানন্দে লাফ মেরে একবার কুমারের গাল চেটে দেবার চেষ্টা করলে। তারপর নিজের লাঙ্গুলকে জয়নিশানের মতন ঊর্ধ্বে তুলে মৃত্তিকার উপরে নিজের নাসিকাকে প্রায় সংলগ্ন ক'রে অগ্রসর হতে লাগল দ্রুতপদে।

বিমল খুশি-ভরা গলায় বললে, "ব্যাস, আমাদের আর কোনই বেগ পেতে হবে না। বাঘা যখন গন্ধ পেয়েছে, তখন মাটির উপরে যেখানে দৃশ্যমান পায়ের দাগ থাকবেও না, সেখানেও সেই অদৃশ্য গন্ধকেই অনুসরণ ক'রে আমাদের যথাস্থানেই নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। বাঘাকে আমি চিনি। আগেও সে এইভাবে আমাদের অনেকবার পথ দেখিয়েছে। কুমার তাকে কি সুন্দর শিক্ষাই দিয়েছে—বাহাদুর কুমার, বাহাদুর! আর আমাদের কোনই ভাবনা নেই।"

বিমল যে সন্দেহ প্রকাশ করলে, খানিক পরেই দেখা গেল তা মোটেই ভুল নয়। মিনিট-পনেরো অগ্রসর হবার পরেই বনের একটা অংশ শেষ হয়ে গেল। তারপর রয়েছে একটা কাঁকর-ভরা মাঝারি আকারের মাঠ, তার উপরে পায়ের ছাপের বা পথের কোন চিহ্নই নেই।

আসামীরা কোনদিকে গিয়েছে কোন তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিশেষজ্ঞের পক্ষেও আর তা আন্দাজ করা অসম্ভব।

কিন্তু বাঘা একবারও দাঁড়াল না, একবারও ইতস্তত করলে না। মৃত্তিকার উপরে নাসিকা সংলগ্ন ক'রে সমানে এগিয়ে যেতে লাগল।

কুমার বললে, "দেখছেন জয়ন্তবাবু, এখানে বাঘা না থাকলে আমাদের কি মুশকিলেই পড়তে হ'ত?"

—"মুশকিল ব'লে মুশকিল! এখানে কিছুতেই আমরা গন্তব্য পথ খুঁজে পেতুম না। আশ্চর্য কুকুর! শিক্ষাগুণে দেশী কুকুর যে এতটা বুদ্ধিমান হয়, স্বচক্ষে না দেখলে আমি তা বিশ্বাস করতেই পারতুম না।"

মাঠ শেষ। আবার ঘন বনজঙ্গল। ঝোপঝাপের আশপাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা আর একটা সংকীর্ণ পথের রেখা—এতটা অস্পষ্ট যে, সহজে সেখানে পথ আছে বলে মনে সন্দেহই হয় না। সেই পথটাই অবলম্বন করলে বাঘা।

অরণ্য হয়ে উঠছে ক্রমেই বেশি নিবিড়। স্থানে স্থানে মাথার উপরেও এমন পুরু লতাপাতার আচ্ছাদন যে, সূর্যালোক হারিয়ে সে-সব ঠাঁই হয়েছে অন্ধকারে রহস্যময়। সেখানে কোনরকমে চোখ চলে, কিন্তু স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না।

চলতে চলতে জয়ন্ত হঠাৎ বিমলের গা টিপলে। তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে বিমল সচমকে দেখলে, সুমুখের একটা ঝোপের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে দুটো তীব্র ও বন্য চক্ষু।

জয়ন্ত একলাফ মেরে সেই ঝোপের উপরে গিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে বিমল ও কুমারও। কিন্তু ঝোপ ফাঁক ক'রে কিছুই আবিষ্কার করা গেল না। কেবল দেখা গেল যে, এ-ঝোপ থেকে ও-ঝোপের ভিতর দিয়ে একটা চাঞ্চল্যের তরঙ্গ ছুটে চলে যাচ্ছে ক্রমেই দূরের দিকে।

জয়ন্ত বন্দুক তুললে।

বিমল বাধা দিয়ে বললে, "থাক। ঝোপের ফাঁকে যে অদ্ভুত চোখ দেখলুম তার মধ্যে মানুষী ভাব নেই। জঙ্গল ভেদ ক'রে মানুষও বোধহয়

অত তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে না। হয়তো ওটা কোন বড়-জাতের বন্য জন্তু।"

—"ওটা জন্তু কি মানুষ, বন্দুক ছুঁড়লেই সে সন্দেহ ভঞ্জন হতে পারে।"

—"সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত আশা-ভরসার মূলে কুঠারাঘাত হতে পারে। এই বনে যদি শত্রুদের আস্তানা থাকে, বন্দুকের শব্দ কি সেখানে গিয়ে পৌঁছবে না?"

জয়ন্ত জিব কেটে বললে, "ঠিক বলেছেন। ঝোঁকের মাথায় ভুলে গিয়েছিলুম। আর-একটু হলেই সমস্ত পণ্ড করেছিলুম আর কি!"

পথ চলতে চলতে কাটল আরো কিছুক্ষণ। অরণ্য হয়ে উঠেছে অধিকতর দুর্ভেদ্য। সরু পথটা চলেছে যেন অজগরের মতন কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে। কোনদিকেই হাত-কয়েক দূরে আর কিছুই দেখবার যো নেই। মাথার উপরে জ্যান্ত পাতার মর্মরধ্বনি, পায়ের তলায় মরা পাতার আর্তনাদ, চারিদিকে দিবাকালেও যেন চিরসন্ধ্যার আবছায়া, কোথাও কোন প্রাণীর সাড়া নেই—পাখিরাও যেন কোন অজানার ভয়ে সেখানে গান গাইতে ভরসা পায় না।

কি যেন একটা বুকচাপা অমঙ্গলের থমথমে ভাব জেগে উঠছে দিকে দিকে—যেদিকে তাকানো যায় সেইদিকেই। অনন্ত নীলিমার অভিনন্দন এবং সূর্যালোকের সোনালী আশীর্বাদ থেকে চিরবঞ্চিত এ যেন এক অভিশপ্ত অরণ্য-জগৎ, হিংসা আর হত্যার দুঃস্বপ্ন এখানে যেন যেখানে-সেখানে ওৎ পেতে অপেক্ষা ক'রে থাকে, প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গেই হয় ঘন ঘন হৃৎকম্প। তবু এটা দিনের বেলা, অন্ধ নিশীথে চক্ষু যখন হয় একেবারেই দৃষ্টিহীন, তখন এই অরণ্যানী যে কতখানি বিভীষণা হয়ে ওঠে, সে কথা কল্পনা করলেও স্তম্ভিত হয়ে যায় প্রাণ-মন।

জায়গায় জায়গায় রয়েছে এক-একটা মহাকায় বনস্পতি, তারা প্রত্যেকেই যেন বহু ঊর্ধ্বে উঠে শূন্যের অনেকখানি পূর্ণ ক'রে ঘন শাখা-পল্লব দিয়ে সৃষ্টি করতে চায় নতুন নতুন অরণ্য! কোন-কোন বনস্পতি

আবার এমন গাঢ় অন্ধকার মাখা যে, তার সীমারেখা পর্যন্ত আন্দাজ করবার উপায় নেই।

এমনি একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে উপরদিকে মুখ তুলে জয়ন্ত লক্ষ্য করলে, অরণ্যের ক্ষুদ্রতর সংস্করণের মতো সেই সুবৃহৎ বটগাছের এখানে-ওখানে জমাট অন্ধকার ফুটো ক'রে ফুটে ফুটে উঠছে যেন সব আশ্চর্য আগুনের ফিনকি! সেগুলো জোনাকির মতো জ্বলছে আর নিবছে, জ্বলছে আর নিবছে। কিন্তু জোনাকিরা মনে জাগায় না ত্রাস, এগুলো দেখলে বুক কেমন ছমছম ক'রে ওঠে, এ-সব অগ্নিকণার মধ্যে আছে যেন কোন হিংস্র পৈশাচিকতা—এরা যেন বনবাসী ক্ষুধার্ত রক্তলোভীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়!

জয়ন্ত বিস্মিতভাবে কি বলবে ভাবছে, এমন সময়ে বিমল ও কুমার হেসে উঠল সকৌতুকে। এমন ভয়াবহ স্থানে সেই তরল কৌতুক-হাস্যকেও মনে হ'ল অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

—"আপনারা হঠাৎ হাসলেন কেন?"

—"অন্ধকারে গাছের ভিতরে যেগুলো জ্বলে জ্বলে উঠছে ওগুলো বাদুড় কি প্যাঁচার চোখ। খুব সম্ভব বাদুড়ের।"

তারা আবার এগিয়ে চলল—সেই দীপ্তদৃষ্টিময় বটগাছটাকে পিছনে ফেলে।

খানিকদূর এগিয়ে জয়ন্ত সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "এ বনে আমরা ছাড়া আর কোন মানুষ আছে বলে মনে হচ্ছে না। বাঘা ভুল পথে যাচ্ছে না তো?" কুমার মাথা নেড়ে বললে, "বাঘা এমন ভুল কখনো তো করে নি।"

বিমল বললে, "বনে এখন শত্রুদের অস্তিত্ব আছে কিনা বলতে পারি না, কিন্তু এখান দিয়ে যে মানুষ আনাগোনা করে তার প্রমাণ তো এই পথটাই। এখানে মানুষ নিয়মিত কাজে পদার্পণ না করলে এই পথের কোন চিহ্নই থাকত না, ঘনজঙ্গল নিশ্চয়ই তাকে নিঃশেষে গ্রাস ক'রে ফেলত।"

জয়ন্ত বললে, "তাও তো বুঝছি। কিন্তু পথ আমাদের আরো কত

দূরে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে চায় ?"

—"খুব সম্ভব পথ শেষ হবে অবলাকান্তের আস্তানার কাছে গিয়ে।"

কুমার বললে, "আস্তানার খোঁজ যদি পাই, আমরা কি করব ?"

জয়ন্ত বললে, "আবার আমাদের স্টেশনে সুন্দরবাবুর কাছে ফিরে যেতে হবে !"

—"তাতে অনেকটা সময় নষ্ট হবে না কি ?"

—"নষ্ট হলেও উপায় নেই। শুনেছি এখানে নাকি শতাধিক ডাকাত আছে। তাদের বিরুদ্ধে আমরা তিনজনে কিছুই করতে পারব না।"

—"স্টেশন থেকে আমরা আবার যখন সদলবলে ফিরে আসব, তখন সন্ধ্যা উতরে যাবে।"

—"আসুক রাত্রি, আজ তার অন্ধকার হবে আমাদের বন্ধুর মতো। শত্রুদের চোখের আড়ালে থেকে আবার আমরা বনের ভিতরে ঢুকতে পারব। অন্ধকারেও আমাদের খুব বেশি অসুবিধা হয়তো হবে না, কারণ চোখ অন্ধ হলেও আমাদের পথ দেখাবে বাঘার নাসিকা।"

চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে বিমল বললে, "জয়ন্তবাবু, বারবার আমার কি সন্দেহ হচ্ছে জানেন? কে যেন আনাচে-কানাচে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসছে, আমাদের ভাবভঙ্গি সমান লক্ষ্য করছে, আমাদের প্রত্যেক কথা কান পেতে শুনছে।"

—"ওটা বোধহয় আপনার মনের ভ্রম। আমি তো এখানে কারুর সাড়া পাচ্ছি না। বরং মনে হচ্ছে এ বন যেন মনুষ্য-বর্জিত।"

আচম্বিতে যেন জয়ন্তের কথার প্রতিবাদ করবার জন্যেই অরণ্যের একটা অত্যন্ত-অন্ধকার অংশ থেকে ঠিক অপার্থিব স্বরেই খিল খিল ক'রে কে হাসতে লাগল হি হি হি হি হি হি। সেই অদ্ভুত হাস্যধ্বনি রীতিমত রোমাঞ্চকর !

জয়ন্ত ও বিমল চমকে উঠে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলে।

কুমার বললে, "যেদিন আহত হয়েছিলুম সেদিনও আমি শুনেছিলুম এই বিশ্রী হাসিই।"

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, "কিন্তু এ কে ? এমন ক'রে হাসে কেন ?"

বিমল বললে, "এ যে শত্রুদের চর নয় এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। শত্রুচর হলে লোকটা এমনভাবে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিত না।"

হাসির পর হাসির ধাক্কায় তখনো বন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

জয়ন্ত বললে, "খানিক আগে ঝোপের ফাঁকে আমরা বোধহয় এরই চোখ দেখতে পেয়েছিলুম।"

বিমল বললে, "তাহলে বলতে হবে এর চোখ দুটো হচ্ছে বন্যজন্তুর চোখের মতো। এ আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে আসেই-বা কেন, আর দিনে-রাতে বনে বনে থাকেই-বা কেন ?"

হাসি থামিয়ে হঠাৎ কে উদ্‌ভ্রান্ত তীক্ষ্ণস্বরে ব'লে উঠল, "দিন-রাত বনে বনে থাকি কেন ? দিন-রাত বনে বনে থাকি কেন ? ওরে তোরা বুঝতে পারবি নি রে, বুঝতে পারবি নি, সে কথা বুঝতে পারবি নি।"

বিমল চেঁচিয়ে বললে, "কে তুমি ?"

—"হা হা হা হা। কে আমি ? আমি তোদের বন্ধু।"

—"তুমি আমাদের বন্ধু।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তোদের বন্ধু। কারণ তোরাও যা চাস, আমিও তাই চাই।"

—"আমরা কি চাই তুমি জানো ?"

—"জানি জানি, ভাল ক'রেই জানি। এগিয়ে যা, আরো খানিক এগিয়ে যা, তোরা আজ ঠিক পথই ধরেছিস। এই পথের শেষে আছে জঙ্গলে-ঢাকা ভাঙা বাড়ি। সেইখানেই তোদের মনের বাসনা পূর্ণ হবে।"

জয়ন্ত বললে, "তুমি তো অনেক কথাই জানো দেখছি। বন্ধু বলে পরিচয় দিচ্ছ, একবার বাইরে বেরিয়ে এস না।"

—"না, না, না। আমাকে দেখলে তোরা ভয় পাবি।"

—"বেশ, দেখা যাক তোমাকে দেখে আমরা ভয় পাই কিনা।" বলেই বিমল দুই হাতে ঝোপ ঠেলে জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করলে।

খানিক দূরের একটা ঝুপসী গাছের তলায় শুকনো পাতার শব্দ জাগল। দেখা গেল যেন একটা বিদ্যুৎগতিতে বিলীয়মান ছায়াকে। তারপর আর কিছুই দেখা বা শোনা গেল না।

ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বিমল হতাশ কণ্ঠে বললে, "নাঃ, লোকটার পাত্তা পাওয়া গেল না! সেও দেখছি এই বনের আর একটা মূর্তিমান রহস্য!"

কুমার বললে, "কিন্তু সে আমাদের উদ্দেশ্য জানলে কেমন ক'রে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না!"

বিমল বললে, "কেবল তাই নয়, বললে, তার আর আমাদের মনের বাসনা নাকি এক। এ কথারই বা অর্থ কি?"

—"লোকটা ছদ্মবেশী পুলিসের চর নয় তো?"

—"পুলিসের চর কখনো অমন পাগলের মতন অট্টহাসি হাসে? সে আমাদের দেখা দিতেও প্রস্তুত নয়। বলে কিনা তাকে দেখলে আমরা ভয় পাব। তার মূর্তি কি এমনই ভয়াবহ?" কথা কইতে কইতে সকলে অগ্রসর হচ্ছে। তারপর তারা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। সেখানে ছিল খানিকটা ঘাসজমি—তার আয়তন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বিঘার বেশি নয়। জমির একপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে একটি নদী, রৌদ্রকিরণে যার জলধারাকে মনে হচ্ছে হীরকধারার মতো। হয়তো এখান থেকে অনেক দূরে এই নদীরই উপরে আছে সেই সেতু, যার সাহায্যে তারা এসেছে এপারে।

ফাঁকা ঘাসজমির উপরটা শুঁকতে শুঁকতে বাঘা চলল ওধারের বনের দিকে। সকলে যখন বনের খুব কাছে এসে পড়েছে তখন হঠাৎ জাগল এক আকাশ-বাতাস-কাঁপানো বিকট চিৎকার: "হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার! সামনেই দুশমন—আর তাকে পালাতে দিও না, দিও না, দিও না!"

বিমলদের কাছে থেকে হাত-বিশ তফাতে, বনের ভিতর থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে এল একটা সুদীর্ঘ ও বিপুল মূর্তি।

সেই অদ্ভুত চিৎকার শুনে মূর্তিটা চমকে উঠে একবার পিছন ফিরে

তাকালে। তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে চেয়েই সে স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে পড়ল।

সে হচ্ছে অবলাকান্ত স্বয়ং।

একাদশ

জয়, বাঘার জয়

অবলাকান্তের স্তম্ভিত ভাবটা স্থায়ী হ'ল সেকেণ্ড দুই মাত্র।

তারপরেই সে আবার পিছন ফিরে মস্ত একলাফ মেরে ঢুকল গিয়ে বনের ভিতরে।

জয়ন্ত, বিমল ও কুমারও চোখের সুমুখে আচম্বিতে অবলাকান্তকে দেখে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। যার জন্যে এত হাঙ্গামা, সে যে নিজেই এমন অভাবিত রূপে তাদের কাছে একলা এসে দাঁড়াবে, এতটা আশা করতে পারে নি তারা।

এখন অবলাকান্ত আবার সরে পড়ে দেখে তাদের চটক গেল ভেঙে। তারাও প্রাণপণে ছুটল তার পিছনে পিছনে।

কুমার চিৎকার ক'রে বললে, "বাঘা, বাঘা! তুই আমাদেরও চেয়ে জোরে ছুটতে পারিস! ধর, ধর, অবলাকান্তের একখানা পা কামড়ে ধর!"

বাঘা এক দৌড়ে স্যাঁৎ ক'রে বনের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়ন্ত, বিমল ও কুমার বনে ঢুকে অবলাকান্ত বা বাঘা কারুকেই দেখতে পেলে না।

অল্পক্ষণ এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করবার পর বিমল বললে, "এখন কোনদিকে যাই? অবলাকান্ত আবার বুঝি আমাদের কলা দেখালে!"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু বাঘা এখনো নিশ্চয়ই তার পিছু ছাড়ে নি!"

কুমার বললে, "সেইটেই হচ্ছে ভাবনার কথা। বাঘা যে অবলা-

কান্তের পিছু ছাড়বে না, আমি তা জানি। কিন্তু বাঘা যদি তার আড্ডার কাছ পর্যন্ত যায়, তাহলে আর কি তাকে ফিরে পাব ?"

বিমল বললে, "আমরা সকলেই সশস্ত্র। যতদূর মনে হ'ল অবলাকান্ত নিরস্ত্র আর একাকী। এস, আমরা তিনজনে বনের তিনদিকে যাই—কোন-না-কোনদিকে নিশ্চয়ই অবলাকান্ত আর বাঘার সন্ধান পাওয়া যাবে। আপনি কি বলেন জয়ন্তবাবু ?"

জয়ন্ত বললে, "আমি কি ভাবছি জানেন ? কুকুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষ কখনো এতক্ষণ দৌড়তে পারে না। এতক্ষণে বাঘার অবলাকান্তকে ধরে ফেলবার কথা। তবু দুই প্রাণীর কারুরই সাড়া পাচ্ছি না কেন ?"

বিমল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, "ঠিক বলেছেন, এতক্ষণ এ-কথা তো ভেবে দেখি নি! আমরা সকলেই জানি, অবলাকান্ত হচ্ছে অসুরের মতন বলবান। তাহলে সে কি এর মধ্যেই বাঘাকে বধ ক'রে ফেলেছে ?"

কুমার করুণ স্বরে চেঁচিয়ে ডাকলে, "বাঘা, বাঘা, বাঘা! ওরে বাঘা রে!"

বেশ-খানিকটা তফাত থেকে বাঘার সাড়া ভেসে এল, "ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!"

কুমার সানন্দে নৃত্য ক'রে বলে উঠল, "আমার বাঘা বেঁচে আছে—আমার বাঘা বেঁচে আছে! বাঘা! বাঘা!"

—"ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!"

বিমল বললে, "বাঘা সাড়া দিচ্ছে বনের দক্ষিণদিক থেকে।"

কুমার ব্যস্ত ভাবে সেইদিকে ছুটতে ছুটতে বললে, "চল চল, দেখে আসি ব্যাপারটা কি ?"

কুমার দৌড়তে দৌড়তে ক্রমাগত "বাঘা বাঘা" ব'লে ডাক দিতে লাগল এবং বাঘাও ক্রমাগত "ঘেউ ঘেউ" ক'রে দিতে লাগল তার জবাব! বাঘার গলার আওয়াজ শুনেই তারা তিনজনেই অগ্রসর হতে লাগল। ক্রমেই বাঘার কণ্ঠস্বর এগিয়ে এল তাদের কাছ থেকে আরো কাছে।

তার অল্প পরেই দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। বাঘা চিৎকার করতে করতে উপর-পানে মুখ তুলে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণদিকে। এবং গাছের উপরে হচ্ছে ঘন-ঘন ডাল-পাতা নড়ে ওঠার শব্দ। সে-শব্দ একটা গাছের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে নেই, শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে একটা গাছ থেকে আর একটা গাছের দিকে।

বিমল হেসে ফেলে বললে, "কুমার, কাণ্ডটা কি বুঝছ তো? তোমার বাঘার দাঁতের আদর থেকে নিস্তার পাবার জন্যে অবলাকান্ত গিয়ে চড়েছে ঐ গাছের উপরে। এখানকার গাছগুলো ঠিক যেন দাঁড়িয়ে আছে পরস্পরকে জড়াজড়ি ক'রে, তাই সুমাত্রাদ্বীপের ওরাং-উটানের মতন অবলাকান্তও পালিয়ে যাচ্ছে ডাল ধরে একগাছ থেকে পাশের গাছের উপরে লাফ মারতে মারতে। অবলাকান্তকে আমি বাহাদুর উপাধি দিতে বাধ্য, কারণ আমিও বোধহয় বানরের ধর্ম এমন ক্ষিপ্র-গতিতে পালন করতে পারতুম না। আশ্চর্য মানুষ এই অবলাকান্ত!"

বাঘার সঙ্গে এগুতে এগুতে জয়ন্ত বললে, "কিন্তু এইবারে অবলা-কান্ত-বাবাজী যাবেন কোথায়? গাছের সার শেষ হয়ে এসেছে, তার-পরই দেখছি ফাঁকা জায়গা, আর তারপরেই সেই নদীটা। এইবারে শ্রীমানকে আমাদের বন্দুকের গুলি খেয়ে মাটির উপরে আছড়ে পড়তে হবে। শোনো অবলাকান্ত, এই বেলা ভালয় ভালয় আত্মসমর্পণ কর।"

অবলাকান্ত তখন শেষ-গাছের একটা উঁচু ডালের উপরে দাঁড়িয়ে। সে হিংস্র জন্তুর মতন গর্জন ক'রে বললে, "আত্মসমর্পণ? অবলাকান্ত জীবনে কখনো আত্মসমর্পণ করতে শেখে নি। ঐখানে দাঁড়িয়ে থাক তোরা ছুঁচো-ইঁদুরের দল। আমি এখনি গাছ থেকে নেমে তোদের প্রতি-আক্রমণ করব। মরি তো লড়তে লড়তেই মরব।" বলেই সে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে শেষ-গাছের উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল। তার অভাবিত নির্ভীকতা দেখে জয়ন্ত, বিমল ও কুমার হতভম্বের মতো অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকটা নিচে নেমেই অবলাকান্ত এদিকে আসতে আসতে হঠাৎ ফিরে মাথার উপরকার একটা ডাল ধরে এবং পায়ের তলাকার একটা ডালের উপর দিয়ে সেইরকম অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতিতে অন্য দিকে চলে গিয়ে লাফ মেরে মাটির উপরে গিয়ে পড়ল। তারপর ঝড়ের মতন ছুটে চলল নদীর দিকে। বাঘা কিন্তু শত্রুর দিকে তার দৃষ্টি রেখেছিল সম্পূর্ণ জাগ্রত। সেও তীরের মতন ছুটল অবলাকান্তের পিছনে পিছনে! তারপর অবলাকান্ত প্রায় যখন নদীর কাছে গিয়ে পড়েছে, বাঘা তখন তার উপরে লাফিয়ে পড়ে শত্রুর একখানা পা প্রাণপণে কামড়ে ধরলে!

বিপুলবপু অবলাকান্ত বাঘাকে কিন্তু গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সে পা-সুদ্ধ বাঘাকে নিয়ে টানতে টানতে এগিয়ে গিয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা করলে!

বিমল চিৎকার ক'রে বললে, "গুলি কর! অবলাকান্তের পা লক্ষ্য ক'রে গুলি কর! 'জেরিণার কণ্ঠহার' মামলায় অবলাকান্ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আমাদের ফাঁকি দিয়েছিল! 'সুন্দরবনের রক্তপাগল' মামলাতেও মোটরবোট থেকে ও নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আর একবার সরে পড়েছিল! এবারও সে নদীকেই অবলম্বন করতে চায়! গুলি কর, গুলি কর, গুলি কর!"

বিমল, কুমার ও জয়ন্ত তখনি বন্দুক তুলে ধরলে। কিন্তু তারপর চোখের নিমেষেই ঘটল এক কল্পনাতীত ঘটনা!

যেন নদী-তীরের মাটি ফুঁড়েই আবির্ভূত হ'ল এক অমানুষিক মূর্তি! উচ্চতায় সে প্রায় সাড়ে ছয়-ফুট, কিন্তু দেহ তার ঠিক মাংসহীন কঙ্কালের মতন শীর্ণ! তার মাথা থেকে লটপট ও ছটফট করতে করতে বিষাক্ত সাপের মতন উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে দীর্ঘ দীর্ঘ তৈলহীন রুক্ষ জটা! এবং দুই-চক্ষে তার জ্বলে জ্বলে উঠছে অসীম নিষ্ঠুরতার অগ্নিশিখা! প্রায়-উলঙ্গ তার দেহ, কোমরে তার ঝুলছে কেবল এক-টুকরো অতি-মলিন ন্যাকড়া! সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে বিমল, কুমার ও জয়ন্ত এমন স্তম্ভিত হয়ে গেল যে, হাতের বন্দুক হাতেই রেখে তারা বসে রইল

নিশ্চল মূর্তির মতন।

সেই প্রেত-মূর্তিকে দেখেই অবলাকান্ত সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। কারণ ছিনে-জেঁাক বাঘা তখনো তাকে ত্যাগ করে নি, সে নিজের দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে শত্রুর পা ধরে আকর্ষণ করতে লাগল।

প্রেত-মূর্তিটা একটা দুঃস্বপ্নের ঝটিকার মতন অবলাকান্তের উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে বিদ্যুৎ খেলিয়ে তার হাতের ছোরা উপরে উঠল এবং চকিতে অবলাকান্তের বুকের উপরে গিয়ে নামল। এদিকে-ওদিকে বুকের রক্ত ছিটিয়ে বিষম একটা আর্তনাদ ক'রে অবলাকান্ত পড়ল মাটির উপরে লুটিয়ে।

তার পাশে গিয়ে সেই প্রেতের মতন মূর্তি সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড কণ্ঠে বললে, "আমাকে চিনতে পারছিস অবলাকান্ত? চার বছর আগে তুই তোর ডাকাতের দল নিয়ে আমার বাড়ির উপরে হানা দিয়েছিলি! তুই আমার স্ত্রী, দুই ছেলে আর মেয়েছে খুন ক'রে আমার বংশে বাতি দিতে আর কারুকে রাখিস নি! সেদিন কোনগতিকে প্রাণ নিয়ে আমি পালিয়ে যেতে পেরেছিলুম! কিন্তু আমি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাই নি, আমি পালিয়ে গিয়েছিলুম প্রতিশোধ নেবার জন্যে বেঁচে থাকব ব'লে! বন্যজন্তুর মতন তুই বনে বনে থাকিস, আমিও তোর পিছনে-পিছনে ছায়ার মতন ঘুরে হইছি অমানুষ বন্যজন্তুরই মতন। চিনতে পারিস? তুই আজ আমাকে চিনতে পারিস কি? হা-হা-হা-হা-হা-হা! প্রতিশোধ নিয়েছি, আজ আমি প্রতিশোধ নিয়েছি!"

বাঘা তখনো অবলাকান্তের পা ছাড়ে নি এবং সে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়েও তখনো মরে নি। সেই অবস্থাতেই সে হঠাৎ উঠে বসল এবং প্রাণপণে নিজের দুই বলিষ্ঠ বাহু জড়িয়ে প্রেত-মূর্তিকে ধরে নিজের কাছে টেনে মাটির উপরে আছড়ে ফেললে। এবং তারপর সজোরে চেপে ধরলে তার কণ্ঠদেশ! কিন্তু কণ্ঠ যখন তার রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তখনো সেই মূর্তিটা অবলাকান্তের দেহের উপরে চকচকে ছোরার আঘাত করতে

লাগল বারংবার। তারপর দুই মূর্তি নদীতীরে প'ড়ে রইল একেবারে নিশ্চেষ্ট নির্জীবের মতন।

সর্বাগ্রে কুমার গিয়ে বললে, "বাঘা, তুই ওর পা ছেড়ে দে। তুই কাকে কামড়ে আছিস ? তোর শত্রু মরে গেছে!"

বাঘা তার শত্রুকে ত্যাগ ক'রে প্রভুর দিকে রক্তাক্ত মুখ তুলে সানন্দে ও সবেগে লাঙ্গুল আন্দোলন করতে লাগল।

বিমল কাতর কণ্ঠে বললে, "অবলাকান্তের মতন শরীরী পাপ পৃথিবী থেকে বিদেয় হ'ল ব'লে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হই নি। কিন্তু এই হতভাগ্য উন্মত্তের জন্যে আমার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। অবলাকান্ত মরে গিয়েও দুই হাতে ওর গলা চেপে রয়েছে। বেচারিকে ওর হাত ছাড়িয়ে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখুন তো জয়ন্তবাবু, ও এখনো বেঁচে আছে কিনা ?"

জয়ন্ত সেই শীর্ণ-বিশীর্ণ প্রায়-নগ্ন কঙ্কালমূর্তিকে অবলাকান্তের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "এ আর বেঁচে নেই বিমলবাবু! প্রতিশোধ নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দানবের কবলে এর মৃত্যু হয়েছে! এই আমার খেদ রইল যে, শেষ পর্যন্ত অবলাকান্তকে ফাঁসিকাঠে দোলাতে পারলুম না!"

বিমল বললে, "মানুষের সব আশা পূর্ণ হয় না জয়ন্তবাবু! কিন্তু অবলাকান্ত আজ যে এই দুনিয়ায় নেই, পৃথিবীর পক্ষে এটা কি একটা সান্ত্বনার কথা নয় ?"

কুমার সগর্বে বললে, "বাঘা, আমার বাঘা! অবলাকান্তকে কে ধরতে পারত আমার বাঘা না থাকলে ?"

বিমল হেঁট হয়ে বাঘাকে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে বললে, "ঠিক কথাই তো! বলুন জয়ন্তবাবু—জয়, বাঘার জয়।"

জয়ন্ত সাদরে বাঘার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললে, "এ-মামলায় বাঘাকেই তো বাহাদুর বলে মানতে হবে। বাঘা না থাকলে আজ আমরা অবলাকান্তের আস্তানার কাছে আসতেই পারতুম না।

বাঘা না থাকলে অবলাকান্ত বৃক্ষের উপরে আরোহণ ক'রে আমাদের চোখের সামনে ধরা দিতে বাধ্য হ'ত না। আর বাঘা অবলাকান্তকে কামড়ে না থাকলে, বোধহয় সে ঐ প্রেত-মূর্তিকে ফাঁকি দিয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আগেকার মতো আজকেও আমাদের ফাঁকি দিয়ে সাঁতরে পালিয়ে যেত! অতএব—জয়, বাঘার জয়! এ-মামলায় সব-চেয়ে বড় গোয়েন্দার কাজ করেছে এই সারমেয়-অবতার বাঘাই! সুতরাং আবার বলি—জয়, বাঘার জয়!"

●

হিমালয়ের ভয়ঙ্কর

এক

কার পা

কুমার সবে চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুকটি দিয়েছে, এমন সময়ে বিমল হঠাৎ ঝড়ের মতন ঘরের ভিতরে ঢুকে বলে উঠল, "কুমার, কুমার! —শীগগির, শীগগির কর! ওঠ, জামা-কাপড় ছেড়ে পোঁটলা-পুঁটলি গুছিয়ে নাও!"

কুমার হতভম্বের মতন চায়ের পেয়ালাটি টেবিলের উপরে রেখে বললে, "ব্যাপার কি বিমল?"

—"বেশি কথা বলবার সময় নেই! বিনয়বাবু তাঁর মেয়ে মৃণুকে নিয়ে দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গেছেন, জানো তো? হঠাৎ আজ সকালে তাঁর এক জরুরী টেলিগ্রাম পেয়েছি। তাঁর মেয়েকে কে বা কারা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। আর এর ভেতরে নাকি গভীর রহস্য আছে। অবিলম্বে আমাদের সাহায্যের দরকার।...এ কথা শুনে কি নিশ্চিন্ত থাকা যায়? দার্জিলিংয়ের ট্রেন ছাড়তে আর এক ঘণ্টা দেরি। আমি প্রস্তুত, আমার মোট-ঘাট নিয়ে রামহরিও প্রস্তুত হয়ে তোমার বাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছে, এখন তুমিও প্রস্তুত হয়ে নাও। ওঠ, ওঠ, আর দেরি নয়!"

কুমার একলাফে চেয়ার ত্যাগ ক'রে বললে, "আমাদের সঙ্গে বাঘাও যাবে তো?"

—"তা আর বলতে! হয়তো তার সাহায্যেরও দরকার হবে!"

জিনিস-পত্তর গুছিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে কুমারের আধ-ঘণ্টাও লাগল না! সবাই শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে ছুটল!

দার্জিলিং। দূরে হিমালয়ের বিপুল দেহ বিরাট এক তুষার দানবের মতন আকাশে অনেকখানি আচ্ছন্ন ক'রে আছে। কিন্তু তখন এ-সব লক্ষ্য

করবার মতো মনের অবস্থা কারুরই ছিল না।

একটা গোল টেবিলের ধারে বসে আছে বিমল ও কুমার। ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে রামহরি, এবং ঘরের ভিতরে গম্ভীর মুখে পায়চারি করছেন বিনয়বাবু।

যাঁরা "যকের ধন" প্রভৃতি উপন্যাস পড়েছেন, বিমল, কুমার ও রামহরিকে তাঁরা নিশ্চয়ই চেনেন। আর যাঁরা "মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন" ও "মায়াকানন" প্রভৃতি উপন্যাস পাঠ করেছেন, তাঁদের কাছে নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সরলপ্রাণ বিপুলবক্ষ ও শক্তিমান এই বিনয়বাবুর নতুন পরিচয় বোধহয় আর দিতে হবে না।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, "তারপর বিনয়বাবু?"

বিনয়বাবু বললেন, "মৃণু বেড়াতে গিয়েছিল বৈকালে। সন্ধ্যে থেকে রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজির পরেও তাকে না পেয়ে মনে মনে ভাবলুম, হয়তো এতক্ষণ সে বাসায় ফিরে এসেছে। কিন্তু বাসায় ফিরে দেখি, মৃণু তখনো আসে নি। লোকজন নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লুম, সারারাত ধরে তাকে পথে-বিপথে সর্বত্র কোথাও খুঁজতে বাকি রাখলুম না, তারপর সকালবেলায় আধ-মরার মতন আবার শূন্য বাসায় ফিরে এলুম। বিমল! কুমার! তোমরা জান তো, মৃণু আমার একমাত্র সন্তান। তার বয়স হ'ল প্রায় ষোলো বৎসর, কিন্তু তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না বলে এখনো তার বিয়ে দিই নি। তার মা বেঁচে নেই, আমিই তার সব। তাকে ছেড়ে আমিও একদণ্ড থাকতে পারি না। আমার এই আদরের মৃণুকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে, এখন আমি কেমন ক'রে বেঁচে থাকব?"—বলতে বলতে বিনয়বাবুর দুই চোখ কান্নার জলে ভরে উঠল।

কুমার বললে, "বিনয়বাবু, স্থির হোন। মৃণুকে যে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে, আপনি এ-রকম সন্দেহ করছেন কেন?"

বিনয়বাবু বললেন, "সন্দেহের কারণ আছে কুমার! মৃণু হারিয়ে যাবার পর দুদিনে এখানকার আরও তিনজন লোক হারিয়ে গেছে।"

বিমল বললে, "তারাও কি স্ত্রীলোক?"

—"না, পুরুষ। একজন হচ্ছে সাহেব, বাকি দুজন পাহাড়ী। তাদের অন্তর্ধানও অত্যন্ত রহস্যজনক। অনেক খোঁজ ক'রেও পুলিস কোন সূত্রই আবিষ্কার করতে পারে নি। কিন্তু আমি একটা সূত্র আবিষ্কার করেছি।"

বিমল ও কুমার একসঙ্গে বলে উঠল, "কি আবিষ্কার করেছেন বিনয়বাবু?"

—"শহরের বাইরে পাহাড়ের এক জঙ্গল-ভরা শুঁড়ি-পথের সামনে মৃণুর একপাটি জুতো কুড়িয়ে পেয়েছি। সেখানে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও জুতোর অন্য পাটি আর পাই নি। এথেকে কি বুঝব? জুতোর অন্য পাটি মৃণুর পায়েই আছে। ইচ্ছে ক'রে একপাটি জুতো খুলে আর এক পায়ে জুতো পরে কেউ এই পাহাড়ে-পথে হাঁটে না। মৃণুকে কেউ বা কারা নিশ্চয়ই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে-হিঁচড়ে বা ধরাধরি ক'রে বয়ে নিয়ে গিয়েছে, আর সেই সময়েই ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে তার পা থেকে এক-পাটি জুতো খুলে পড়ে গিয়েছে।"

বিমল বললে, "বিনয়বাবু, যে-জায়গায় আপনি মৃণুর জুতো কুড়িয়ে পেয়েছেন, সে-জায়গাটা আমাদের একবার দেখাতে পারেন?"

—"কেন পারব না? কিন্তু সেখানে গিয়ে কোনই লাভ নেই! বিশ-জন লোক নিয়ে সেখানকার প্রতি-ইঞ্চি জায়গা আমি খুঁজে দেখেছি, আমার পর পুলিসও খুঁজতে বাকি রাখে নি। তবু—"

বিমল বাধা দিয়ে বললে, "তবু আমরা আর একবার সে জায়গাটা দেখব। চলুন বিনয়বাবু, এস কুমার!"

বিমলের আগ্রহ দেখে বিনয়বাবু কিছুমাত্র উৎসাহিত হলেন না, কারণ তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, যেখানে যাওয়া হচ্ছে সেখানে গিয়ে আর খোঁজাখুঁজি করা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু মুখে কিছু না বলে সকলকে নিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। বাঘাও বাসায় একলাটি শিকলিতে বাঁধা থাকতে রাজি হ'ল না, কাজেই কুমার তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল।

ঘণ্টা-দুয়েক পথ চলার পর সকলে যেখানে এসে হাজির হ'ল,

পাহাড়ের সে-জায়গাটা ভয়ানক নির্জন। একটা শুঁড়ি-পথ জঙ্গলের বুক ফুঁড়ে ভিতরে ঢুকে গেছে, তারই সুমুখে দাঁড়িয়ে বিনয়বাবু বললেন, "এখানেই মৃণুর একপাটি জুতো পাওয়া যায়।"

বিমল অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করলে, কিন্তু নতুন কিছুই আবিষ্কার করতে পারলে না।

কুমার বললে, "যদি কেউ মৃণুকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে ঐ শুঁড়ি-পথের ভেতর দিয়েই হয়তো সে গেছে।"

বিনয়বাবু বললেন, "ও-পথের সমস্তই আমরা বার বার খুঁজে দেখেছি, কিন্তু কিছুই পাই নি।"

এমন সময়ে জঙ্গলের ভিতরে খানিক তফাত থেকে বাঘার ঘন ঘন চিৎকার শোনা গেল।

কুমার তার বাঘার ভাষা বুঝত। সে ব্যস্ত হয়ে বললে, "বাঘা নিশ্চয়ই সন্দেহজনক কিছু দেখেছে। বাঘা! বাঘা!

তার ডাক শুনে বাঘা একটু পরেই জঙ্গলের ভিতর থেকে উত্তেজিত ভাবে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এল। তারপর কুমারের মুখের পানে চেয়ে ঘেউ ঘেউ ক'রে একবার ডাকে, আবার জঙ্গলের ভিতরে ছুটে যায়, আবার বেরিয়ে আসে, ল্যাজ নেড়ে ডাকে, আর জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢোকে।

কুমার বললে, "বিনয়বাবু, বুঝতে পারছেন কি, বাঘা আমাদের জঙ্গলের ভেতরে যেতে বলছে?"

বিমল বললে, "বাঘাকে আমিও জানি, ওকে কুকুর বলে অবহেলা করলে আমরাই হয়তো ঠকব। চল, ওর সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া যাক।"

জঙ্গলের ঝোপঝাপ ঠেলে সকলেই বাঘার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হ'ল। যেতে যেতে বিমল লক্ষ্য করলে, জঙ্গলের অনেক ঝোপঝাপ যেন কারা দু-হাতে উপড়ে ফেলেছে, যেন একদল মত্তহস্তী এই জঙ্গল ভেদ ক'রে এগিয়ে গিয়েছে। বিমল শুধু লক্ষ্যই করলে, কারুকে কিছু বললে না।

বাঘাকে অনুসরণ ক'রে আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়েই দেখা গেল, একটা ঝোপের পাশে মানুষের এক মৃতদেহ পড়ে রয়েছে!

সে দেহ এক ভুটিয়ার। তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত, মাথাটাও ভীষণভাবে ফেটে গিয়েছে আর তার চারিপাশে রক্তের স্রোত জমাট হয়ে রয়েছে!

বিনয়বাবু স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "কি আশ্চর্য! জঙ্গলের এখানটাও তো আমরা খুঁজেছি, কিন্তু তখন তো এ দেহটা এখানে ছিল না!"

কুমার বললে, "হয়তো এ ঘটনা ঘটেছে তারপরে! দেখছেন না, ওর দেহ থেকে এখনো রক্ত ঝরছে!"

হঠাৎ দেহটা একটু নড়ে উঠল!

বিমল তাড়াতাড়ি তার পাশে গিয়ে বসে পড়ে বললে, "এ যে এখনো বেঁচে আছে!"

আহত ব্যক্তি ভুটিয়া ভাষায় যন্ত্রণা-ভরা খুব মৃদু স্বরে বললে, "একটু জল।"

বিমলের 'ফ্লাস্কে' জল ছিল। 'ফ্লাস্কে'র ছিপি খুলতে খুলতে সে শুধোলে, "কে তোমার এমন দশা করলে?"

দারুণ আতঙ্কে শিউরে উঠে সে খালি বললে, "ভূত—ভূত!...জল!"

বিমল তার মুখে জল ঢেলে দিতে গেল, কিন্তু সে জল হতভাগ্যের গলা দিয়ে গলল না, তার আগেই তার মৃত্যু হ'ল।

কুমার হঠাৎ ভীত ভাবে সবিস্ময়ে ব'লে উঠল, "বিমল! দেখ, দেখ!"

জমাট রক্তের উপরে একটা প্রকাণ্ড পায়ের দাগ! সে দাগ অবিকল মানুষের পায়ের দাগের মতো—কিন্তু লম্বায় তা প্রায় আড়াই ফুট এবং চওড়াতেও এক ফুটেরও বেশি! মানুষের পায়ের দাগ এত-বড় হওয়া কি সম্ভব? যার পা এমন, তার দেহ কেমনধারা?

সকলে বিস্ফারিত নেত্রে সেই বিষম পদচিহ্নের দিকে তাকিয়ে কাঠের মতন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল!

দুই
বাবা মহাদেবের চ্যালা

সকলের আগে কথা কইলেন বিনয়বাবু। ভয়ার্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, "বিমল! কুমার! একি অসম্ভব ব্যাপার! আমরা দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো?"

রামহরি আড়ষ্টভাবে মত প্রকাশ করলে. এ মস্তবড় একটা বিদকুটে ভূতের পায়ের দাগ না হয়ে যায় না!

কুমার বললে, "বিমল, আমরা কি আবার কোন ঘটোৎকচের* পাল্লায় পড়লুম? মানুষের পায়ের দাগ তো এত-বড় হতেই পারে না!"

পায়ের দাগটা ভাল ক'রে পরীক্ষা করতে করতে বিমল বললে,

* 'আবার যকের ধন' দ্রষ্টব্য।

মানুষের পায়ের দাগ এত-বড় হওয়া সম্ভব নয় বটে কিন্তু এ দাগ যে অমানুষের পায়েরও নয়, এটা আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি ”

বিনয়বাবু বললেন, “কি প্রমাণ দেখে তুমি এ কথা বলছ ?”

বিমল মৃত ভুটিয়ার একখানা মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে নিয়ে বললে, “এর হাতের মুঠোর দিকে তাকিয়ে দেখুন !”

সকলে দেখলে, তার মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে একগোছা চুল বেরিয়ে পড়েছে !

বিনয়বাবু চুলগুলো লক্ষ্য ক'রে দেখে বললেন, “এ কার মাথার চুল ? এত লম্বা, আর এত মোটা ?”

বিমল বললে, “এ চুল যে ঐ ভুটিয়ার মাথার চুল নয়, সেটা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তবে কেমন ক'রে ও চুলগুলো ওর হাতের মুঠোর মধ্যে এল ?”

কুমার বললে, “যার আক্রমণে ও-বেচারির ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে, এগুলো নিশ্চয়ই তার মাথার চুল ।”

বিমল বললে, “আমারও সেই মত। শত্রুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করবার সময়ে ভুটিয়াটা নিশ্চয়ই তার চুল মুঠো ক'রে ধরেছিল ।...দেখুন বিনয়-বাবু, চুলগুলো ঠিক মানুষেরই মাথার চুলের মতো, কিন্তু মানুষের মাথার চুল এত মোটা হয় না। এই পায়ের দাগ আর এই মাথার চুল দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই ভুটিয়াকে যে আক্রমণ করেছিল, লম্বায় সে হয়তো পনেরো-ষোলো ফুট উঁচু !”

কুমার হতভম্বের মতো বললে, “বায়োস্কোপের কিং কঙ্ কি শেষটা হিমালয়ে এসে দেখা দিল ?”

বিমল বললে, “আরে কিং কঙ্ তো গাঁজাখুরি গল্পের একটা দানব গরিলা! আর আমরা এখানে সত্যিকারের যে পায়ের দাগ দেখ্‌ছি, এটা তো গরিলার নয়—কোন দানব বা দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড মানুষের পায়ের দাগ!...এখন কথা হচ্ছে, পৃথিবীতে এমন মানুষ কি থাকতে পারে ?”

কুমার বললে, "হিমালয়ের ভিতরে যদি এমন কোন অজানা জন্তু থাকে,—যার পায়ের দাগ আর মাথা বা গায়ের চুল মানুষের মতো?"

বিনয়বাবু বললেন, "হয়তো ও মাথার চুল আর পায়ের দাগ জাল ক'রে কেউ আমাদের ধাঁধায় ফেলবার বা ভয় দেখাবার ফিকিরে আছে।"

বিমল বললে, "আচ্ছা, এই চুলগুলো আপাতত আমি তো নিয়ে যাই, পরে কোন অভিজ্ঞ লোকের সাহায্যে পরীক্ষা করলেই সব বোঝা যাবে।"

রামহরি বারবার ঘাড় নেড়ে বলতে লাগল, "এ-সব কোন কথার মতো কথাই নয়,—ঐ ভুটিয়াটা মরবার সময়ে যা বলেছিল তাই হচ্ছে আসল কথা! এ-সব হচ্ছে ভূতের কাণ্ডকারখানা!"

বিনয়বাবু করুণ স্বরে বললে, "আমার মৃণু কি আর বেঁচে আছে?"

বিমল তাড়াতাড়ি তাঁর হাত চেপে ধরে বললে, "চুপ!"

তখন পাহাড়ের বুকের ভিতরে সন্ধ্যা নেমে আসছে,—দূরের দৃশ্য ঝাপসা হয়ে গেছে। পাখিরা যে যার বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, চারিদিক স্তব্ধ।

সেই স্তব্ধতার মধ্যে অজানা শব্দ হচ্ছে—ধুপ্‌, ধুপ্‌, ধুপ্‌, ধুপ্‌। কারা যেন খুব ভারী পা ফেলে এগিয়ে আসছে।

বাঘা কান খাড়া ক'রে সব শুনে রেগে ধমক দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমারের এক থাবড়া খেয়ে একেবারে চুপ মেরে গেল।

বিমল ব্যস্ত হয়ে বললে, "শীগগির, লুকিয়ে পড়ুন—কিন্তু এখানে নয়, অন্য কোথাও।"

বিমলেরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে সবাই জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। আরো একটু এগিয়েই দেখা গেল, ছোট গুহার মতন একটা অন্ধকার গর্ত,—হামাগুড়ি না দিলে তার মধ্যে ঢোকা যায় না এবং তার মধ্যে অন্য কোন হিংস্র জানোয়ার থাকাও অসম্ভব নয়! কিন্তু উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সে-সব কথা কেউ মনেও আনলে না, কোন রকমে গুড়ি মেরে একে একে সকলেই সেই গর্তের ভিতরে

ঢুকে পড়ল।

ভয় পায় নি কেবল বাঘা, তার ঘন ঘন ল্যাজ নাড়া দেখেই সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। সে বোধ হয় ভাবছিল, এ এক মস্ত মজার খেলা!

গর্তের মুখের দিকে মুখ রেখে বিমল হুমড়ি খেয়ে বসে রইল—সেই জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে বিমলের দৃষ্টিকে অন্ধ ক'রে দিলে। কান পেতেও সেই ধুপধুপুনি শব্দ আর কেউ শুনতে পেলে না।

বুনো হাওয়া গাছে গাছে দোল খেয়ে গোলমাল করছিল, তাছাড়া আর কোন শব্দ নেই। সেই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া গর্তের ভিতরে ঢুকে সকলের গায়ে যেন বরফের ছুরি মারতে লাগল।

কুমার মৃদুস্বরে বললে, "বোধ হয় আর কোন বিপদের ভয় নেই,—এইবারে বাইরে বেরিয়ে পড়া যাক!"

ঠিক যেন তার কথার প্রতিবাদ ক'রেই খানিক তফাত থেকে কে অট্টহাসি হেসে উঠল। খুব বড় গ্রামোফোনের হর্ণে মুখ রেখে অট্টহাসি করলে যেমন জোর আওয়াজ হয়, সে-হাসির শব্দ যেন সেই রকম,—কিন্তু তার চেয়েও শুনতে ঢের বেশি ভীষণ!

সে হাসি থামতে-না-থামতে আরো পাঁচ-ছয়টা বিরাট কণ্ঠে তেমনি ভয়ানক অট্টহাসের স্রোত ছুটে গেল! সে যেন মহা মহাদানবের হাসি, মানুষের কান এমন হাসি কোনদিনই শোনে নি। যাদের হাসি এমন, তাদের চেহারা কেমন?

হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে আগুনের আভা এবং মাঝে মাঝে তার শিখাও দেখা গেল।

বিমল চুপিচুপি বললে, "আগুন জ্বেলে কারা ওখানে কি করছে?"

রামহরি বললে, "ভূতেরা আগুন পোয়াচ্ছে!"

বিমল বললে, "লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখে আসব নাকি?"

রামহরি টপ ক'রে তার হাত ধরে বললে, "থাক, অত শখে আর কাজ নেই।"

মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক কণ্ঠের অদ্ভুত চিৎকার জেগে জেগে উঠে সেই পাহাড়ে-রাত্রির তন্দ্রা ভেঙ্গে দিতে লাগল। সে রহস্যময় চিৎকারের মধ্যে এমন একটা হিংসার ভাব ছিল যে, শুনলেই বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। সে যে কাদের কণ্ঠস্বর তা জানবার বা বোঝবার যো ছিল না বটে, কিন্তু সে চিৎকার যে মানুষের নয়, এটুকু বুঝতে বিলম্ব হয় না।

বিমল বললে, "আ-হা-হা-হা, থাকত আমার বন্দুকটা সঙ্গে, তাহলে ওদের চালাকি এখনি বার ক'রে দিতুম।"

কুমার বললে, "আরে রাখো তোমার বন্দুকের কথা। কাল সারা-রাত কেটেছে ট্রেনে—আমার এখন ক্ষিদে পেয়েছে, আমার এখন ঘুম পেয়েছে।"

বিমল বললে, "ও পেটের আর ঘুমের কথা কালকে ভেবো, আজকের রাতটা দেখছি এখানেই কাটাতে হবে।"

সদ্যজাগা সূর্য যখন হিমালয়ের শিখরে শিখরে সোনার মুকুট বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সেদিকে দৃষ্টি দেবার অবসর বিমলদের মোটেই ছিল না।

মাঝ-রাতের পরেই জঙ্গলের আগুন নিবে ও সেই আশ্চর্য চিৎকার থেমে গিয়েছিল এবং তখন থেকেই গর্ত থেকে বেরুবার জন্যে বিমল ও কুমার ছটফটিয়ে সারা হচ্ছিল, কিন্তু বিনয়বাবু ও রামহরির সজাগ পাহারায় এতক্ষণ তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নি।

এখন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তারা এক এক লাফে গর্তের বাইরে এসে পড়ল এবং আবার স্বাধীনতা পেয়ে তাদের চেয়েও কম খুশি হ'ল না বাঘা, কারণ যেখানে আগুন জ্বলছে ও চিৎকার হচ্ছে সেখানটায় একবার ঘুরে আসবার জন্যে তারও মন কাল সারারাত আনচান করেছে। তাই গর্ত থেকে বেরিয়েই বাঘা সেই জঙ্গলের ভিতরে ছুট দিলে এবং

তার পিছনে পিছনে ছুটল বিমল ও কুমার।

কাল যেখান থেকে তারা পালিয়ে এসেছে, আজ তারা প্রথমেই সেইখানে গিয়ে হাজির হ'ল। দেখেই বোঝা গেল, কাঠ-কাটরা এনে কারা সেখানে সত্যসত্যই আগুন জ্বেলেছিল। ভস্মের স্তূপ থেকে তখনো অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

মাটির উপরেও ইতস্তত ছাই ছড়ানো রয়েছে। সেইদিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে বিমল বললে, "দেখ।"

কুমার অবাক হয়ে দেখলে, সেখানকার ছাইগাদার উপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তেমনি মানুষের-মতন-অমানুষের পায়ের দাগ রয়েছে অনেক-গুলো।

বাঘা সেই এক-একটা পায়ের দাগ শোঁকে, আর রেগে গরগর ক'রে ওঠে। তারও বুঝতে দেরি লাগল না যে, এ-সব পায়ের দাগ রেখে গেছে যারা, তারা তাদের বন্ধু নয়।

ততক্ষণে বিনয়বাবুর সঙ্গে রামহরিও সেখানে এসে হাজির হয়েছে। বিমলকে ডেকে সে গম্ভীর ভাবে বললে, "খোকাবাবু, আমার কথা শোনো। হিমালয় হচ্ছে বাবা মহাদেবের ঠাঁই। বাবা মহাদেব হচ্ছেন ভূতেদের কর্তা। এ-জায়গাটা হচ্ছে ভূতপ্রেতদের আড্ডা। যা দেখবার, সবই তো দেখা হ'ল—আর এখানে গোলমাল কোরো না, লক্ষ্মীছেলের মতো ভালয় ভালয় বাসায় ফিরে চল।"

বিনয়বাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, "এ কী ব্যাপার! সেই ভুটিয়াটার লাশ কোথায় গেল?"

এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে কুমার বললে, "নিশ্চয় কোন জন্তু-টন্তু টেনে নিয়ে গিয়েছে।"

রামহরি বললে, "ঐ যে, তার জামা আর ইজের ঐখানে পড়ে রয়েছে।"

বিমল একটা গাছের ভাঙা ডাল দিয়ে ছাইগাদা নাড়তে নাড়তে

বললে, "কুমার, কোন জন্তু-টন্তুতে সে লাশ টেনে নিয়ে যায় নি, সে লাশ কোথায় গেছে তা যদি জানতে চাও তবে এই ছাইগাদার দিকে নজর দাও।"

—"ও কি! ছাইয়ের ভেতরে অত হাড়ের টুকরো এল কোথা থেকে?"

—"হ্যাঁ, আমারও কথা হচ্ছে তাই। কুমার, কাল রাতে যারা এখানে এসেছিল, তারা সেই ভুটিয়াটার দেহ আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলেছে।"

রামহরি ভয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগল।

তিন

রামহরির শাস্ত্র-বচন

সকলে স্তম্ভিতভাবে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। কেবল বাঘা পায়ের দাগগুলো শুঁকতে শুঁকতে অজ্ঞাত শত্রুদের বিরুদ্ধে তখনো কুক্কুর-ভাষায় গালাগালি বৃষ্টি করছিল।

বিমল তার কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটি ক্যামেরা বার ক'রে বললে, "এই আশ্চর্য পায়ের দাগের একট মাপ আর ফটো নিয়ে রাখা ভাল। পরে দরকার হবে।"

বিনয়বাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, "আমাদের আর এখানে অপেক্ষা করবার দরকার নেই। যা দেখছি তাইই যথেষ্ট! আমি বেশ বুঝতে পারছি, মৃণুকে খুঁজে আর কোনই লাভ নেই—নরখাদক রাক্ষসদের কবলে পড়ে সে-অভাগীর প্রাণ—" বলতে বলতে তাঁর গলার আওয়াজ ভারী হয়ে এল, তিনি আর কথা কইতে পারলেন না।

কুমার বললে, "বিনয়বাবু, আপনার মতন বুদ্ধিমান লোকের এত শীঘ্র

বিচলিত হওয়া উচিত নয়। মৃণু যে এই নরখাদকদের পাল্লায় পড়েছে, এমন কোন প্রমাণ নেই। আমার বিশ্বাস, আমরা তাকে ঠিক খুঁজে বার করতে পারব।”

বিনয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললেন, “তোমার কথাই সত্য হোক।”

বিমল বললে, “বিনয়বাবু, আমরা যখন ময়নামতীর মায়াকাননে গিয়ে পড়েছিলুম, তখন দেখেছিলুম পৃথিবীর আদিম জন্তুদের বিষয়ে আপনার অনেক পড়া-শোনা আছে। আপনি বানর-জাতীয় কোন দানবের কথা বলতে পারেন—আসলে যারা বানরও নয়, মানুষও নয়?”

বিনয়বাবু বললেন, “বানরদের মধ্যে দানব বলা যায় গরিলাদের। কিন্তু তারা বড়-জাতের বানরই। পণ্ডিতরা বহুকাল ধরে বানর আর মানুষের মাঝামাঝি যে-জীবকে অন্বেষণ করছেন, গরিলারা তা নয়। তবে সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকায় এক অদ্ভুত জীবের খোঁজ পাওয়া গেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় টারা (“Tarra”) নামে এক নদী আছে। সেই নদীর ধারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দুটো মস্তবড় বানর-জাতীয় জীব হঠাৎ একদল মানুষকে আক্রমণ করে। তাদের একটা মদ্দা, আর একটা মাদী। মানুষের দল আক্রান্ত হয়ে গুলি ক'রে মাদীটাকে মেরে ফেলে, মদ্দাটা পালিয়ে যায়। মাদীটা পাঁচফুটের চেয়েও বেশি লম্বা! সুতরাং আন্দাজ করা যেতে পারে যে, মদ্দাটা হয়তো মাথায় ছয়ফুট উঁচু হবে। আমি মৃত জীবটার ফোটো দেখেছি। তাকে কতকটা বানর আর মানুষের মাঝামাঝি জীব বলা চলে। কিন্তু তুমি এ-সব কথা জানতে চাইছ কেন? তোমার কি সন্দেহ হয়েছে যে, ঐ পায়ের দাগগুলো সেই রকম কোন জীবের?”

বিমল বললে, “সন্দেহ তো অনেক রকমই হচ্ছে, কিন্তু কোনই হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। এ পায়ের দাগ গরিলার মতো কোন বানরেরও নয়, মানুষেরও নয়—এ হচ্ছে বানর আর মানুষের চেয়ে ঢের বেশি বড় কোন জীবের। এরা নরমাংস খায়, কিন্তু বানর-জাতীয় কোন জীবই নরমাংসের ভক্ত নয়। মানুষই বরং অসভ্য অবস্থায় নরমাংস ভক্ষণ করে। কাল

আমরা যে অট্টহাসি শুনেছি, বানরের গলা থেকে তেমন অট্টহাস্য কেউ কোনদিন শোনে নি। বানররা বা আর কোন জানোয়াররাই হাসতে পারে না, হাসিও হচ্ছে মানুষেরই নিজস্ব জিনিস। মানুষের মতন পায়ের দাগ, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, দীর্ঘতায় বারো চৌদ্দ ফুট কি আরো বেশি, মানুষেরই মতন হাসতে পারে, এমন জীবের কথা কে শুনেছে, এমন জীবকে কে দেখেছে, তাও আমরা জানি না। কোথায় তাদের ঠিকানা, তাই বা কে বলে দেবে?"

রামহরি বললে, "তাদের ঠিকানা হচ্ছে কৈলাসে। আদ্যিকালে তারাই দক্ষযজ্ঞ পণ্ড ক'রে দিয়েছিল, আর একালে তারাই এসেছে আমাদের মুণ্ডুপাত করতে।...তারা কেমন দেখতে, কি করে, কি খায়, কোথায় থাকে, এ কথা তোমাদের জানবার দরকার কি বাপু?"

রামহরির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বিনয়বাবুর মাথার উপর দিয়ে প্রকাণ্ড একখানা পাথর ঠিকরে গিয়ে দুম ক'রে মাটিতে পড়ে গড়িয়ে গেল! ব্যাপারটা ভাল ক'রে বুঝতে-না-বুঝতে আরো চার-পাঁচখানা তেমনি বড় বড় পাথর তাঁদের আশে-পাশে, মাঝখানে এসে পড়ল—এক একখানা পাথর ওজনে একমণ-দেড়মণের কম হবে না।

বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "পালাও—পালাও! ছোটো।"

দৌড়, দৌড়, দৌড়! প্রত্যেকে ছুটতে লাগল—কাল-বোশেখীর ঝড়ের বেগে। পাথর-বৃষ্টির তোড় দেখে বাঘারও সমস্ত বীরত্ব উপে গেল, তার বুঝতে দেরি লাগল না যে, এখন পলায়নই হচ্ছে প্রাণ বাঁচাবার একমাত্র ভাল উপায়! ও-রকম প্রকাণ্ড পাথর একখানা মাথায় পড়লে মানুষ তো ছার, হাতি-গণ্ডারকেও কুপোকাৎ হতে হবে!

অনেকদূর এসে সবাই আবার দাঁড়াল। খানিকক্ষণ ধরে হাঁপ ছাড়বার পর কুমার বললে, "ওঃ, আজ আর একটু হলেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল আর কি!"

রামহরি বললে, "এ-সব হচ্ছে আমার কথা না-শোনার শাস্তি। জানো না, শাস্তরে আছে—'ঠিক দুপুরবেলা, ভূতে মারে ঢেলা!"

বিমল বিরক্ত হয়ে বললে, "তোমার শাস্ত্র নিয়ে তুমিই থাকো রামহরি, এ-সময়ে আর তোমার শাস্ত্র আউড়ে আমাদের মাথা গরম ক'রে দিও না।"

বিনয়বাবু বললেন, "আর এখানে দাঁড়ানো না, একেবারে বাসায় গিয়ে ওঠা যাক চল।"

চলতে চলতে বিমল বললে, "অমন বড় বড় পাথর যারা ছোট ছোট ঢিলের মতো ছুঁড়তে পারে, তাদের আকার আর জোরের কথা ভাবলেও অবাক হতে হয়।"

কুমার বললে, "আর এটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমরা ওখানে বসে যখন ওদের কথা নিয়ে আলোচনা করছিলুম, তখন ওরাও লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের সকলকে লক্ষ্য করছিল।"

বিনয়বাবু বললেন, "তাদের শক্তির যে পরিচয়টা পাওয়া গেল তাতে তো মনে হয় ইচ্ছে করলেই তারা আমাদের ক'ড়ে আঙুলে টিপে মেরে ফেলতে পারত! কিন্তু তা না ক'রে তারা লুকিয়ে লুকিয়ে পাথর ছুঁড়ে আমাদের মারতে এল কেন?"

বিমল বললে, "এও একটা ভাববার কথা বটে। হয়তো তারা আত্মপ্রকাশ করতে রাজি নয়। হয়তো দিনের আলো তারা পছন্দ করে না। হয়তো পাথর ছোঁড়াটা তাদের খেয়াল।"

কুমার বললে, "কিন্তু বিমল, এ-রহস্যের একটা কিনারা না ক'রে আমরা ছাড়ব না। রীতিমত প্রস্তুত হয়ে আবার আমাদের ফিরে আসতে হবে।"

রামহরি চোখ কপালে তুলে বললে, "এই ভূতের আড্ডায়?"

বিমল ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ভূতের আড্ডায়! জানো না, আমরা কেন এখানে এসেছি? জানো না, বিনয়বাবু কেন আমাদের সাহায্য চেয়েছেন?"

রামহরি মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললে, "না না খোকাবাবু, আমাকে মাপ কর, ভূতের ভয়ে সে কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম।"

…এমনি সব কথা কইতে কইতে সকলে রঙ্গিট রোড দিয়ে ভুটিয়া-বস্তির কাছে এসে পড়ল। সেখানে এসে দেখলে, মহা গণ্ডগোল ! চার-পাঁচজন স্ত্রীলোক চিৎকার ক'রে কাঁদছে, আর তাদেরই ঘিরে দাঁড়িয়ে, ভুটিয়া, লিম্বু ও ল্যাপ্‌চা জাতের অনেকগুলো পাহাড়ী লোক উত্তেজিত ভাবে গোলমাল করছে !

তাদেরই ভিতর থেকে একজন মাতব্বরগোছের বুড়ো ভুটিয়াকে বেছে নিয়ে বিমল জিজ্ঞাসা করলে, "এখানে এত সোরগোলের কারণ কি ?"

বুড়ো ভুটিয়াটা বিশৃঙ্খল ভাবে যে-সব কথা বললে, সেগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলে এইরকম দাঁড়ায়—

আজ কিছুকাল ধরে এখানে ভৌতিক উপদ্রব শুরু হয়েছে। বৌদ্ধ গুম্ফায় অনেক পূজা-মানত ক'রেও উপদ্রব কমে নি।

প্রথম প্রথম উপদ্রব বিশেষ গুরুতর হয় নি। পাহাড়ে পাহাড়ে যখন রাতের আঁধার নেমে আসত, মানুষরা যখন বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিত, তখন আশপাশের জঙ্গলের ভিতর থেকে যেন কাদের চ্যাঁচামেচি শোনা যেত !

তারপর নিশীথ-রাতে মাঝে মাঝে বস্তির লোকদের ঘুমের ব্যাঘাত হতে লাগল। ঘুম ভাঙলেই তারা শুনতে পায় বস্তির ভিতর দিয়ে যেন দুম দুম ক'রে পা ফেলে মত্ত মাতঙ্গের দল আনাগোনা করছে। তাদের পায়ের দাপে পাহাড়ের বুক যেন থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে ! সে শব্দ শুনেই সকলের বুকের রক্ত জল হয়ে যায়, মায়ের কোলে ছেলে-মেয়েরা ককিয়ে ওঠে ! পাছে বাইরের তারা সে কান্না শুনতে পায়, সেই ভয়ে মায়েরা ছেলে-মেয়ের মুখ প্রাণপণে চেপে ধরে আড়ষ্ট হয়ে থাকে, খুব সাহসী পুরুষদেরও এমন সাহস হয় না যে, দরজাটা একটু খুলে ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, বাইরে কাদের আগমন হয়েছে !

তারপর বস্তির ভিতর থেকে পর পর দুজন লোক অদৃশ্য হ'ল। তারা দুজনেই দুটো বিলিতি হোটেলে কাজ করত—বাসায় আসতে তাদের রাত হ'ত। তারা যে কোথায় গেল, কেউ তা জানে না।

তারপর এক চোকীদার রাত্রে এক ভয়ানক ব্যাপার দেখলে। এক-তলা-ছাদ-সমান উঁচু মস্তবড় এক ছায়ামূর্তি বস্তির একটা পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে চৌকীদারের বুকের পাটা ছিল খুব। ছায়া-মূর্তিটাকে দেখেও সে ভাবলে, বোধহয় তার চোখের ভ্রম! ভাল ক'রে দেখবার জন্যে সে দু' পা এগিয়ে গেল। অমনি ছায়ামূর্তিটা তাকে লক্ষ্য ক'রে প্রকাণ্ড একখানা পাথর ছুঁড়ে মারলে। ভাগ্যক্রমে পাথরখানা তার গায়ে লাগল না! চৌকীদার তখনি যত-জোরে ছোটা উচিত, তত-জোরেই ছুটে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে। পরদিনই সে চৌকীদারি কাজ ছেড়ে দিলে।

এই-সব কাণ্ডকারখানার কথা শুনে এক সাহেব কৌতূহলী হয়ে বস্তির ভিতরে রাত কাটাতে এল। রাত্রে কি ঘটল, কেউ তা জানে না। সকালে দেখা গেল, বস্তির পথে সাহেবের টুপী আর হাতের বন্দুক পড়ে রয়েছে, কিন্তু সাহেবের চিহ্নমাত্র নেই!

পরশু আর একজন ভুটিয়া বাসায় ফিরে আসে নি! কিন্তু যাদের বাড়িতে সে কাজ করত তারা বলেছে, রাতে সে বাসার দিকেই এসেছে। এখন পর্যন্ত তার কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তার মা-বোন বৌ কাঁদছে।

পুলিসের লোকেরা রোজ আসে। দিনের বেলায় তারা বুদ্ধিমানের মতো অনেক পরামর্শ করে, অনেক উপদেশ দেয় আর রাতে পাহারা দিতেও নাকি কসুর করে না। কিন্তু তারা পাহারা দেয় বোধহয় ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে। কারণ, এখনো গভীর রাতে প্রায়ই বস্তির পথে মত্তহস্তীর মতো কাদের ভারী ভারী পায়ের শব্দ শোনা যায়। রাত্রে এই দেবতা না অপদেবতাদের অনুগ্রহ, আর দিনের বেলায় পুলিসের জাঁকজমক খানাতল্লাস,—বাবুসাহেব, আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছি! বস্তি ছেড়ে দলে দলে লোক পালিয়ে যাচ্ছে!

চার

রাত্রের বিভীষিকা

বিমল ও কুমার বাসায় বসে বসে মাঝে মাঝে 'স্যাণ্ডউইচে' কামড় ও মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিল। দুইজনেরই মন খারাপ, কারুর মুখেই কথা নেই। বাঘা অত-শত বোঝে না, কখন 'চিকেন-স্যাণ্ডউইচে'র একটুখানি প্রসাদ তার মুখের কাছে এসে পড়বে সেই মধুর আশাতেই সে বিমল ও কুমারের মুখের পানে বারংবার লোভের দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে!

বিনয়বাবু বাসায় নেই। সুরেনবাবু এখানকার একজন বিখ্যাত লোক—বহুকাল থেকে দার্জিলিংয়েই স্থায়ী। এখানে এসে তাঁর সঙ্গে বিনয়-বাবুর অল্পস্বল্প আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। সুরেনবাবু আজ হঠাৎ কি কারণে বিনয়বাবুকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে কুমার বললে, "বিনয়বাবুর ফিরতে তো বড় বেশি দেরি হচ্ছে!"

বিমল বললে, "হুঁ। এত দেরি হবার তো কথা নয়। তাঁকে নিয়ে সুরেনবাবুর এমন কি দরকার?"

কুমার বললে, "এদিকে আমাদের বেরুবার সময় হয়ে এল, বন্দুক-গুলো সাফ করা হয়েছে কিনা দেখে আসি।"

বিমল বললে, "কেবল বন্দুক নয় কুমার! প্রত্যেকের ব্যাগে কিছু খাবার, ছোরা-ছুরি, ইলেকট্রিক টর্চ, খানিকটা পাকানো দড়ি—অর্থাৎ হঠাৎ কোন বিপজ্জনক দেশে যেতে হলে আমরা যে-সব জিনিস নিয়ে যাই, তার কিছুই ভুললে চলবে না।"

কুমার বললে, "আমরা তো দূরে কোথাও যাচ্ছি না, তবে মিছিমিছি

এমন মোট ব'য়ে লাভ কি ?

বিমল বললে, "কুমার, তুমিও বোকার মতন কথা কইতে শুরু করলে ? ...মঙ্গল-গ্রহে যাবার এক মিনিট আগেও আমরা কি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়েছিলুম, কোথায় কোথায় যেতে হবে ? প্রতি মুহূর্তে যাদের মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করতে হয়, তাদের কি অসাবধানতার নিশ্চিন্ত আনন্দ ভোগ করবার সময় আছে ?"

কুমার কোন জবাব দিতে পারলে না, লজ্জিত হয়ে চ'লে গেল। এমন সময় বিনয়বাবু ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যায়, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছেন। বিমল কিছু বললে না, বিনয়-বাবু কি বলেন তা শোনবার জন্যে তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু-চোখে তাকিয়ে রইল।

বিনয়বাবু প্রথমটা কিছুই বললেন না, ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরের চারি-দিকে খানিকটা ঘুরে বেড়ালেন, তারপর বিমলের সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "বিমল, বিমল! সুরেনবাবুর কাছে গিয়ে যা শুনলুম, তা ভয়ানক—অতি ভয়ানক!"

বিমল বললেন, "আপনি কি শুনেছেন ?"

বিনয়বাবু বললেন, "মৃণুর জন্যে আর আমাদের খোঁজাখুঁজি ক'রে কোন লাভ নেই।"

—"তার মানে ?"

—"মৃণুকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

—"কেন ?"

সুরেনবাবু বললেন, "পঁচিশ বছর আগে দার্জিলিংয়ে আর-একবার একটি মেয়ে চুরি গিয়েছিল। সে মেম! সেই সময়ও এখানে নাকি মানুষ চুরির এইরকম হাঙ্গামা হয়। সেই মেয়ের সঙ্গে নাকি বিশ-পঁচিশ-জন পুরুষেরও আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।"

—"আপনি কি মনে করেন, তার সঙ্গে এই ব্যাপারের কোন সম্পর্ক আছে ?"

—"আমার তো তাই বিশ্বাস। এই-সব কথা বলবার পর সুরেনবাবু এই লেখাটুকু দিলেন। পুরানো ইংরেজী কাগজ 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' থেকে এটি তিনি কেটে রেখেছিলেন।"

বিনয়বাবুর হাত থেকে কাগজখানি নিয়ে বিমল যা পড়লে তার সারমর্ম এই :

হিমালয়ে এক অজ্ঞাত রহস্যময় জীবের কথা শোনা যাচ্ছে। প্রথম এভারেস্ট অভিযানে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরাও ফিরে এসে এদের কথা বলেছেন। তাঁরা স্বচক্ষে এদের দেখেন নি বটে, কিন্তু হিমালয়ের বরফের গায়ে এদের আশ্চর্য পায়ের দাগ দেখে এসেছেন। সে-সব পায়ের দাগ দেখতে মানুষের পদচিহ্নের মতন বটে, কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মানুষেরও পায়ের দাগ তেমন মস্ত হয় না! স্থানীয় লোকেরা বলে, হিমালয়ের কোন অজানা বিজন স্থানে বিচিত্র ও অমানুষিক সব দানব বাস করে। কখনো কখনো তারা রাত্রে গ্রামের আনাচে-কানাচে এসে বড় বড় পাথর ছোঁড়ে। গভীর রাত্রে কখনো কখনো তাদের গলার আওয়াজও শোনা যায়। তারা মানুষের সামনে বড়-একটা আসে না এবং মানুষেরাও তাদের সামনে যেতে নারাজ, কারণ সবাই তাদের যমের চেয়েও ভয় করে। তাদের কথা তুললেই হিমালয়ের গ্রামবাসীরা মহা আতঙ্কে শিউরে ওঠে!*

বিমল বললে, "কাগজে যাদের কথা বেরিয়েছিল, কাল আমরাও বোধহয় তাদেরই কোন কোন জাত-ভাইয়ের খোঁজ পেয়েছি।"

বিনয়বাবু বললেন, "বোধহয় কেন বিমল, নিশ্চয়! হুঁ, আমরা নিশ্চয় তাদেরই কীর্তি দেখে এসেছি।"

—মানুষের পায়ের দাগের মতন দেখতে, অথচ তা অমানুষিক! আর, অমানুষিক সেই মাথার চুল! আর, অমানুষিক সেই অট্টহাসি!

---

* আমরা যা বললুম, তা মন-গড়া মিথ্যা কথা নয়। অধুনালুপ্ত ইংরেজী দৈনিকপত্র "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজের" পুরানো ফাইল খুঁজলে সকলেই এর বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করতে পারবেন। ইতি।—লেখক।

এদেরও অভ্যাস, বড় বড় পাথর ছোঁড়া। কে এরা, কে এরা, কে এরা?"—বলতে বলতে বিমল উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলে—"কুমার! রামহরি! বাঘা!"

কুমার ও রামহরি তখনি ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল—তাদের পিছনে পিছনে বাঘা! পশু বাঘা, বুদ্ধিমান বাঘা,—সে কুকুর হলে কি হয়, তারও মুখে যেন আজ মানুষের মুখের ভাব ফুটে উঠেছে,—তাকে দেখলেই মনে হয় বিমলের ডাক শুনেই সে যেন বুঝতে পেরেছে যে, আজ তাকে বিশেষ কোন দরকারী কাজ করতে হবে! সোজা বিমলের পায়ের কাছে এসে বাঘা বুক ফুলিয়ে এবং ল্যাজ তুলে দাঁড়াল—যেন সে বলতে চায়,—"কী হুকুম হুজুর! গোলাম প্রস্তুত।"

আদর ক'রে বাঘার মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বিমল বললে, "কুমার! আমাদের জিনিস-পত্তর সব তৈরি!"

কুমার বললে, "হ্যাঁ, বিমল!"

বিমল বললে, "আর একটু পরেই সন্ধ্যে হবে। কিন্তু তার আগেই আমি ভুটিয়া-বস্তিতে গিয়ে হাজির হতে চাই। আজ সারারাত সেই-খানেই আমরা পাহারা দেব।"

ভুটিয়া-বস্তির প্রায় দক্ষিণ-পূর্ব যে-দিক দিয়ে Pandam Tea Estate-এ যাওয়া যায়, সেইখানে এসে বিমল বললে, "আজ সকালে এখানেই ভুটিয়াদের কান্নাকাটি শুনে গিয়েছি। আজ এইখানেই পাহারা দিয়ে দেখা যাক, কী হয়!…কিন্তু সকলে এক জায়গায় জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছ থেকে খানিক খানিক তফাতে গিয়ে বসে পাহারা দেব। তাহলে অনেকখানি জায়গাই আমাদের চোখের ভিতরে থাকবে। আজ সারারাত ঘুমের কথা কেউ যেন ভেবো না। দরকার হলেই বন্দুক ছুঁড়বে। রামহরি! বাঘাকে তুমি আমার কাছে দিয়ে যাও!"

সন্ধ্যা গেল তার আবছায়া নিয়ে, রাত্রি এল তার নিরেট অন্ধকার

নিয়ে! অন্য সময় হলে কাছে ঐ ভুটিয়া-বস্তি থেকে হয়তো এখন অনেক রকম শব্দ বা গান-বাজনার ধ্বনি শোনা যেত, কিন্তু আজ সমস্ত পল্লী যেন গোরস্থানের মতো নিস্তব্ধ,—যেন ওখানে কোন জীবই বাস করে না! শ্মশানে তবু মড়ার চিতা জ্বলে, কিন্তু ওখানে আজ একটিমাত্র আলোক-বিন্দুও দেখা যাচ্ছে না! যেন ওখানে আজ কোন কালো নিষ্ঠুর অভিশাপ অন্ধকারের সঙ্গে সর্বাঙ্গ মিশিয়ে দিয়ে নীরবে কোন অজানা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন নিয়ে মারাত্মক খেলা করছে!

বিমলের মনে হতে লাগল, এই অন্ধকারে পাহারা দিয়ে কোনই লাভ নেই! যদি এরই ভিতর দিয়ে কোন ভীষণ মূর্তি নিঃশব্দে পা ফেলে চলে যায়, তবে কোন মানুষের চক্ষুই তা দেখতে পাবে না।

নিশুত রাতের বুক যেন ধুকপুক করছে। বরফ-মাখা কনকনে হাওয়া যেন মৃতদেহের মতো ঠাণ্ডা! দূর থেকে ভুটিয়াদের বৌদ্ধ-মন্দিরের ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেল—এ পবিত্র ঘণ্টা বাজে দুষ্ট প্রেতাত্মাদের তাড়াবার জন্যে। কিন্তু পাহাড়ে রাত্রের প্রেতাত্মারা ঘণ্টাধ্বনি শুনলে সত্যই কি পালিয়ে যায়? তবে আচম্বিতে ওখানে অমন অপার্থিব ধ্বনি জাগছে কেন?...না, এ হচ্ছে গাছের পাতায় বাতাসের আর্তনাদ! রাত্রির আত্মা কি কাঁদছে? রাত্রির প্রাণ কি ছটফট করছে? রাত্রি কি আত্মহত্যা করতে চাইছে?

এমনি-সব অসম্ভব পাগলামি নিয়ে বিমলের মন যখন ব্যস্ত হয়ে আছে, তখন অকস্মাৎ বাঘা ধড়মড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেগে গরর গরর ক'রে উঠল!

বিমলও তৎক্ষণাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠল, চারিদিকে তীব্র ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পেলে না,—চতুর্দিকে যে-অন্ধকার সেই-অন্ধকারই! বাঘার গলায় হাত রেখে সে বললে, "কিরে বাঘা, চ্যাঁচালি কেন? আমার মতন তুইও কি দুঃস্বপ্ন দেখছিস?"

বিমলের মুখের কথা ফুরোতে-না-ফুরোতেই সেই স্তব্ধ রাত্রির বক্ষ

বিদীর্ণ ক'রে কে অতি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল, "বিমল! কুমার! রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

বিমলের বুক স্তম্ভিত হয়ে গেল,—এ যে বিনয়বাবুর কণ্ঠস্বর!

পাঁচ

অরণ্যের রহস্য

বিনয়বাবুর গলার আওয়াজ! কী ভয়ানক বিপদে পড়ে এত যন্ত্রণায় তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন? কিন্তু কালো রাত আবার স্তব্ধ হয়ে পড়ল, বিনয়বাবু আর চিৎকার করলেন না।

লুকানো জায়গা থেকে বিমল একলাফে বেরিয়ে এল—বাঘা তার আগেই দৌড়ে এগিয়ে গিয়েছে। অন্যদিক থেকে দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে বিমল বুঝলে, কুমার আর রামহরিও ছুটে আসছে।

কিন্তু কোনদিকে যেতে হবে? এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোলের মানুষ চেনা যায় না, বিপদের আবির্ভাব হয়েছে যে ঠিক কোন জায়গায়, তা স্থির করা এখন অসম্ভব বললেই চলে।

বিমল তখন বাঘার পশু-শক্তির উপর নির্ভর ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। সে বুঝলে, পশু বাঘার যে শক্তি আছে, মানুষের তা নেই। পশুর চোখ অন্ধকারে মানুষের চেয়ে তীক্ষ্ণ তো বটেই, তার উপরে ঘ্রাণ-শক্তি তাকে ঠিক পথেই চালনা করে।

রামহরি বিজলী-মশাল জ্বালতেই বিমল বাধা দিয়ে বললে, "না, না, —এখন আলো জ্বেলো না, শত্রু কোনদিকে তা জানি না, এখন আলো জ্বাললে আমরাই ধরা পড়ে মরব!"

তীব্র দৃষ্টিতে অন্ধকারের রহস্যের ভিতরে তাকিয়ে তারা তিনজনে অত্যন্ত সজাগ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল—তাদের কাছে এখন প্রত্যেক

সেকেণ্ড যেন এক এক ঘণ্টার মতন দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না—মিনিটখানেক পরেই হঠাৎ বাঘার ঘন ঘন গর্জনে নীরব কালো রাতের ঘুম আবার ভেঙে গেল।

বিমল উত্তেজিত স্বরে বললে, "বাঘা খোঁজ পেয়েছে। ঐদিকে—ঐদিকে! রামহরি, 'টর্চ' জ্বেলে আগে আগে চল। কুমার, আমার সঙ্গে এস।"

রামহরির পিছনে পিছনে বিমল ও কুমার বন্দুক বাগিয়ে ধরে দ্রুত-পদে এগিয়ে চলল। একটা ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে বাঘা ক্রমাগত চিৎকার করছে! সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখা গেল, ঝোপের পাশেই একটা বন্দুক পড়ে রয়েছে।

কুমার বললে, "বিনয়বাবুর বন্দুক! কিন্তু বিনয়বাবু কোথায়?"

রামহরি তাড়াতাড়ি আলো নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকল এবং পর-মুহূর্তেই আকুল স্বরে চেঁচিয়ে উঠল—"ভূত! খোকাবাবু!"

আচম্বিতে এই অপ্রত্যাশিত চিৎকার বিমল ও কুমারকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে দিলে। কিন্তু তারপরেই নিজেদের সামলে নিয়ে বিজলী-মশাল জ্বেলে তারাও এক এক লাফে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে পড়ল।

দুই হাতে মুখ চেপে রামহরি মাটির উপরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

বাঘা ছুটে জঙ্গলের আরো ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল,—কিন্তু কুমার টপ ক'রে তার গলার বগলস চেপে ধরলে। বাঘা তবু বশ মানলে না, ছাড়ান পাবার জন্যে পাগলের মতন ধস্তাধস্তি করতে লাগল।

বিমল চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, কিন্তু বিনয়বাবুর কোন চিহ্ন বা ভয়-পাবার মতো অন্য কিছুই তার নজরে ঠেকল না।

কুমার বললে, "রামহরি! কি হয়েছে তোমার? কী দেখেছ তুমি?"

রামহরি ফ্যালফ্যালে চোখে বোবার মতো একবার কুমারের মুখের পানে চাইলে এবং তারপরে জঙ্গলের একদিকে আঙুল তুলে দেখালে। তখনো সে ঠকঠক ক'রে কাঁপছিল।

বিমল বললে, "অমন ক্যাবলাকান্তের মতো তাকিয়ে আছ কেন?

ওখানে কি আছে ?"

রামহরি খালি বললে, "ভূত।"

—"ভূত! তোমার ভূতের নিকুচি করেছে! দাঁড়াও, আমি দেখে আসছি"—এই বলে বিমল সেইদিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করলে।

রামহরি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না! খোকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওদিকে যেও না!"

—"কেন? ওদিকে কি আছে?"

—"ভূত! রাক্ষস! দৈত্য কি দানব! যাকে দেখেছি সে যে কে, তা আমি জানি না—কিন্তু সে মানুষ নয়, খোকাবাবু, মানুষ নয়!"

বিমল খুব বিরক্ত হয়ে বললে, "আর তোমার পাগলামি ভাল লাগে না রামহরি! হয় যা দেখেছ স্পষ্ট ক'রে বল, নয়, এখান থেকে বিদেয় হও।"

রামহরি বললে, "সত্যি বলছি খোকাবাবু, আমার কথায় বিশ্বাস কর। যেই আমি জঙ্গলের ভেতর এলুম, অমনি দেখলুম, জয়ঢাকের চেয়েও একখানা ভয়ানক মুখ সাঁৎ ক'রে ঝোপের আড়ালে সরে গেল।"

—"খালি মুখ?"

—"হ্যাঁ, খালি মুখ—তার আর কিছু আমি দেখতে পাই নি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আর আমার এই হাতের চেটোর মতো বড় বড় আগুন-ভরা চোখ,—বাপ্‌রে, ভাবতেও আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে!"

কুমার বললে, "কিন্তু সে মুখের কথা এখন থাক। বিমল, বিনয়বাবু কোথায় গেলেন?"

—"আমিও সেই কথাই ভাবছি। তাঁর চিৎকার আমরা সকলেই শুনেছি, তাঁর বন্দুকটাও এখানে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়?"

হঠাৎ খানিক তফাতে জঙ্গলের মধ্যে এক অদ্ভুত শব্দ উঠল—যেন বিরাট একটা রেল-এঞ্জিনের মতন অসম্ভব দেহ জঙ্গলের গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে বেগে এগিয়ে চলে গেল! সঙ্গে সঙ্গে বাঘার ঘেউ-

ঘেউ-ঘেউ! এবং রামহরির আর্তনাদ—"ঐ শোনো খোকাবাবু, ঐ শোনো!"

গাছপালার মড়মড়ানি ও ভারী ভারী পায়ের ধুপ্‌ধুপুনি শব্দ ক্রমেই দূরে চলে যেতে লাগল। বিমল বললে, "এখানে যে ছিল, সে চলে গেল!"

কুমার বললে, "কিন্তু বিনয়বাবুর কোন সন্ধানই তো পাওয়া গেল না।"

কুমারের কথা শেষ হতে না হতেই অনেকদূর থেকে শোনা গেল—"বিমল! বিমল! কুমার! রক্ষা কর—রক্ষা কর! বিমল! বি—" হঠাৎ আর্তনাদটা আবার থেমে গেল!

কুমার বললে, "বিমল—বিমল! ঐ তো বিনয়বাবুর গলা!"

বিমল বললে, "কুমার, বিনয়বাবু নিশ্চয়ই দানবের হাতে বন্দী হয়েছেন! তারা নিশ্চয়ই তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!"

—"এখন কি হবে বিমল, আমরা কি করব?"

—"আমরা?···আমরা শত্রুর পিছনে পিছনে যাব—বিনয়বাবুকে উদ্ধার করব!"

—"কিন্তু কোনদিকে যাব? পৃথিবীতে এক ফোঁটা আলো নেই, আকাশ যেন অন্ধকার বৃষ্টি করছে! কে আমাদের পথ দেখাবে?"

—"বাঘা। শত্রুর পায়ের গন্ধ সে ঠিক চিনতে পারবে—বাঘা যে শিক্ষিত কুকুর! তুমিও ওর গলায় শিকল বেঁধে ওকে আগে আগে যেতে দাও, আমরা ওর পিছনে থাকব। রামহরি, তুমি কি আমাদের সঙ্গে আসবে, না বাসায় ফিরে যাবে?"

রামহরি বললে, "তোমরা যেখানে থাকবে, সেই তো আমার বাসা। তোমাদের সঙ্গে ভূতের বাড়ি কেন, যমের বাড়ি যেতেও আমি নারাজ নই।"

—"হ্যাঁ রামহরি, হয়তো আজ আমরা যমের বাড়ির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। মন্দ কি, পারি তো যমের একখানা ফোটো তুলে নিয়ে আসব!"

রামহরি গজগজ ক'রে বললে, "যত সব অনাছিষ্টি কথা!"

বিমলের কথা মিথ্যা নয়। বাঘার নাকই অন্ধকারে তাদের চোখের কাজ করলে। বাঘা কোনদিকে ফিরে তাকালে না, মাটির উপরে নাক রেখে সে বেগে অগ্রসর হতে লাগল। কুমার তার গলার শিকলটা না

ধরে রাখলে এতক্ষণে সে হয়তো আরো বেগে তীরের মতো ছুটে নাগালের বাইরে কোথায় চলে যেত।

তিনজনে বাঘার পিছনে পিছনে অতি কষ্টে পথ চলতে লাগল।

কুমার বললে, "বনের ভেতরে রামহরি যাকে দেখেছে, তার বর্ণনা শুনে মনে হ'ল সে এক সাংঘাতিক জীব!"

রামহরি শিউরে উঠে বললে, "তার কথা আর মনে করিয়ে দিও না বাবু, তাহলে হয়তো আমি ভিরমি যাব। উঃ, মুখখানা মানুষের মতো দেখতে বটে, কিন্তু হাতির মুখের চেয়েও বড়!"

—"অমন ভয়ানক যার মুখ, আমাদের দেখেও সে আক্রমণ করলে না কেন?"

বিমল বললে, "হয়তো আমাদের হাতের 'ইলেক্‌ট্রিক টর্চ' দেখে সে ভড়কে গেছে!"

কুমার বললে, "আশ্চর্য নয়। মোটরের 'হেড-লাইট' দেখে অনেক সময়ে বাঘ-ভাল্লুকও হতভম্ব হয়ে যায়!"

আবার তারা নীরবে অগ্রসর হতে লাগল।

এইভাবে ঘণ্টা-তিনেক দ্রুতপদে এগিয়ে তারা যে কোথায়, কোন-দিকে, কতদূরে এসে পড়ল, কেউ তা বুঝতে পারলে না। এবং এইভাবে আর বেশিক্ষণ বাঘার সঙ্গে চলা যে তাদের পক্ষে অসম্ভব, এটুকু বুঝতেও তাদের বাকি রইল না। এরই মধ্যে বারবার হোঁচট খেয়ে পাথরের উপরে পড়ে তাদের সর্বাঙ্গ থেঁতো হয়ে গেছে, গায়ের কত জায়গায় কত কাঁটা বিঁধেছে, ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে জামা-কাপড়ের আর পদার্থ নেই! তাদের ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ছে, দম বুঝি আর থাকে না!

এইবারে তারা একটা বড় জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করল। সকলে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনগতিকে আরো কিছুদূর অগ্রসর হ'ল। তারপর রামহরি বললে, "খোকাবাবু, আমি তো তোমাদের মতন জোয়ান ছোকরা নই, আমাকে একটু হাঁপ ছাড়তে দাও!"

বিমল বললে, "রামহরি, কেবল তোমারই নয়, আমারও বিশ্রাম দরকার হয়েছে,—আমিও এই বসে পড়লুম।"

কুমারের অবস্থাও ভাল নয়, সেও অবশ হয়ে ধুপ ক'রে বসে পড়ল।

কিন্তু বাহাদুর বটে বাঘা! যদিও দারুণ পরিশ্রমে তার জিব মুখের বাইরে বেরিয়ে পড়ে লকলক ক'রে ঝুলছে, তবু এখনো তার এগিয়ে যাবার উৎসাহ একটুও কমে নি।

কুমার চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে বললে, "মনে হচ্ছে, আজকের এই অন্ধকারের অন্ধতা কখনো দূর হবে না, আজকের এই অনন্ত রাতের বিভীষিকা কখনো শেষ হবে না!"

রামহরি বললে, "একটা জানোয়ারের ভরসায় এই যে আমরা ক্ষ্যাপার মতো এগিয়ে চলেছি, এটা কি ঠিক হচ্ছে খোকাবাবু?"

বিমল বললে, "সময়ে সময়ে জানোয়ারের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে বড় হয় রামহরি। ভগবান মানুষকে বঞ্চিত ক'রে এমন কোন কোন শক্তি পশুকে দিয়েছেন, যা পেলে মানুষের অনেক উপকারই হ'ত!"

আচম্বিতে সেই বোবা অন্ধকার, কালো রাত্রি এবং স্তব্ধ অরণ্য যেন ভীষণ ভাবে জ্যান্ত হয়ে উঠল!—"ও কী খোকাবাবু, ও কী"—বলতে বলতে রামহরি আঁতকে দাঁড়িয়ে উঠল!

বাঘা চেঁচিয়ে এবং চমকে-চমকে উঠে শিকল ছিঁড়ে ফেলে আর কি!

বিমল ও কুমার সন্ত্রস্ত হয়ে শুনতে লাগল—তাদের সামনে, পিছনে, ডানপাশে, বামপাশে, কাছে, দূরে, চারিদিক থেকে যেন চল্লিশ-পঞ্চাশখানা বড় বড় স্টীমার কান ফাটিয়ে প্রাণ দমিয়ে ক্রমাগত 'কু' দিচ্ছে—যেন বনবাসী অন্ধকারের চিৎকার, যেন সদ্যজাগ্রত অরণ্যের হুঙ্কার, যেন বিশ্বব্যাপী ভূত-প্রেতের গর্জন!

ছয়

অজগরের মতন হাত

তোমাদের মধ্যে যারা কলকাতায় থাক, তারা জানো বোধ হয়, "নিউ ইয়ার্স ডে"র রাত্রি-দুপুরের সময় গঙ্গানদীর স্টীমারগুলো একসঙ্গে এমন "ভোঁ" দিয়ে উঠে যে, কান যেন ফেটে যায়!

হিমালয়ের পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে এই ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে বিমল, কুমার ও রামহরির চারিদিক থেকে এখন অনেকটা তেমনিধারা বিকট চিৎকারই জেগে উঠেছে। তবে স্টীমারের "ভোঁ"-দেওয়ার ভিতরে ভয়ের ব্যাপার কিছু নেই, কিন্তু এখানকার এই অস্বাভাবিক কোলাহলে অবর্ণনীয় আতঙ্কে ও যন্ত্রণায় সকলের প্রাণ যেন ছটফট করতে লাগল!

আর,—এ চিৎকার কোন যন্ত্রের চিৎকার নয়, এ ভয়াবহ চিৎকার-গুলো বেরিয়ে আসছে অজানা ও অদৃশ্য সব অতিকায় জীবের কণ্ঠ থেকেই! দুশো-আড়াইশো সিংহ একসঙ্গে গর্জন করলেও তা এতটা ভয়ঙ্কর বলে মনে হ'ত না!

প্রথমটা সকলেই কি করবে ভেবে না পেয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চারিদিক থেকেই সেই বিকট চিৎকার উঠছে, কাজেই কোন-দিকেই পালাবার উপায় নেই!

কুমারের মনে হ'ল, তাদের দিকে ক্রুদ্ধ অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে দৈত্য-দানবের মতো কারা যেন চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে—ক্রমেই এগিয়ে আসছে—তাদের কবল থেকে মুক্তিলাভের আর কোন উপায় নাই।

হঠাৎ বিমল বলে উঠল, "কুমার উঠে দাঁড়াও! হাত-পা গুটিয়ে চুপ ক'রে থাকবার সময় নয়। বন্দুক ছোঁড়ো,—যা থাকে কপালে!"

বিমল ও কুমার লক্ষ্যহীন ভাবেই অন্ধকারের ভিতর গুলির পর গুলি চালাতে লাগল,—তাদের দেখাদেখি রামহরিও সব ভয় ভুলে বন্দুক ছুঁড়তে কসুর করলে না।

শত্রুদের বিকট চিৎকারের সঙ্গে তিন-তিনটে বন্দুকের গর্জন মিলে চারিদিকটা যেন শব্দময় নরক ক'রে তুললে—কাজেই বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে কেউ আর্তনাদ করলে কি না, সেটা কিছুই বোঝা গেল না,—কিন্তু দু-এক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত গোলমাল একেবারে থেমে গেল।

অন্ধকারের ভিতরে আরো কয়েকটা গুলি চালিয়ে বিমল বললে, "আমাদের ভয় দেখাতে এসে হতভাগারা এইবারে নিজেরাই ভয়ে পালিয়েছে। বন্দুকের এমনি মহিমা!"

কুমার বললে, "মিছেই তারা ভয় পেয়ে পালিয়েছে। লোকে যা বলে, তাদের চেহারা যদি সেই রকমই হয়, তাহলে তাদের ভয় পাবার কোনই কারণ ছিল না। তারা দল বেঁধে আক্রমণ করলে আমাদের বন্দুক কিছুই করতে পারত না!"

বিমল বললে, "কুমার, কেবল মস্তিষ্কের জোরেই মানুষ আজ জীব-রাজ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে। আদিমকালে পৃথিবীতে যারা প্রভুত্ব করত, সেই-সব ডাইনসরের তুলনায় মানুষ কত তুচ্ছ! তাদের নিঃশ্বাসেই বোধ হয় মানুষ পোকা-মাকড়ের মতো উড়ে যেত। কিন্তু তবু তারা দুনিয়ায় টিকে থাকতে পারে নি। একালের হাতি, গণ্ডার, হিপো, সিংহ, ব্যাঘ্র—এমন কি, ঘোড়া-মোষ-গরু পর্যন্ত গায়ের জোরে মানুষের চেয়ে ঢের বড়। কিন্তু তবু তারা মানুষকে ভয় করে এবং গোলামের মতো মানুষের সেবা করে। গায়ের জোরের অভাব মানুষ তার মস্তিষ্কের দ্বারা পূরণ ক'রে নিয়েছে। আমাদের হাতে যে বন্দুকগুলো আছে, আর আমাদের ব্যাগে যে বোমাগুলো আছে এগুলো দান করেছে মানুষের মস্তিষ্কই। আজ যে-সব জীবের পাল্লায় আমরা পড়েছিলুম, তারা যত ভয়ানকই হোক, সভ্য মানুষের মস্তিষ্ক তাদের মাথায় নেই। তারা আমাদের ভয়

করতে বাধ্য।"

রামহরি বিরক্ত স্বরে বলল, "খোকাবাবু বোমা-টোমা তুমি আবার সঙ্গে ক'রে এনেছ কেন? শেষকালে কি পুলিসের হাতে পড়বে?"

কুমার হেসে বললে, "ভয় নেই রামহরি, তোমার কোন ভয় নেই। দুষ্ট রাজবিদ্রোহীদের মতো আমরা যে মানুষ মারবার জন্যে বোমা ছুড়ব না, পুলিস তা জানে। পুলিসকে লুকিয়ে আমরা বোমা আনি নি— আমরা পুলিসের অনুমতি নিয়েই এসেছি!"

বিমল বললে, "পূর্বদিকে একটু-একটু ক'রে আলো ফুটছে, ভোর হতে আর দেরি নেই। সকাল পর্যন্ত বিশ্রাম ক'রে, তারপর আবার যাত্রা শুরু করা যাবে।"

কুমার বললে, "বিমল, শুনতে পাচ্ছো? কাছেই কোথায় জলের শব্দ হচ্ছে!"

বিমল বললে, "হুঁ! বোধ হয় আমরা রঙ্গু নদীর তীরে এসে পড়েছি। এখন সে-সব ভাবনা ভুলে ঘন্টাখানেকের জন্যে চোখ মুদে নাও। বাঘা ঠিক পাহারা দেবে।"

সকালের আলোয় সকলের ঘুম ভেঙে গেল।

বিমল উঠে বসে চেয়ে দেখলে, তার চারিদিকে শাল ও দেবদারু এবং আরো অনেক রকম গাছের ভিড়। গাছের তলায় তলায় লতা-গুল্ম-ভরা ঝোপঝাপ। নীল আকাশ দিয়ে সোনার জলের মতো সূর্যের আলো ঝরে পড়ছে।—মিষ্টি বাতাসে পাখনা কাঁপিয়ে প্রজাপতিরা আনাগোনা করছে—রঙবেরঙের ফুলের টুকরোর মতো! দার্জিলিংয়ের চেয়ে এখানকার হাওয়া অনেকটা গরম।

কালকের নিবিড় অন্ধকারে যে-স্থানটা অত্যন্ত ভীষণ বলে মনে হচ্ছিল, আজকের ভোরের আলো তাকেই যেন পরম শান্তিপূর্ণ ক'রে তুলেছে।

বিমল ও কুমার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিক পরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে

গেল। স্থানে স্থানে লতাগুল্ম ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে—যেন তাদের উপর দিয়ে খুব ভারী কোন জীব চলে গিয়েছে। এক জায়গায় অনেক-খানি পুরু রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

কুমার বললে, "বিমল, আমাদের বন্দুক ছোড়া তাহলে একেবারে ব্যর্থ হয় নি! দেখ, দেখ, এখানে রক্তমাখা সেই রকম মস্ত মস্ত পায়ের দাগও রয়েছে যে! দাগগুলো সামনে জঙ্গলের ভিতরে চলে গিয়েছে।"

আচম্বিতে পিছন থেকে শোনা গেল, বাঘার বিষম চিৎকার!

কুমার ত্রস্ত স্বরে বললে, "বাঘা তো নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল! আমি তাকে একটা গাছের গোড়ায় বেঁধে এসেছি। হঠাৎ কি দেখে সে চ্যাঁচালে?"

দু'জনে ত্রস্তপদে ফিরে এসে দেখলে, বাঘা ক্রমাগত চিৎকার করছে এবং শিকলি-বাঁধা অবস্থায় মাঝে মাঝে পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠছে!

বিমল বললে, "রামহরিও তো এইখানেই শুয়েছিল! রামহরি কোথায় গেল? রামহরি!...রামহরি!...রামহরি!"

কিন্তু রামহরির কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কুমার ভয়ার্ত কণ্ঠে বললে, "তবে কি তারা রামহরিকেও চুরি ক'রে নিয়ে গেল?"

বিমল বললে, "কুমার! বাঘাকে এগিয়ে দাও! শত্রু কোনদিকে গেছে, বাঘা তা জানে।"

কুমার ও বিমলের আগে আগে বাঘা আবার এগিয়ে চলল, মাটির উপরে নাক রেখে।

কুমার বললে, "বিমল, যে শত্রুদের পাল্লায় আমরা পড়েছি, তাদের তুমি মানুষের চেয়ে তুচ্ছ মনে করো না। দেখ, এরা প্রায় আমাদের সুমুখে থেকেই উপরি-উপরি বিনয়বাবু আর রামহরিকে ধরে নিয়ে গেল, অথচ আমরা কিছুই জানতে পারলুম না। আমরা কি করছি না-করছি সমস্তই ওরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে, অথচ আমরা তাদের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছি অসহায় অন্ধের মতো। এইবারে আমাদের পালা বিমল,

এইবারে আমাদের পালা।"

দাঁতে দাঁত চেপে বিমল বললে, "দেখা যাক!"

তারা একটি ছোট নদীর ধারে এসে পড়ল,—শিশুর মতো নাচতে নাচতে পাহাড়ের ঢালু গা বয়ে স্বচ্ছ জলের ধারা তর তর ক'রে বয়ে যাচ্ছে।

নদীর ধারে এসে বাঘা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর ব্যস্ত-ভাবে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল—যেন সে বলতে চায়, শত্রুর পায়ের গন্ধ জলে ডুবে গেছে, এখন আমায় আর কি করতে হবে বল?"

বিমল বললে, "আমরা রঙ্গু নদীর তীরে এসে পড়েছি। এটা রঙ্গিত নদীর একটি শাখা।"

কুমার বললে, "এ জায়গাটা দার্জিলিং থেকে কত দূরে?"

বিমল বললে, "এখান থেকে দার্জিলিং এগারো-বারো মাইলের কম হবে না। আরও কিছুদূর এগুলেই আমরা সিকিম রাজ্যের সীমানায় গিয়ে পড়ব।"

কুমার বললে, "এখন আমাদের উপায়? বাঘা তো শত্রুদের পায়ের গন্ধ হারিয়ে ফেলেছে। এখন আমরা কোনদিকে যাব?"

বিমল বললে, "পায়ের গন্ধ বাঘা এই নদীর ধারে এসেই হারিয়ে ফেলেছে। এই দেখ শত্রুদের পদচিহ্ন। তারা নদীর ওপারে গিয়ে উঠেছে। এই তো এতটুকু নদী, আমরা অনায়াসে ওপারে যেতে পারব।" —বলেই বিমল জলে নেমে পড়ল, তার সঙ্গে সঙ্গে নামল বাঘাকে নিয়ে কুমারও।

নদীর ওপারে উঠেই মাটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বিমল বললে, "এই দেখ, আবার সেই অমানুষিক পায়ের চিহ্ন!"

বাঘাও তখনি হারিয়ে-যাওয়া গন্ধ আবার খুঁজে পেলে। গা থেকে জল ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে আবার সে ছুটে চলল।

কিন্তু বিমল তার শিকল চেপে ধরে বললে, "বাঘা, দাঁড়া!...কুমার! এখনো আমাদের কত দূরে কতক্ষণ যেতে হবে, কে তা জানে? পথে

হয়তো জলও পাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি এখানে বসে মুখে কিছু দিয়ে, জল পান ক'রে 'ফ্লাস্কে' জল ভরে নিয়ে তারপর আবার শত্রুদের পিছনে ছুটব। কি বল?"

কুমার বললে, "খেতে এখন আমার রুচি হচ্ছে না!"

বিমল বললে, "খাবার ইচ্ছে আমারও নেই, কিন্তু শরীরের ওপর যে অত্যাচারটা হচ্ছে, না খেলে একটু পরেই সে যে ভেঙে পড়বে। খান-কয় 'স্যাণ্ডউইচ' আছে, টপটপ ক'রে খেয়ে ফেলো। এই নে বাঘা, তুইও নে।"

আবার তারা এগিয়ে চলল—সর্বাগ্রে বাঘা, তারপর কুমার, তারপর বিমল।

খানিক পরে তারা পাহাড়ের যে অংশে এসে পড়ল, সেদিক দিয়ে মানুষের আনাগোনা করার কোন চিহ্ন নেই। অন্তত মানুষের আনাগোনা করার কোন চিহ্ন তাদের নজরে ঠেকল না। যদিও কোথাও মানুষের সাড়া বা চিহ্ন নেই, তবুও বনের ভিতর দিয়ে পথের মতন একটা কিছু রয়েছে বলেই তারা এখনো অগ্রসর হতে পারছিল। এখান দিয়ে চলতে চলতে যদিও বেত ও নানান কাঁটাগাছ দেহকে জড়িয়ে ধরে, ঝুলে-পড়া গাছের ডালে মাথা ঠুকে যায়, ছোট-বড় পাথরে প্রায় হোঁচট খেতে হয় এবং ঘাসের ভিতর থেকে বড় বড় জোঁক বেরিয়ে পা কামড়ে ধরে, অগ্রসর হবার পক্ষে এ-সবের চেয়ে বড় আর কোন বাধা নেই। মাঝে মাঝে এক-একটা বড় গাছ বা ঝোপ উপড়ে বা ভেঙে ফেলে কারা যেন আনাগোনার জন্য পথ সাফ ক'রে রেখেছে। এমনভাবে বড় বড় গাছ-গুলোকে উপড়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে যে, দেখলেই বোঝা যায়, তা মানুষের কাজ নয়। যে-সব অরণ্যে হাতির পাল চলাফেরা করে, সেই-খানেই এমনভাবে ভাঙা বা উপড়ানো গাছ দেখা যায়। এখানে হাতিও নেই, মানুষও নেই,—তবুও পথ চলবার বাধা সরিয়ে রেখেছে কারা?

এই প্রশ্ন মনে জাগতেই কুমারের বুকটা যেন শিউরে উঠল।

বেচারা রামহরি! তার সাহস ও শক্তির অভাব নেই, মূর্তিমান মৃত্যুর

সামনেও সে কতবার হাসিমুখে ছুটে গিয়েছে। কিন্তু এক ভূতের ভয়েই সর্বদা সে কাতর হয়ে পড়ে! কিন্তু তার অদ্ভুত প্রভুভক্তি এই ভূতের ভয়কেও মানে না, তাই এত বড় বিপদের মাঝখানেও সে তাদের ছেড়ে থাকতে পারে নি। কিন্তু এখন? এখন সে কোথায়? সে বেঁচে আছে কি না কে জানে।

একটা পাহাড়ের খানিকটা যেখানে পথের উপর ঝুঁকে আছে, সেই-খানে বাঘা হঠাৎ ডানদিকে মোড় ফিরলে।

কুমারও সেইদিকে ফিরলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছনদিকে কি একটা শব্দ শুনেই চমকে উঠে আবার ফিরে দাঁড়ালো এবং তারপর সে কী দৃশ্যই দেখল!

ঝুঁকে-পড়া পাহাড়ের উপর থেকে প্রকাণ্ড অজগর সাপের মতো মোটা এবং কালো রোমশ একখানা হাত বিমলের মুখ ও গলা একসঙ্গে চেপে ধরে তার দেহকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

সাত

গুহামুখে

প্রথমটা কুমার বিস্ময়ে এমন হতভম্ব হয়ে পড়ল যে, ঠিক কাঠের পুতুলের মতোই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মানুষের হাতের মতন দেখতে কোন হাত যে এত মস্ত হতে পারে, মানুষী স্বপ্নেও বোধ হয় তা কল্পনা করা অসম্ভব। একখানা মাত্র হাতের চেটোর ভিতরেই বিমলের গলা ও সমস্ত মুখখানা একেবারে ঢাকা পড়ে গিয়েছে!

তার পরমুহূর্তেই বিমলের দেহ যখন চোখের আড়ালে চলে গেল, তখন কুমারের হুঁশ হ'ল। কিন্তু বৃথা। তখন বিমল বা শত্রুর কোন চিহ্নই নেই—কেবল ধুপধুপ ক'রে ভারী পায়ের এক বনজঙ্গল ভাঙার শব্দ

হ'ল, তারপরেই সব আবার চুপচাপ।

দুই চক্ষে অন্ধকার দেখতে দেখতে কুমার অবশ হয়ে সেইখানে বসে পড়ল। তার প্রাণ-মন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল—খানিকক্ষণ সে কিছুই ভাবতে পারলে না!

অনেকক্ষণ পরে তার মাথা একটু একটু ক'রে পরিষ্কার হয়ে এল।

মৃণু তো সকলের আগেই গিয়েছে, তারপর গেলেন বিনয়বাবু, তারপর রামহরি, তারপর বিমল! বাকি রইল এখন কেবল সে নিজে। কিন্তু তাকেও যে এখনি ঐ ভয়ঙ্কর অজ্ঞাতের কবলে গিয়ে পড়তে হবে না, তাই-ই বা কে বলতে পারে?

শোকে কুমারের মনটা একবার হু-হু ক'রে উঠল, কিন্তু সে জোর ক'রে নিজের দুর্বলতা দমন ক'রে ফেললে। এ-রকম অবস্থায় হাত-পা গুটিয়ে অচল হয়ে বসে যারা শোক বা হাহাকার করে, তারা হচ্ছে পঙ্গু বা কাপুরুষ। কুমার কোনদিন সে দলে ভিড়বে না।

তার আশেপাশে লুকিয়ে আছে যে-সব জীব, তাদের অমানুষিক কণ্ঠের চিৎকার সে শুনেছে, তাদের বিরাট পায়ের দাগও সে মাটির উপরে দেখেছে এবং তাদের একজনের অভাবিত একখানা হাতও এইমাত্র তার চোখের সুমুখ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কুমার বেশ ভাল করেই বুঝতে পারলে যে, যাদের হাত, পা ও কণ্ঠস্বর এমনধারা, তাদের সামনে একাকী গিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টাটা হবে কালবোশেখী ঝড়ের বিরুদ্ধে একটা মাছির তুচ্ছ চেষ্টার মতোই হাস্যকর! এমন অবস্থায় কোন সাহসী ও বলিষ্ঠ লোকও যদি প্রাণ হাতে ক'রে ফিরে আসে, তাহলে কেউ তাকে কাপুরুষ বলতে পারবে না।—এ-কথাটাও তার মনে হ'ল। কিন্তু তখনি সে-কথা ভুলে কুমার নিজের মনে-মনেই বললে, 'মানুষের কাছে একটা ক্ষুদে লাল পিঁপড়ে কতটা নগণ্য! মানুষের একটা নিঃশ্বাসে সে উড়ে যায়! কিন্তু মানুষ যদি সেই তুচ্ছ লাল পিঁপড়ের গায়ে হাত দেয়, তাহলে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সে মানুষকে আক্রমণ করতে একটুও ভয় পায় না। আমিও ঐ লাল পিঁপড়ের মতোই হতে চাই! বিমল যদি মারা

পড়ে থাকে, তাহলে যে-পৃথিবীতে বিমল নেই, আমিও সেখানে বেঁচে থাকতে চাই না! যে-পথে বিনয়বাবু গেছেন, রামহরি গেছে, বিমল গেছে, আমিও যাব সে-পথে। যদি প্রতিশোধ নিতে পারি, প্রতিশোধ নেব। যদি মৃত্যু আসে, মৃত্যুকে বরণ করব।' কুমার উঠে দাঁড়াল।

বাঘাকে ধরে রাখা দায়! উপরকার পাহাড়ের যেখানে খানিক আগে শত্রু-হস্ত আবির্ভূত হয়েছিল, বিষম গর্জন করতে করতে বাঘা এখন সেইখানেই যেতে চায়! বারংবার হুমকি দিয়ে সে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু তারপরেই শিকলে বাধা পেয়ে পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সুমুখের দু'পায়ে যেন মহা আক্রোশে শূন্যকেই আঁচড়াতে থাকে—কুমারের হাত থেকে শিকল খসে পড়ে আর কি!

কিন্তু কুমার শিকলটাকে হাতে পাকিয়ে ভাল ক'রে ধরে রইল—সে বুঝলে, এই ভয়াবহ দেশে একবার হাতছাড়া হলে বাঘাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না! এখন বাঘাই তার একমাত্র সঙ্গী—তার কাছ থেকে সে অনেক সাহায্যই প্রত্যাশা করে! এ-পথে এখন বাঘা তার শেষ বন্ধু!

পাহাড়ের গা বয়ে বয়ে কুমার উপরে উঠতে লাগল। খানিক পরেই বিমল যেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছিল, সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। কিন্তু সেখানে শত্রু বা মিত্র কারুর কোন চিহ্নই নেই।

কুমার পায়ের তলায় পাহাড়ের গা তীক্ষ্ণ নেত্রে পরীক্ষা ক'রে দেখলে। কিন্তু রক্তের দাগ না দেখে কতকটা আশ্বস্ত হ'ল।

সে এখন কি করবে? কোনদিকে যাবে? এখানে তো পথের বা বিপথের কোন চিহ্নই নেই! যতদূর চোখ যায়, গাছপালা জঙ্গল নিয়ে পাহাড়ের ঢালু গা ক্রমেই উপরের দিকে উঠে গিয়েছে!

কিন্তু কুমারকে কোনদিকে যেতে হবে, বাঘাই আবার তা জানিয়ে দিলে। এদিকে-ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বাঘা যে কিসের গন্ধ পেলে তা কেবল বাঘাই জানে, কিন্তু তারপরেই মাটির উপরে মুখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি সে আবার এগিয়ে চলল। একটুপরেই ঘন জঙ্গল তাদের যেন

গিলে ফেললে!

অল্পদূর অগ্রসর হয়েই জঙ্গলের ভিতরে আবার একটা পায়েচলা পথ পাওয়া গেল। সে-পথের উপরে বড় বড় গাছের ছায়া এবং দু'-ধারে ঝোপঝাপ আছে বটে, কিন্তু পথটা যেখান দিয়ে গেছে, সেখান থেকে ঝোপঝাপ কারা যেন যতটা সম্ভব সাফ ক'রে রেখেছে!

এইভাবে বাঘার সঙ্গে কুমার প্রায় ঘন্টা-তিনেক পথ দিয়ে ক্রমাগত উপরে উঠতে লাগল। কিন্তু সারাপথে কেবল দু'-চারটে বুনো কুকুর ছাড়া আর কোন প্রাণীর সাক্ষাৎ পেলে না। শত্রুরা এখনও লুকিয়ে তার উপর নজর রেখেছে কি না, সেটাও বুঝতে পারলে না। বিপুল পরিশ্রমে তার শরীর তখন নেতিয়ে পড়েছে এবং এমন হাঁপ ধরেছে যে, খানিকক্ষণ না জিরিয়ে নিলে আর চলা অসম্ভব।

পথটা তখন একেবারে পাহাড়ের ধারে এসে পড়েছে, সেখান থেকে নিচের দিকটা দেখাচ্ছে ছবির মতো।

সেইখানে বসে পড়ে কুমার 'ফ্লাস্ক' থেকে জলপান ক'রে আগে নিজের প্রবল তৃষ্ণাকে শান্ত করলে। বাঘাও করুণ ও প্রত্যাশী চোখে তার মুখের পানে তাকিয়ে আছে দেখে তাকেও জলপান করতে দিলে!

তারপর চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, সে কি দৃশ্য! একদিকে পর্বত-সমুদ্রের প্রস্তরীভূত স্থির তরঙ্গদল দৃষ্টিসীমা জুড়ে আছে এবং তারপরেই কাঞ্চনজঙ্ঘার সুগম্ভীর চির-তুষারের রাজ্য! আর একদিকে বনশ্যামল পাহাড়ের দেহ পৃথিবীর দিকে দিকে নেমে গিয়েছে এবং উজ্জ্বল রুপোর একটি সাপের মতন রঙ্গিত-নদী এঁকেবেঁকে খেলা করতে করতে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে,—এত উঁচু থেকে তার কল-গীতিকা কানে আসে না।

আশেপাশে, কাছে-দূরে সরল ও সিন্দুর গাছেরা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও ম্যাগ্নোলিয়া এবং কোথাও বা রোডোডেনড্রন ফুল ফুটে মর্ত্যের সামনে স্বর্গের কল্পনাকে জাগিয়ে তুলেছে।

কিন্তু এমন মোহনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করবার মতন চোখ ও সময় কুমারের তখন ছিল না। এবং বাঘার লক্ষ্য এ-সব কোনদিকেই নেই—

তার চেষ্টা কেবল এগিয়ে যাবার জন্যেই।

খানিকক্ষণ হাঁপ ছেড়ে কুমার আবার উঠে পড়ে অগ্রসর হ'ল।

ঘণ্টাখানেক পথ চলবার পরেই দেখা গেল, পথের সামনেই পাহাড়ের একটা উঁচু, খাড়া গা দাঁড়িয়ে আছে। কুমার ভাবতে লাগল, তাহলে এ-পথটা কি ঐখানেই গিয়ে শেষ হয়েছে! কিন্তু ওখানে তো আর কোন কিছুরই চিহ্ন নেই। তবে কি আমি ভুল পথে এসেছি,—এত পরিশ্রম একেবারেই ব্যর্থ হবে?

সেই খাড়া-পাহাড়ের কাছে এসে কুমার দেখলে, না, পথ শেষ হয় নি—ঐ খাড়া-পাহাড়ের তলায় এক গুহা,—পথটা তার ভিতরেই ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেছে!

তবে কি ঐ গুহাটাই হচ্ছে সেই রাক্ষুসে জীবদের আস্তানা?

বাহির থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে কুমার গুহার ভিতরে কিছুই দেখতে পেলে না—তার ভিতরে স্তম্ভিত হয়ে বিরাজ করছে কেবল ছিদ্রহীন অন্ধকার ও ভীষণ স্তব্ধতা!

'টর্চে'র আলো ফেলেও বোঝা গেল না, গুহাটা কত বড় এবং তার ভিতরে কি আছে।

বাঘা সেই গুহার ভিতরে ঢুকবার জন্যে বিষম গোলমাল করতে লাগল।

বাঘার রকম দেখে কুমারেরও বুঝতে বাকি রইল না যে, শত্রুরা ঐ গুহার ভিতরেই আছে।

এখন কি করা উচিত? গুহার বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেও কোন লাভ নেই এবং গুহার ভিতরে ঢুকলেও হয়তো কোন সুবিধাই হবে না—শত্রুরা হয়তো তার জন্যই আনাচে-কানাচে গা-ঢাকা দিয়ে আছে, একবার সে ভিতরে গিয়ে ঢুকলেই পোকা-মাকড়ের মতন তাকে টিপে মেরে ফেলবার জন্যে।

কুমার বাঁ-হাতে বাঘার শিকল নিলে। রিভলবারটা খাপ থেকে বার ক'রে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখলে। তারপর ডানহাতে 'টর্চ'টা নিয়ে গুহার ভিতরে প্রবেশ করলে।

আট

গুহার ভিতরে

বাইরের প্রখর আলো ছেড়ে গুহার ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই চতুর্দিক-ব্যাপী প্রচণ্ড ও বিপুল এক অন্ধকারে কুমার প্রথমটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তার 'টর্চে'র আলো-বাণে বিদ্ধ হয়ে অন্ধকারের অদৃশ্য আত্মা যেন নীরবে আর্তনাদ ক'রে উঠল। সেখানকার অন্ধকার হয়তো জীবনে এই প্রথম আলোকের মুখ দেখলে!

'টর্চে'র আলোক-শিখা ক্রমেই কম-উজ্জ্বল হয়ে দূরে গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল। কুমার বুঝলে, এ বড় যে-সে গুহা নয়! 'টর্চে'র মুখ ঘুরিয়ে ডাইনে-বাঁয়েও আলো ফেলে সে পরীক্ষা ক'রে দেখলে, কিন্তু কোনদিকেই অন্ধকারের থই পাওয়া গেল না।

এত বড় গুহা ও এত জমাট অন্ধকারে ভিতরে কোনদিকে যে যাওয়া উচিত, সেটা আন্দাজ করতে না পেরে কুমার চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু বাঘার ঘ্রাণ শক্তি তাকে বলে দিলে, শত্রুরা কোনদিকে গেছে! শিকলে টান মেরে সে আবার একদিকে অগ্রসর হতে চাইলে। অগত্যা কুমারকেও আবার বাঘার উপরেই নির্ভর করতে হ'ল।

কিন্তু আগেকার মতো বাঘা এখন আর দ্রুতবেগে অগ্রসর হ'ল না। সে কয়েকপদ এগিয়ে যায়, আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে কান খাড়া ক'রে কি যেন শোনে এবং গরর গরর ক'রে গজরাতে থাকে। যেন সে শত্রুর খোঁজ পেয়েছে!

কিন্তু সেই ভীষণ অন্ধকারের রাজ্যে শত্রুরা যে কোথায় লুকিয়ে আছে, অনেক চেষ্টার পরেও কুমার তা আবিষ্কার করতে পারলে না।

অদ্ভুত সেই অন্ধকার গুহার স্তব্ধতা! বাদুড়ের মতন অন্ধকারের

জীবের পাখনাও সেখানে ঝটপট করছে না,—স্থির স্তব্ধতার মধ্যে নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে এবং নিজের পায়ের শব্দে নিজেরই গায়ে কাঁটা দেয়।

কিন্তু বাঘার হাবভাবের অর্থ কুমার ভাল-রকমই জানে। যদিও শত্রুর কোন চিহ্নই তার নজরে ঠেকল না, তবু এটুকু সে বেশ বুঝতে পারলে যে, বাঘা যখন এমন ছটফট করছে তখন শত্রুরা আর বেশি দূরে নেই; হয়তো কোন আনাচে-কানাচে গা-ঢাকা দিয়ে তারা তার প্রত্যেক গতিবিধিই লক্ষ্য করছে। কিন্তু একটা বিষয় কুমারের কাছে অত্যন্ত রহস্যের মতো মনে হ'ল। অনেকের মুখেই শত্রুদের যে দানব-মূর্তির বর্ণনা সে শ্রবণ করেছে এবং তাদের একজনের যে অমানুষিক হাত সে স্বচক্ষে দর্শন করেছে, তাতে তো তাদের কাছে তার ক্ষুদ্র দেহকে নগণ্য বলেই মনে হয়। তার উপরে এই অজানা শত্রুপুরীতে সে এখন একা এবং একান্ত অসহায়। যখন তারা দলে ভারী ছিল, শত্রুরা তখনই বিনয়বাবু, রামহরি ও বিমলকে অনায়াসেই হরণ করেছে। এবং এত বড় তাদের বুকের পাটা যে, আধুনিক সভ্যতার লীলাক্ষেত্র দার্জিলিঙে গিয়ে হানা দিতেও তারা ভয় পায় না। কিন্তু তারা এখনো কেন লুকিয়ে আছে,—কেন তাকে আক্রমণ করছে না? এর কারণ কি? কিসের ভয়ে তারা সুমুখে আসতে রাজি নয়?

এমনি ভাবতে ভাবতে কুমার প্রায় আধ মাইল পথ এগিয়ে গেল। তখনো গুহা শেষ হ'ল না!

এখনো বাঘা মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চাপা গর্জন করছে বটে, কিন্তু এখন তার ভাব-ভঙ্গিতে কুমার একটা নূতনত্ব লক্ষ্য করলে।

বাঘা এখন আর ডাইনে-বাঁয়ে বা সামনের দিকে তাকাচ্ছে না—বারবার দাঁড়িয়ে সে পিছনপানে ফিরে দেখছে আর গর্জন ক'রে উঠছে! যেন শত্রু আছে পিছনদিকেই! এ সময়ে কুমারের মনের ভিতরটা যে কি-রকম করছিল, তা আর বলবার নয়।

আর-একটা ব্যাপার তার নজরে পড়ল! 'টর্চে'র আলোতে সে

দেখতে পেলে, তার ডাইনে আর বাঁয়ে গুহার কালো পাথুরে গা দেখা যাচ্ছে। তাহলে গুহাটা ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে।

আরো-খানিকটা এগুবার পর গুহার দুদিকের দেওয়াল তার আরো কাছে এগিয়ে এল। এখন সে যেন একটা হাত-পনেরো চওড়া পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

আরো-কিছুপরেই মনে হ'ল, সামনের দিকের অন্ধকার যেন একটু পাতলা হয়ে এসেছে। কয়েক পা এগিয়ে আলো ফেলে দেখা গেল, গুহা-পথ সেখানে ডানদিকে মোড় ফিরেছে।

মোড় ফিরেই কুমার সবিস্ময়ে দেখলে, গুহার পথ আবার ক্রমেই চওড়া এবং ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়ে আর একটা বিরাট গুহার সৃষ্টি করেছে।

এ গুহা অন্ধকার নয়, আলো-আঁধারিতে এখানকার খানিকটা দেখা যাচ্ছে এবং খানিকটা দেখা যাচ্ছে না। সন্ধ্যার কিছু আগে পৃথিবী যেমন আলোছায়ার মায়াভরা হয়, এই নতুন গুহার ভিতরে ঠিক তেমনিধারাই আলো আর ছায়ার লীলা দেখা যাচ্ছে।

এই আলো-আঁধারির পরে একদিকে ঠিক আগেকার মতই নিরেট অন্ধকার বিরাজ করছে এবং আর একদিকে—অনেক তফাতে উপর থেকে একটা উজ্জ্বল আলোকের ঝরনা ঝরে পড়ছে। অর্থাৎ এখানে একদিক থেকে আসছে অন্ধকারের স্রোত এবং আর একদিক থেকে আসছে আলোকের ধারা,—এই দুইয়ে মিলেই এখানকার বিচিত্র আলোছায়ার সৃষ্টি হয়েছে।

আচম্বিতে এই নতুন গুহার ভিতরে দূরে থেকে—নিবিড় অন্ধকারের দিক থেকে জেগে উঠল মানুষের মর্মভেদী আর্তনাদ। অত্যন্ত যন্ত্রণায় কে যেন তীক্ষ্ণ স্বরে কেঁদে উঠল। তারপরেই সব চুপচাপ।

কার এ কান্না? নিশ্চয়ই বিমলের নয়, কারণ মৃত্যুর মুখে পড়লেও বিমল যে কোনদিনই কাতরভাবে কাঁদবে না, কুমার তা জানত। মঙ্গল-গ্রহে ও ময়নামতীর মায়া-কাননে গিয়ে বিনয়বাবুর সাহসও সে দেখেছে,

তিনিও এমন শিশুর মতন কাঁদবেন বলে মনে হয় না। তবে কি রামহরি বেচারিই এমনভাবে কেঁদে উঠল? অসম্ভব নয়! তার বুকের পাটা থাকলেও ভূতের ভয়ে সে সব করতে পারে! হয়তো কল্পনায় ভূত দেখে সে ককিয়ে উঠেছে!···না, কল্পনাই বা বলি কেন, আজ সকালেই আমার চোখের উপরে যে-হাতের বাঁধনে বিমল বন্দী হয়েছে, সে কি মানুষের হাত?

কিন্তু এ আর্তনাদ যারই হোক, তার উৎপত্তি কোথায় এবং কোন-দিকে? ভাল ক'রে বোঝবার আগেই সেই আর্তনাদ থেমে গেল—কেবল গুহার বিরাট গর্তের মধ্যে সেই একই কণ্ঠের আর্তনাদ প্রতিধ্বনির মহিমায় বহুজনের কান্নার মতন চারিদিক অল্পক্ষণ তোলপাড় করে আবার নীরব হ'ল। গুহার মধ্যে আবার অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা—নিজের হৃৎপিণ্ডের ঢুপঢুপুনি নিজের কানেই শোনা যায়!

কুমার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলে—যদি আবার সেই কান্না শোনা যায়! কিন্তু কান্না আর শোনা গেল না।

তখন কুমার বাঘাকে ডেকে শুধোলে, "হ্যাঁ রে বাঘা, এবারে কোন-দিকে যাব বল দেখি?"

বাঘা যেন মনিবের কথা বুঝতে পারলে। সে একবার ল্যাজ নাড়লে। একবার পিছনপানে চেয়ে গরর-গরর করলে, তারপর ফিরে পাহাড়ের ঢালু গা বয়ে নিচের দিকে নামতে লাগল।

বাঘার অনুসরণ করতে করতে কুমার নিজের মনে-মনেই বলতে লাগল, 'বাঘার বারবার পিছনে ফিরে তাকানোটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না! শত্রুরা নিশ্চয়ই আমার পালাবার পথ বন্ধ করেছে। এখন সামনের দিকে এগুনো ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। প্রাণ নিয়ে ফেরবার কোন আশাই দেখছি না,—এখন মরবার আগে একবার খালি বিমলের মুখ দেখতে চাই।'

···গুহার মেঝে আর ঢালু নেই, সমতল। কুমার আলোকের সেই

ঝরনার দিকে এগিয়ে চলল। চারিদিকে আগে অন্ধকারের বেড়াজাল তারপর আবছায়ার মায়া এবং তারই মাঝখানে সেই আলো-নির্ঝর ঝরে পড়ছে, যেন দয়ালু আকাশের আশীর্বাদ! কী মিষ্টি সে আলো! কুমার আন্দাজে বুঝলে, গুহার ছাদে নিশ্চয় কোথাও একটা বড় ফাঁক আছ!

হঠাৎ অনেকদূর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ জেগে উঠল!

কুমার চমকে উঠে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। বাঘাও উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

শব্দটা প্রথমে অস্পষ্ট ছিল, তারপরে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তারপর শব্দ যখন আরো কাছে এসে পড়ল, কুমারের গা তখন শিউরে উঠল!

এ শব্দ যেন তার পরিচিত। কাল রাত্রেই সে যে এই শব্দ শুনেছে! এ যেন স্টীমার 'কু' দিচ্ছে। একটা-দুটো নয়, অনেকগুলো,—যেন শত শত স্টীমার একসঙ্গে 'কু' দিতে দিতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে! সেই উদ্ভট ও বীভৎস ঐকতান ক্রমেই তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে উঠে সমস্ত গুহাকে পরিপূর্ণ ক'রে ফেললে এবং তার সঙ্গে যোগ দিলে চারিদিক থেকে অসংখ্য প্রতিধ্বনি। সেই শান্ত ও স্তব্ধ গুহা দেখতে দেখতে যেন এক শব্দময় নরক হয়ে উঠল! বাঘাও পাল্লা দিয়ে চ্যাঁচাতে শুরু করলে —কিন্তু অনেকগুলো তোপের কাছে সে যেন একটা ধানি-পটকার আওয়াজ মাত্র!

এই ভয়াবহ গোলমালের হেতু বুঝতে না পেরে কুমার কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে রইল, খানিকক্ষণ।

কিন্তু গোলমালটা ক্রমেই তার কাছে এসে পড়ল। আবছায়ার ভিতরে জেগে উঠল দলে দলে কতকগুলো সৃষ্টিছাড়া অতি-ভয়ঙ্কর মূর্তি ...এতদূর থেকে তাদের ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু তাদের অমানুষী দেহের বিশালতা যে বিস্ময়কর, এটুকু অনায়াসেই আন্দাজ করা যায়!

কুমার তাড়াতাড়ি বাঘাকে টেনে নিয়ে যে-পথে এসেছিল সেইদিকে ফিরতে গেল—কিন্তু ফিরেই দেখলে তার পালাবার পথ জুড়ে খানিক

তফাতে তেমনি বীভৎস এবং তেমনি ভয়ঙ্কর অনেকগুলো অসুরের মূর্তি সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে, দুঃস্বপ্নের মতো!

সে ফিরে আর একদিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু বেশিদূর যেতে হ'ল না, সেদিকেও অন্ধকারের ভিতর থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল আরো কতকগুলো মূর্তিমান বিভীষিকা! প্রত্যেক মূর্তিই মাথায় হাতির মতন উঁচু!

এতক্ষণ সকলে আঁধারে গা ঢেকে ওত পেতে ছিল, এইবারে সময় বুঝে চতুর্দিক থেকে আত্মপ্রকাশ ক'রে তারা কুমারকে একেবারে ঘিরে ফেললে!

বাঘাও আর চ্যাঁচালে না, সেও যেন হতভম্ব হয়ে গেল।

গুহার অন্ধকার এখন কুমারের চোখের ভিতরে এসে তার দৃষ্টিকেও অন্ধকার ক'রে দিলে।

নয়

অন্ধকারের গর্তে

কি ভয়ানক, কি ভয়ানক! মাথায় হাতির সমান উঁচু, দেখতে মানুষের মতন, কিন্তু কী বিভীষণ আকৃতি! তাদের সর্বাঙ্গে গরিলার মতন কালো কালো লোম এবং তাদের ভাঁটার মতন চোখগুলো দিয়ে হিংস্র ও তীব্র দৃষ্টি বেরিয়ে এসে কুমারের স্তম্ভিত মনকে যেন দংশন করতে লাগল!

সেই অমানুষিক মানুষদের মধ্যে পুরুষও আছে, স্ত্রীলোকও আছে, —কিন্তু সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

কুমার লক্ষ্য ক'রে দেখলে, দূর থেকে সার বেঁধে অসংখ্য মূর্তি দ্রুত-পদে এগিয়ে আসছে—ঠিক যেন মিছিলের মতো। সেই বীভৎস মূর্তি-গুলোই হাত তুলে লাফাতে লাফাতে চিৎকার করছে আর মনে হচ্ছে, যেন অনেকগুলো স্টীমার একসঙ্গে কু দিচ্ছে!...কোন জীবের কণ্ঠ থেকে যে অমন তীক্ষ্ণ এবং উচ্চ আওয়াজ বেরুতে পারে সেটা ধারণা করাই অসম্ভব!

কিন্তু কিসের ঐ মিছিল? প্রথমটা কুমার ভাবলে, হয়তো ওরা তাকেই আক্রমণ করতে আসছে। কিন্তু তারা যখন আরো কাছে এগিয়ে এল, তখন বেশ বোঝা গেল, ও-দলের কারুর দৃষ্টি কুমারের দিকে নেই। নিজেদের খেয়ালে তারা নিজেরাই মত্ত হয়ে আছে।

চারিদিকের অন্ধকারের ভিতর থেকে এতক্ষণে আরো যে-সব অপরূপ মূর্তি একে একে বেরিয়ে আসছিল, তারাও এখন যেন কুমারের অস্তিত্বের

কথা একেবারেই ভুলে গেল,—অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে সেই মিছিলের দিকে তাকিয়ে তারাও সবাই হাত-পা ছুঁড়ে লাফাতে লাফাতে তেমনি বিকট স্বরে চিৎকার জুড়ে দিলে ! এ কী ব্যাপার ? কেন এত লম্ফ-ঝম্প, আর কেনই বা এত হট্টগোল ?

কুমার কিছুই বুঝতে পারলে না বটে, কিন্তু আর একটা নতুন ব্যাপার আবিষ্কার করলে। সেই বিরাট মিছিলের আগে আগে মিশ-মিশে কালো কি একটা জীব আসছে! কী জীব ওটা ? কুকুর বলেই তো মনে হয় !

কুমারের দৃষ্টি যখন মিছিল নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছে, তখন হঠাৎ একটা অভাবিত কাণ্ড ঘটে গেল। এখানকার এই অদ্ভুত মানুষগুলোকে দেখে বাঘা এতক্ষণ ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল বটে, কিন্তু নিজেদের জাতের নতুন একটি নমুনা দেখে তার সে-ভাব আর রইল না, —আচম্বিতে এক হ্যাঁচকা-টান মেরে শিকল-সুদ্ধ কুমারের হাত ছাড়িয়ে সে সেই মিছিলের কুকুরটার দিকে ছুটে গেল, তীরের মতন বেগে !

এর জন্যে কুমার মোটেই প্রস্তুত ছিল না, কাজেই বাঘাকে সে নিবারণ করতেও পারলে না।

তারপর কী যে হ'ল কিছুই বোঝা গেল না,—কারণ সেই দানব-মানুষগুলো চারিদিক থেকে ব্যস্তভাবে ছুটে এসে বাঘাকে একেবারে তার চোখের আড়াল ক'রে দিলে !

কুমার বুঝলে, বাঘার আর কোন আশাই নেই, এই ভয়াবহ জীব-গুলোর কবল থেকে বাঘাকে সে আর কিছুতেই উদ্ধার করতে পারবে না।

হঠাৎ আর একদিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। একটা ভীষণ দানবমূর্তি তার দিকেই বেগে এগিয়ে আসছে! কুমার সাবধান হবার আগেই সে তার ঘাড়ের উপর এসে পড়ল এবং তাকে ধরবার জন্যে কুলোর মতন চ্যাটালো একখানা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিলে।...কুমার টপ ক'রে মাটির উপর ব'সে পড়ল এবং সেই অসম্ভব হাতের বাঁধনে ধরা পড়বার আগেই নিজের কোমরবন্ধ থেকে রিভলবারটা খুলে নিয়ে তিন-চারবার

গুলিবৃষ্টি করলে।! গুলি খেয়ে দানবটা ভীষণ আর্তনাদ ক'রে কয়েক পা পিছিয়ে গেল, এবং সেই ফাঁকে কুমার দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে প্রাণপণে দৌড়তে লাগল।

দৌড়তে দৌড়তে কুমার আবার নিবিড় অন্ধকারের ভিতর এসে পড়ল। দৌড়ে কোথায় যাচ্ছে সে তা বুঝতে পারলে না বটে, কিন্তু তার পিছনে পিছনে মাটির উপরে ভারী ভারী পা ফেলে সেই আহত ও ক্রুদ্ধ দানবটা যে ধেয়ে আসছে এটা তার আর জানতে বাকি রইল না।

আচম্বিতে কুমারের পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে গেল, দুই হাতে অন্ধকার শূন্যকে আঁকড়ে ধরার জন্যে সে একবার বিফল চেষ্টা করলে এবং পরমুহূর্তে কঠিন পাথরের গায়ে আছড়ে প'ড়ে সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেললে।

কতক্ষণ পরে তার জ্ঞান হ'ল সে তা জানে না। কিন্তু চোখ খুলে সে আবার দেখলে তেমনি ছিদ্রহীন অন্ধকারেই চারিদিক আবার সমাধির মতোই স্তব্ধ, দানবের কোন সাড়াই আর কানে আসে না। এদিকে-ওদিকে হাত বুলিয়ে অনুভবে বুঝলে, সে পাহাড়ের গায়েই শুয়ে আছে। আস্তে আস্তে উঠে বসল। দু'চারবার হাত-পা নেড়ে-চেড়ে দেখলে তার দেহের কোন জায়গা ভেঙে গেছে কিনা।

হঠাৎ সে চমকে উঠল! অন্ধকারে পায়ের শব্দ হচ্ছে!

কুমার একলাফে দাঁড়িয়ে উঠেই শুনলে—"কুমার, তোমার কি বেশি চোট লেগেছে?"

এ যে বিনয়বাবুর গলা!

বিপুল বিস্ময়ে কুমার বলে উঠল, "বিনয়বাবু! আপনি?"

—"হ্যাঁ কুমার, আমি।"

—"আমিও এখানে আছি কুমার।"

—"অ্যাঁ! বিমল! তুমি তাহ'লে বেঁচে আছ।"

—"হ্যাঁ ভাই, আমি বেঁচে আছি, রামহরিও বেঁচে আছে, আরো অনেকেও বেঁচে আছে। কিন্তু আর বেশিদিন কারুকেই বাঁচতে হবে না।

দিনে দিনে আমাদের দল থেকে ক্রমেই লোক কমে যাচ্ছে। মৃত্যুর স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমরা বেঁচে আছি!"

—"কি বলছ বিমল, তোমার কথা যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

—"একে একে সব কথাই শুনতে পাবে। আগে তোমার কথাই বল।"

দশ

অন্ধকারের বুকে আলোর শিশু

কুমার নিজের সব কথা বিমলের কাছে বলে জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু তোমরা সবাই কেমন ক'রে এখানে এসে মিললে?"

বিমল বললে, "আমাদের ইচ্ছায় এ মিলন হয় নি। এ মিলন ঘটিয়েছে শত্রুরাই।"

—"বিমল, তোমার কথা আমার কাছে হেঁয়ালির মতন লাগছে। আমাকে সব বুঝিয়ে দাও।"

—"এর মধ্যে বোঝাবুঝির কিছু নেই কুমার। কাদের হাতে আমরা বন্দী হয়েছি, তা তুমি জানো। কখন আমরা বন্দী হয়েছি, তাও তুমি জানো। এখন আমরা কোথায় আছি তাও তোমার অজানা নয়।"

—"না বিমল, এখন আমরা কোথায় আছি, তা আমার জানা নেই, চারিদিকে যে ঘুটঘুটে অন্ধকার!"

বিমল বললে, "এটা একটা মস্ত-বড় লম্বা-চওড়া গর্ত।"

বিনয়বাবু বললেন, "আর, এই গর্তটা হচ্ছে আমাদের শত্রুদের বন্দীশালা।"

—"বন্দীশালা?"

—"হ্যাঁ। শত্রুরা আমাদের এখানে বন্দী ক'রে রেখেছে। তুমি যেচে এই কারাগারে এসে ঢুকেছ। এর চারিদিকে খাড়া পাথরের উঁচু দেওয়াল।

এখান থেকে পালাবার কোন উপায়ই নেই।"

একটু তফাত থেকে রামহরির কাতরকণ্ঠ শোনা গেল—"ভূতের জেলখানা! বাবা মহাদেব। রোজ তোমার পুজো করি, এই কি তোমার মনে ছিল বাবা?"

কুমার বললে, "তাহলে শত্রুরা তোমাদের সকলকে একে একে ধরে এনে এইখানে বন্ধ ক'রে রেখেছে?"

বিমল বললে, "হ্যাঁ। খালি আমরা নই, আমাদের সঙ্গে এই গর্তের মধ্যে আরো অনেক পাহাড়ী লোকও বন্দী হয়ে আছে। দার্জিলিং আর হিমালয়ের নানান জায়গা থেকে তাদের ধরে আনা হয়েছে।"

—"এর মধ্যে মৃণু নেই?"

—"না। মৃণু কেন, এই গর্তের ভেতরে কোন মেয়েই নেই! তবে মেয়েদের জন্যে আলাদা বন্দীশালা আছে কিনা জানি না।"

—"এ যে এক অদ্ভুত রহস্য! আমাদের বন্দী ক'রে রাখলে এদের কি উপকার হবে?"

—"তা জানি না। কিন্তু বন্দী পাহাড়ীদের মুখে শুনলুম, প্রতি হপ্তায় একজন ক'রে বন্দীকে ওরা গর্ত থেকে বার ক'রে নিয়ে যায়। যে বাইরে যায়, সে নাকি আর ফেরে না।···কুমার এই ব্যাপার থেকে তুমি অনেক কিছুই অনুমান করতে পারো।"

কুমার শিউরে উঠে বললে, "কী ভয়ানক! ওরা কি তবে প্রতি হপ্তায় একজন ক'রে মানুষকে হত্যা করে?"

—"আমার তো তাই বিশ্বাস। হঠাৎ একদিন তোমার কি আমার পালা আসবে। এস, সেজন্যে আমরা আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে থাকি।"

—"সে কি বিমল, আমরা কি কোনই বাধা দিতে পারি না?"

—"না। সিংহের সামনে ভেড়া যেমন অসহায়, ওদের সামনে আমরাও তেমনি। ওদের চেহারা তুমিও দেখেছ, আমিও দেখেছি। ওদের একটা ক'ড়ে আঙুলের আঘাতেই আমাদের দফা রফা হয়ে যেতে পারে। বাধা দিয়ে লাভ?"

কুমার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, "ওরা কে বিমল? রূপকথায় আর আরব্য-উপন্যাসে দৈত্যদানবের কথা পড়েছি। কিন্তু তারা কি সত্যই পৃথিবীর বাসিন্দা?"

কুমারের আরো কাছে সরে এসে বিমল বললে, "কুমার, তাহলে শোনো। আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যদানবরা সত্যি কি মিথ্যে, তা আমি বলতে পারব না বটে, কিন্তু পৃথিবীতে এক সময়ে যে দৈত্যের মতন প্রকাণ্ড মানুষ ছিল, এ-কথা আমি মনে-মনে বিশ্বাস করি। মাঝে মাঝে সে-প্রমাণও পাওয়া যায়। তুমি কি জানো না, এই ভারতবর্ষেই কাটনির কাছে একটি ৩১ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা বিরাট কঙ্কাল পাওয়া গেছে? তার পা দুটোই ১০ ফুট ক'রে লম্বা। সে কঙ্কালটা প্রায় মানুষের কঙ্কালের মতোই দেখতে। রামগড়ের রাজার প্রাসাদে কঙ্কালটা রাখা হয়েছে। আমি স্টেটসম্যানে এই খবরটা পড়েছি।"

বিনয়বাবু বললেন, "দেখ, দার্জিলিংয়ের সুরেনবাবুর কাছে গিয়ে যেদিন 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে'র পুরানো ফাইলে হিমালয়ের রহস্যময় জীবের কথা পড়লুম, সেইদিন থেকে অনেক কথাই আমার মনে হচ্ছে। এর আগেও কোন কোন ভ্রমণ-কাহিনীতে আমি হিমালয়ের 'ঘৃণ্য-তুষার-মানবে'র কথা পড়েছি। 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে' হয়তো তাদেরই কথা বেরিয়েছে। কিন্তু আসলে কে তারা? তারা কি সত্যিই মানুষ, না মানুষের মতন দেখতে অন্য কোন জীব? আধুনিক পণ্ডিতদের নতুন নতুন আবিষ্কারের ভিতরে খুঁজলে হয়তো এ-প্রশ্নের একটা সদুত্তর পাওয়া যেতে পারে।"

কুমার সুধোলে, "আমাদের চেয়ে আপনার পড়াশুনো ঢের বেশি। আপনি কোন সদুত্তর পেয়েছেন কি?"

বিনয়বাবু বললেন, "সে-বিষয়ে আমি নিজে জোর ক'রে কিছু বলতে চাই না। তবে পণ্ডিতদের আবিষ্কারের কথা আমি তোমাদের কাছে বলতে পারি, শোনো।

পণ্ডিতদের মতে, এখন যেখানে হিমালয় পর্বত আছে, অনেক লক্ষ বৎসর আগে মহাসাগরের অগাধ জল সেখানে খেলা করত। কারণ

আধুনিক হিমালয়ের উপরে অসংখ্য সামুদ্রিক জীবের শিলীভূত কঙ্কাল বা দেহাবশেষ অর্থাৎ fossil পাওয়া গিয়েছে।

হিমালয়ের আশেপাশে যে-সব দেশ আছে, এখনো ধীরে ধীরে তারা ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠছে। হিসাব ক'রে দেখা গেছে, কাশীধামের উত্তরদিকের ভূমি এখনো প্রতি শতাব্দীতে ৬ ফুট ক'রে উঁচু হয়ে উঠছে।

হিমালয়ের উর্ধ্বভাগ থেকে রাশি রাশি পচা গাছ-পাতা ও অন্যান্য আজে-বাজে জিনিস পাহাড়ের দুইপাশে নেমে এসে জমা হয়ে থাকত। কালে সেই-সব জায়গা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের (mammals) বিচরণ-ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এখানে তাই আজও এত আদিম জীব-জন্তুর শিলীভূত কঙ্কাল পাওয়া যায় যে, পণ্ডিতেরা এ-জায়গাটাকে 'সেকেলে জীবদের গোরস্থান' ব'লে ডেকে থাকেন।

কিছুদিন আগে Yale North India Expedition-এর পণ্ডিতরা উত্তর-ভারত থেকে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে মানুষের মতন দেখতে এক নতুন জাতের বানরের অস্তিত্ব।

ঐ অভিযানে দলপতি ছিলেন অধ্যাপক Hellmut de Terra সাহেব। উত্তর-ভারতবর্ষে এক বৎসর কাল তিনি অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করেছেন। তাঁর পরীক্ষার ফলে যে-সব দেহাবশেষ পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে কোন-কোনটিকে দেখতে প্রায় মানুষের মতন। অন্তত গরিলা ওরাং-উটান বা শিম্পাঞ্জী বানরদের সঙ্গে তাদের দেহের গড়ন মেলে না। এইরকম দুই জাতের অজানা জীবের নাম দেওয়া হয়েছে Ramapithecus ও Sugrivapithecus। নাম শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে, রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের নামানুসারেই তাদের নামকরণ হয়েছে।

পণ্ডিতদের মতে, উত্তর-ভারতে প্রাপ্ত এই-সব জীবের কোন কোনটির মস্তিষ্ক, গরিলা প্রভৃতি সমস্ত মানব-জাতীয় জীবের মস্তিষ্কের চেয়ে উন্নত।

তাদের মস্তিষ্কের শক্তি ছিল অনেকটা মানুষেরই কাছাকাছি।

কে বলতে পারে, ঐ-সব জীবের কোন কোন জাতি এখনও হিমালয়ের কোন গোপন প্রান্তে বিদ্যমান নেই? তারা সভ্যতার সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায়নি বলে আধুনিক মানুষ তাদের খবর রাখে না। কিন্তু আমরা জানি না বলেই যে তারা বেঁচে নেই, এমন কথা কিছুতেই মনে করা চলে না। হয়তো তারা বেঁচে আছে এবং হয়তো তারা সভ্য না হলেও মস্তিষ্কের শক্তিতে আগেকার চেয়ে উন্নত হয়ে উঠেছে।

বিমল, কুমার! আমি যা জানি আর মনে করি, সব তোমাদের কাছে খুলে বললুম। তবে আমার অনুমানই সত্য বলে তোমরা গ্রহণ না করতেও পারো।"

বিমল বললে, "তাহলে আপনার মত হচ্ছে, মানুষের মতন দেখতে বানর-জাতীয় দানবরাই আমাদের সকলকে বন্দী ক'রে রেখেছে?"

বিনয়বাবু মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, "বললুম তো, ওটা আমার মত না, আমার অনুমান মাত্র।"

কুমার বাহুকেই বালিশে পরিণত ক'রে কঠিন পাথরের উপরে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে।

বিমল প্রভৃতির মুখেও কোন কথা নেই! চারিদিক যেমন স্তব্ধ, তেমনি অন্ধকার।

হঠাৎ কুমারের মনে হ'ল, অন্ধকারের বুক ছ্যাঁদা ক'রে যেন ছোট্ট একটি আলো-শিশু কাঁপতে কাঁপতে হেসে উঠল।

প্রথমটা কুমার ভাবলে, তার চোখের ভুল। কিন্তু ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ভাল করে চেয়ে সে বুঝলে, সে আলো একটা মশালের আলো! গর্তের উঁচু পাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে কেউ মশাল হাতে নিয়ে কি দেখছে! মশালের তলায় একখানা অস্পষ্ট মুখও দেখা গেল—কুমারের মনে হ'ল সে মুখ যেন তারই মতন সাধারণ মানুষের মুখ!

কে যেন উপর থেকে চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় ডাকলে, "কুমারবাবু! কুমারবাবু!"

এ যে নারীর কণ্ঠস্বর! নিজের কানের উপরে কুমারের অবিশ্বাস হ'ল—এই রাক্ষসের মুল্লুকে মানুষের মেয়ে!

এগার

কুকুর-দেবতার মুল্লুক

কেবল কি মানুষের মেয়ে? এ মেয়ে যে তারই নাম ধরে ডাকছে!

কুমার ভাবলে, হয়তো সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে!

আবার উপর থেকে চাপা গলার আওয়াজ এল—"কুমারবাবু!"

এবারে কুমার আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না, চাপা গলায় উত্তর দিলে, "কে?"

উপর থেকে সাড়া এল, "ঠিক আমার নিচে এসে দাঁড়ান।"

কুমার কথা-মত কাজ করলে।

—"এইটে নিন!"

কুমারের ঠিক পাশেই খট্ ক'রে কি একটা শব্দ হ'ল। গর্তের তলায় হাত বুলিয়ে কুমার জিনিসটা তুলে নিলে। অন্ধকারেই অনুভবে বুঝলে, একখণ্ড পাথরের সঙ্গে সংলগ্ন কয়েক টুকরো কাগজ। উপরে মুখ তুলে দেখলে, সেখানে আর মশালের আলো নেই।...আস্তে আস্তে ডাকল, "বিমল!"

বিমল বললে, "হ্যাঁ, আমরাও সব দেখেছি, সব শুনেছি।"

বিনয়বাবু বললেন, "কুমার, তুমি মৃণুকে চিনতে পারলে না?"

কুমার সবিস্ময়ে বললে, "মৃণু! যে আমাকে ডাকলে, সে কি মৃণু? আপনি চিনতে পেরেছেন?"

—"বাপের চোখ নিজের সন্তানকে চিনতে পারবে না?"

—"কিন্তু কি আশ্চর্য! যার খোঁজে এতদূর আসা, তাকে পেয়েও আপনি তার সঙ্গে একটা কথাও কইলেন না?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনয়বাবু বললেন, "কত কষ্টে যে নিজেকে সামলেছি, তা কেবল আমিই জানি কুমার! কিন্তু কি করব বল? যখন দেখলুম এই শত্রুপুরীতে আমার মেয়ে ভয়ে ভয়ে চাপা-গলায় তোমাকেই ডাকছে, তখন নিজের মনের আবেগ জোর ক'রে দমন না করলে মৃণুকে হয়তো বিপদে ফেলা হ'ত!"

বিমল বললে, "দেখুন বিনয়বাবু, আমার বিশ্বাস আপনি আর আমি যে আছি, মৃণু তা জানে না! খুব সম্ভব, কেবল কুমারকেই সে দেখতে পেয়েছে, তাই তাকে ছাড়া আর কারুকে ডাকে নি।"

বিনয়বাবু বললেন, "বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক।"

কুমার বললে, "মৃণু কতকগুলো টুকরো কাগজ দিয়ে গেল, নিশ্চয় তাতে কিছু লেখা আছে। কিন্তু এই অন্ধকারে কেমন ক'রে পড়ব? আমার 'টর্চ' গর্তে পড়বার সময় ভেঙে গেছে।"

বিনয়বাবু বললেন, "কাল আমি দেখেছি, পাহাড়ের এক ফাটল দিয়ে কোন এক সময়ে এই গর্তের ভিতরে সূর্য-রশ্মির একটা রেখা কিছুক্ষণের জন্যে এসে পড়ে। আজও নিশ্চয় সেই আলোটুকু পাওয়া যাবে। অপেক্ষা কর।"

উপর থেকে সূর্যের একটি কিরণ-তীর নিবিড় অন্ধকারের বুক বিদ্ধ ক'রে গর্তের পাথুরে মেঝের উপরে এসে পড়ল।

বিনয়বাবু বললেন, "কুমার, চটপট কাজ সেরে নাও! এ আলো এখনি পালাবে।"

সূর্য-রশ্মির সামনে কাগজের টুকরোগুলো ধরে কুমার দেখলে, একখানা ছোট ডায়েরী থেকে সেগুলো ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। বোধহয়, দানবদের হাতে ধরা পড়বার সময়েই ডায়েরীখানা মৃণুর কাছে ছিল।

ডায়েরীর ছেঁড়া কাগজে পেন্সিলে লেখা রয়েছে—

"কুমারবাবু, কি ক'রে ধরা পড়েছি, সে কথা যদি দিন পাই, তবে বলব। কারণ আমার স্থান ও সময় দুই-ই অল্প।

তবে আপনিও যখন এদের হাতে ধরা পড়েছেন, তখন এরা যে কে ও কি-প্রকৃতির জীব, সেটা বোধ হয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন!

যাদের কাছে আমি আছি, তারা মানুষ কিনা, আমি জানি না। তবে তাদের মুখ আর দেহ মানুষের মতন দেখতে বটে। এরা পরস্পরের সঙ্গে যখন কথা কয়, তখন এদের ভাষাও আছে। কিন্তু এদের ভাষায় কথার সংখ্যা খুবই কম।

কেবল ভাষা নয়, এদের একটা ধর্মও আছে। সে ধর্মের বিশেষ কিছুই আমি জানি না বটে, কিন্তু এরা যে সেই ধর্মের বিধি পালন করবার জন্যেই নানা জায়গা থেকে মানুষ ধরে আনে, এটুকু আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।

কুমারবাবু, আপনি শুনলে অবাক হবেন, এদের প্রধান দেবতা হচ্ছে কুকুর! আর আমি কে জানেন? কুকুর-দেবতার প্রধান পূজারিণী! আমার এখানে আদর-যত্নের অভাব নেই, সবাই আমাকে ভয়-ভক্তিও করে বোধ হয়, কিন্তু এরা সর্বদাই আমাকে চোখে-চোখে রাখে, পাছে আমি পালিয়ে যাই, সেজন্যে চারিদিকেই কড়া পাহারার ব্যবস্থা আছে।

আমার থাকবার জন্যে এরা একটা আলাদা গুহারও ব্যবস্থা করেছে। সে গুহার ভিতরকার কোন কোন আসবাব ও জামা-কাপড় আর দেওয়ালে আজেবাজে জিনিস দিয়ে আঁকা ছবি দেখে মনে হয়, আমার আগেও এখানে অন্য পূজারিণী ছিল এবং সেও আমারই মতন মানুষের মেয়ে।

বোধ হয় এদের দেশে মানুষের মেয়ে ছাড়া আর কেউ পূজারিণী হতে পারে না। একজন পূজারিণীর মৃত্যু হলে, মানুষের দেশ থেকে আবার একজন মেয়েকে বন্দী ক'রে আনা হয়।

প্রতি হপ্তায় একদিন ক'রে এখানে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। এখানকার আলো-ঝরনার ওপাশে আছে মস্ত এক নদী। সে নদী অত্যন্ত

গভীর। এদেশের কেউ সাঁতার জানে না বলে সে-নদীতে ভয়ে কেউ নামে না। এদের ইঙ্গিতে যতটুকু বুঝেছি, সে নদীর নাকি আদিঅন্ত নেই। প্রতি হপ্তায় বিশেষ পূজার দিনে, কুকুর-দেবতাকে নিয়ে আমাকে সেই নদীর ধারে যেতে হয়, আর আমার সঙ্গে সঙ্গে আগে পিছে চলে দলে দলে এখানকার যত না-রাক্ষস, না-মানুষ, না-বানর জীব নাচতে নাচতে আর চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে। নদীর জলে কুকুর-দেবতাকে স্নান করিয়ে আবার ফিরে আসি এবং তারপর যা হয়,—উঃ, সে কথা আর বলবার নয়।

কুমারবাবু, এরা মানুষ চুরি ক'রে আনে কেন, তা জানেন? কুকুর-দেবতার সামনে নরবলি দেবার জন্যে। বলির পরে সেই মানুষের মাংস এরা সবাই ভক্ষণ করে। চোখের সামনে এই ভীষণ দৃশ্য দেখে আমার যে কি অবস্থা হয়, সেটা আপনি অনায়াসেই কল্পনা করতে পারবেন।

এমনি এক বিশেষ পূজার দিনে নদীর ধার থেকে ফিরে আসছি, আচম্বিতে কোথা থেকে মস্ত-বড় একটা কুকুর এসে এখানকার কুকুর-দেবতার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর দুই কুকুরে বিষম ঝটাপটি লেগে গেল। এখানকার কুকুরটা দেবতা হয়েও জিততে পারলে না, নতুন কুকুরের কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্তাক্ত দেহেই কেঁউ কেঁউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে ল্যাজ গুটিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল। নতুন কুকুরটা আমার কাছে এসে মনের খুশিতে ল্যাজ নাড়তে লাগল। তখন একটু আশ্চর্য হয়ে তার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখি, সে হচ্ছে আমাদেরই বাঘা!

বাঘা এখানে কেমন ক'রে এল, অবাক হয়ে এই কথা ভাবতে ভাবতে চোখ তুলেই আপনাকে দেখতে পেলুম। তখন আসল ব্যাপারটা বুঝতে আর দেরি লাগল না। আপনিও এদের কাছে বন্দী হয়েছেন!

বিজয়ী বাঘার বিক্রম দেখে এরা ভারী আনন্দিত হয়েছে। পরাজিত কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিয়ে বাঘাকেই এরা দেবতা বলে মেনে নিয়েছে। এবার থেকে আমাকে বাঘার পূজা করতে হবে।

কুমারবাবু, এখন আমাদের উপায় কি হবে? এই ভীষণ দেশ ছেড়ে

আর কি আমরা স্বদেশে ফিরতে পারব না? আমাকে হারিয়ে না-জানি আমার বাবার অবস্থা কি হয়েছে।

আজ বলির নর-মাংস খেয়ে এরা সারারাত উৎসব করবে। কাল সকালে এরা অনেকেই ঘুমিয়ে পড়বে। যারা পাহারা দেবে তারাও বিশেষ সজাগ থাকবে না। সেই সময়ে আমি আবার চুপিচুপি আপনার গর্তের ধারে যাবার চেষ্টা করব।

এখানে একরকম শক্ত লতা পাওয়া যায়, তাই দিয়ে আমি একগাছা লম্বা ও মোটা দড়ি তৈরি করছি। গর্তের ভিতরে সেই দড়ি ঝুলিয়ে দিলে হয়তো আপনি উপরে উঠেও আসতে পারবেন।

আমাদের অদৃষ্টে কি আছে জানি না, কিন্তু কাল আমরা মুক্তিলাভের চেষ্টা করবই—তারপর কপালে যা থাকে তাই হবে।

আপনি প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। ইতি মৃণু।"

বারো

অন্ধকূপের নীচে

কুমারের পত্রপাঠ শেষ হ'ল।

বিনয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললেন, "এতদিন পরে আমার হারানো মেয়েকে পেয়ে মনে খুব আনন্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু এ আনন্দের কোন দাম নেই।"

কুমার বললে, "কেন বিনয়বাবু? মৃণু তো খুব সুখবরই দিয়েছে। কাল সকালে সে লতা দিয়ে দড়ি তৈরি ক'রে আনবে বলেছে। আমাদের আর এই অন্ধকূপে প'চে মরতে হবে না!"

দুঃখের হাসি হেসে বিনয়বাবু বললেন, "কিন্তু দড়ি বেয়ে উপরে উঠলেও তো আমরা এই অন্ধকূপের গর্ত থেকে বেরুতে পারব না।

অন্ধের মতন এর ভেতরে এসে ঢুকেছি, কিন্তু বেরুবার পথ খুঁজে পাব কেমন ক'রে?"

কুমার খানিকক্ষণ ভেবে বললে, "ভালয় ভালয় যদি বেরুতে না পারি, আমরা ঐ দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।"

বিনয়বাবু বললেন, "তাতে কোনই লাভ হবে না। যুদ্ধে হেরে মরব আমরাই।"

কুমার বললে, "তাদের ভয় দেখিয়ে জিতে যেতেও পারি। আমাদের কাছে তিনটে বন্দুক আর তিনটে রিভলবার আছে। তাদের শক্তি বড় অল্প নয়।"

রামহরি বললে, "তোমরা একটা বন্দুক আমাকে দিও তো। অন্তত একটা ভূতকে বধ ক'রে তবে আমি মরব।"

বিনয়বাবু বললেন, "দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। হ্যাঁ, ভাল কথা। এই গর্তে আরো অনেক মানুষ রয়েছে। এদের কি উপায় হবে?"

কুমার বললে, "কেন, ওরাও আমাদের সঙ্গে যাবে। ওদের সঙ্গে নিলে আমাদের লোকবলও বাড়বে।"

বিনয়বাবু বললেন, "ছাই বাড়বে। দেখছ না, ভয়ে এরা একেবারে নির্জীব হয়ে পড়েছে। কাপুরুষ কোন কাজেই লাগে না।"

কুমার বললে, "বিমল, তুমি যে বড় কথা কইছ না?"

বিমল বললে, "আমি ভাবছি।"

—"কি ভাবছ?"

—"মৃণু চিঠিতে লিখেছে—'আলো-ঝরনার ওপাশে আছে মস্ত এক নদী'—আমি সেই নদীর কথাই ভাবছি।"

—"এখন কি নদী-টদি নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত? আগে নিজের মাথা কি ক'রে বাঁচবে সেই কথাই ভাবো।"

—"কুমার, আমি মাথা বাঁচাবার কথাই ভাবছি। তোমার বন্দুক-টন্দুক বিশেষ কাজে লাগবে না, ঐ নদীই আমাদের মাথা বাঁচাবে।"

কুমার আশ্চর্য হয়ে বললে, "কি-রকম?"

বিমল বললে, "আমরা পাহাড়ের ওপরে আছি। এখানে যদি কোন মস্ত নদী থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই পাহাড়ের গা বেয়ে নিচের দিকে নেমে, এই অন্ধকূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেছে। কেমন, তাই নয় কি?"

—"হুঁ। তারপর?"

—"মৃণু লিখেছে—'এদেশের কেউ সাঁতার জানে না বলে সে-নদীতে ভয়ে কেউ নামে না।' এর চেয়ে ভাল খবর আর কি আছে?"

কুমার হঠাৎ বিপুল আনন্দে একলাফ মেরে বলে উঠল, "বুঝেছি, বুঝেছি, আর বলতে হবে না! উঃ, আমি কি বোকা! এতক্ষণ এই সহজ কথাটাও আমার মাথায় ঢোকে নি!"

বিমল বললে, "এই গর্তের ওপরে উঠে কোন গতিকে একবার যদি সেই নদীতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, তাহলেই আমরা খালাস। দানবরা সাঁতার জানে না, কিন্তু আমরা সাঁতার জানি। নদীর স্রোতে ভেসে অন্ধকূপের বাইরে গিয়ে পড়ব।"

বিনয়বাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, "শাবাশ বিমল, শাবাশ! এত বিপদেও তুমি বুদ্ধি হারাও নি!"

বিমল বললে, "এখন মৃণুর ওপরেই সব নির্ভর করছে। সে যদি না আসতে পারে, তাহলেই আমরা গেলুম!"

রামহরি বললে, "তোমরা একটু চুপ কর খোকাবাবু, আমাকে বাবা মহাদেবের নাম জপ করতে দাও। বাবা মহাদেব তাহলে নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন।"

আচম্বিতে গর্তের ভিতরে একটা বিষম শব্দ হ'ল—তারপরেই ভারী ভারী পায়ের ধুপধুপ আওয়াজ!

অন্ধকারে পিছনে হটতে হটতে বিমল চুপি চুপি বললে, "সরে এস! দেয়ালের দিকে সরে এস! গর্তের ভেতরে শত্রু এসেছে!"

গর্তের অন্য দিক থেকে অনেকগুলো লোক একসঙ্গে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল,—তার মধ্যে একজনের আর্তনাদ যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি মর্মভেদী! সে চিৎকার ক্রমে গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে উপরে গিয়ে উঠল এবং

তারপর ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে দূরে মিলিয়ে গেল!

বিনয়বাবু ভগ্নস্বরে বললেন, "আজ আবার নরবলি হবে। আমাদের আর একজনকে আবার ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কিন্তু আমরা কোন বাধাই দিতে পারলুম না।"

কাল সারারাত গর্তের উপর থেকে রাক্ষুসে উৎসবের বিকট কোলাহল ভেসে এসেছে।

এখনো সকাল হয়েছে কিনা বোঝবার উপায় নেই, কারণ এখানে আলোকের চিহ্ন নজরে পড়ে না।

তবে দানব-পুরী এখন একেবারে স্তব্ধ। এতেই অনুমান করা যায়, অন্ধকূপের বাইরে সূর্যদেব হয়তো এখন চোখ খুলে পৃথিবীর পানে দৃষ্টিপাত করেছেন।

বিমল, কুমার, বিনয়বাবু ও রামহরির সাগ্রহ দৃষ্টির সামনে গর্তের উপরে আবার কালকের মতো সেই মশালের আলো জ্বলে উঠল।

গর্তের উপরে মুখ বাড়িয়ে মৃদুস্বরে মৃণু ডাকলে, "কুমারবাবু!"

কুমার ছুটে গিয়ে সাড়া দিলে, "মৃণু, এই যে আমি!"

—"চুপ! চ্যাঁচাবেন না! শত্রুরা সব ঘুমিয়েছে! এই আমি দড়ি ঝুলিয়ে দিচ্ছি! দড়ি বয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে আসুন।"

বিমল বললে, "কুমার, তুমিই আগে যাও,—তারপর যাব আমরা। গর্তের আর সব লোককেও বলে রেখেছি, তারাও পরে যাবে।"

কুমার দড়ি বয়ে উপরে গিয়ে উঠল। সেখানে এক হাতে বাঘাকে আর এক হাতে মশাল ধরে মৃণু উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। কুমার উপরে উঠতেই সে অগ্রসর হতে গেল।

কুমার বললে, "একটু সবুর কর মৃণু, তোমার বাবাকে উপরে উঠতে দাও।"

মৃণু বিস্মিত ভাবে বললে, "আমার বাবা?"

—"হ্যাঁ, কেবল তিনি নন,—তোমার খোঁজে এসে আমার মতন

বিমল আর রামহরিও বন্দী হয়েছে।"

—"অ্যাঁ, বলেন কি!"

—"ঐ তোমার বাবা উপরে উঠলেন। দাও, বাঘাকে আমার হাতে দাও।"

মৃণু ছুটে গিয়ে বিনয়বাবুর বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দেখতে দেখতে রামহরি ও বিমলও উপরে এসে হাজির হ'ল।

কিন্তু তারপরেই গর্তের ভিতর থেকে মহা হৈ-চৈ উঠল। গর্তের ভিতরে আর যে সব মানুষ বন্দী হয়ে ছিল, মুক্তিলাভের সম্ভাবনায় তারা যেন পাগল হয়ে গেল! তারা সকলেই একসঙ্গে দড়ি বয়ে উপরে আসবার জন্যে চ্যাঁচামেচি ও পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি শুরু ক'রে দিলে।

পরমুহূর্তেই দূর থেকে অন্ধকারের মধ্যে জেগে উঠল রেল-ইঞ্জিনের বাঁশীর মতন তীক্ষ্ণ একটা শব্দ!

মৃণু সভয়ে বললে, "সর্বনাশ, ওদের প্রহরীর ঘুম ভেঙে গেছে!"

—"এখন উপায় ?"

—"আর কোন উপায় নেই। ঐ শুনুন, ওদের পায়ের শব্দ। ওরা এদিকেই ছুটে আসছে!"

তেরো

রাত্রির কোলে সন্ধ্যানদী

আসন্ন মরণের সম্ভাবনায় যারা ছিল এতক্ষণ জড়ভরতের মতন, জীবনের নতুন আশা তাদের সমস্ত নিশ্চেষ্টতাকে একেবারে দূর ক'রে দিলে।

লতা-দিয়ে তৈরি মাত্র একগাছা দড়ি,—কোনরকমে একজন মানুষের ভার সইতে পারে, তাই ধরে একসঙ্গে উপরে উঠতে গেল অনেকগুলো লোক। তাদের সকলের টানাটানিতে সেই দড়িগাছা গেল হঠাৎ পটাস্ ক'রে ছিঁড়ে! শূন্যে যারা ঝুলছিল, নিচেকার লোকদের ঘাড়ের এবং গর্তের পাথুরে মেঝের উপরে তারা হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ল এবং আতঙ্ক ও যন্ত্রণা মাখা এক বিষম আর্তনাদে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

সে আর্তনাদ গর্তের উপরে এসেও পৌঁছলো, কিন্তু সেখানে তখন তা শোনবার অবসর ছিল না কারুরই! দলে দলে দানব ছুটে আসছে, তাদের পায়ের ভারে মাটি কাঁপছে, সকলের কান ছিল কেবল সেই দিকেই।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, "মৃণু, মৃণু! কোনদিক দিয়ে গেলে আলোক-ঝরনা পেরিয়ে নদীর ধারে যাওয়া যায় ?"

মৃণু বললে, "ঐদিকে!"

বিমল বললে, "সবাই তবে ঐদিকেই ছোটো—আর কোন"—

কিন্তু বিমলের কথা শেষ হবার আগেই একটা অতিকায় ছায়ামূর্তি কোথা থেকে তার উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মৃণুর মশালের আলোতে

কুমার সভয়ে দেখলে, সেই ছায়ামূর্তির বিরাট দেহের তলায় পড়ে বিমল যেন একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল!

কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা বন্দুকের শব্দ গিরি-গহ্বরের সেই বদ্ধ আবহাওয়ায় বহুগুণ ভীষণ হয়ে বেজে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়া-মূর্তিটা সশব্দে মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল!

তারপরেই বিমলের গলা শোনা গেল,—"একেবারে বুকে গুলি লেগেছে, এ যাত্রা আর ওকে মানুষ চুরি করতে হবে না। ছোটো ছোটো,—নদীর ধারে—নদীর ধারে!"

সবাই তীরের মতো ছুটতে লাগল। ঐ আলো-ঝরনা দেখা যাচ্ছে, চারিদিকের অন্ধকার পরিষ্কার হয়ে আসছে এবং আলোকের সঙ্গে সঙ্গে আসছে মুক্তির আভাস!

কিন্তু পিছন থেকে অমানুষিক কণ্ঠের তীক্ষ্ণ হুঙ্কার এবং অসংখ্য পায়ের শব্দ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে!

বিমল দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, "কুমার! বিনয়বাবু! ওরা একেবারে কাছে এসে পড়লে আমরা আর কিছুই করতে পারব না। এইবারে আমাদের বন্দুক ছুঁড়তে হবে। এখানে আলো আছে, আমরা লক্ষ্য স্থির করতে পারব!"

একসঙ্গে তিনটে বন্দুক গর্জন ও অগ্নি-উদ্গার করতে লাগল! বন্দুকের গুলি যখন ফুরিয়ে আসে, তখন তিন-তিনটে রিভলবারের ধমক শুরু হয় এবং ইতিমধ্যে রামহরি আবার বন্দুকগুলোতে নতুন কার্তুজ পুরে দেয় এবং বন্দুক আবার মৃত্যুবৃষ্টি করতে থাকে। এবং রামহরি দু-হাত শূন্যে তুলে নাচতে নাচতে চেঁচিয়ে ওঠে—"বোম্ বোম্ মহাদেব! বোম্ বোম্ মহাদেব!"

আর বাঘা খুশি হয়ে ল্যাজ নেড়ে তালে তালে বলে—ঘেউ ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

চারটে দানবের লীলাখেলা একেবারে সাঙ্গ হয়ে গেল, আট-দশটা 'পপাত ধরণীতলে' হয়ে ছটছট করতে লাগল! তাই দেখে আর সবাই

ভয়ে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে আবার অন্ধকারের ভিতরে পিছিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমল বললে, "মৃণু! এইবারে ছুটে নদীর ধারে চল!"

আবার সবাই ছুটতে আরম্ভ করলে। আলো-ঝরনা পার হয়ে আরো খানিকদূর এগিয়েই শোনা গেল, গম্ভীর এক জল-কল্লোল!

তারপর আলো-ঝরনা ছাড়িয়ে সকলে যতই অগ্রসর হয়, চারিদিকের অন্ধকার আবার ততই ঘন হয়ে ওঠে!

বিমল শুধোলে, "মৃণু, আমরা কি আবার অন্ধকারের ভিতর গিয়ে পড়ব?"

মৃণু বললে, "না। এই দেখুন, আমরা নদীর ধারে এসে পড়েছি!" এখানে বেশি আলোও নেই, বেশি অন্ধকারও নেই,—এ যেন মায়া-রাজ্য! মায়া-রাজ্য না হোক, ছায়া-রাজ্য বটে! এখানে কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না—সমস্তই যেন রহস্যময়! এই আলো-আঁধারির মাঝখান দিয়ে যে বিপুল জলস্রোত কোলাহল করতে করতে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে, তার পরপার যেন রাত্রির নিবিড় তিমিরের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে! এ নদী দেখা যায়, কিন্তু স্পষ্ট ক'রে দেখা যায় না। মনে হয়, ওর গর্ভে লুকিয়ে আছে কত অজানা আর অচেনা বিভীষিকা! ওর জলধারা যেন নেমে যাচ্ছে পাতালের বুকের তলায়!

বিমল বললে, "আমি যদি কবি হতুম তাহলে এ নদীর নাম রাখতুম, সন্ধ্যানদী। কবিতার ভাষায় বলতুম, অন্ধ রাত্রির পদতল ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যানদীর অশ্রুধারা!"

রামহরি বললে, "খোকাবাবু, তুমি জানো না, এ হচ্ছে বৈতরণী নদী, এ নদী গিয়ে পৌঁচেছে যমালয়ে, এর মধ্যে নামলে কেউ বাঁচে না!"

বিনয়বাবু বললেন, "বিমল, এর ভেতরে নামা কি উচিত? পাহাড়ের গহ্বরে অনেক নদী আছে, পাহাড় থেকে বাইরে বেরিয়েছে যারা প্রপাত হয়ে। এ নদীও যদি সেই রকম হয়? তাহলে তো আমরা কেউ বাঁচতে পারব না!"

বিমল জবাব দেবার আগেই তাদের চারিদিক থেকে আচম্বিতে বড় বড় পাথর বৃষ্টি হতে লাগল। বিমল তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"লাফিয়ে পড়—জলে লাফিয়ে পড়, আর কিছু ভাববার সময় নেই—দানবরা আবার আক্রমণ করতে এসেছে।"

সবাই একসঙ্গে নদীর ভিতর লাফিয়ে পড়ল। তখন জলের ভিতরেই পাথর পড়তে লাগল। সে-সব পাথর এত বড় যে তার একখানা গায়ে লাগলে আর রক্ষা নেই। সকলে তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে ডাঙা থেকে অনেক তফাতে গিয়ে পড়ল, শত্রুদের পাথর আর ততদূর গিয়ে পৌঁছতে পারলে না।

বিমল বললে, "এইবারে সবাই খালি ভেসে থাকো, স্রোতের টান যে-রকম বেশি দেখছি, আমাদের হাত-পা ব্যথা করবার দরকার নেই। স্রোতই আমাদের এই গহ্বরের ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে যাবে!"

কুমার বললে, "বিমল, বিমল, তীরের দিকে তাকিয়ে দেখ!"

দূরে—নদীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছে দলে দলে দানবমূর্তি, তাদের বিপুল দেহগুলো যেন কালি দিয়ে আঁকা। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, কে যেন কতকগুলো নিস্পন্দ পাথরের প্রকাণ্ড মূর্তি এনে নদীর ধারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে।

নর-দানবের সঙ্গে বিমলদের সেই হ'ল শেষ দেখা। তারপর তারা নিরাপদে আবার সভ্যতার কোলে ফিরে এসেছিল, কিন্তু দার্জিলিংয়ে আর কখনো দানবের অত্যাচারের কাহিনী শোনে নি।

●

বিমানের নতুন দাদা

প্রথমা

হারাধন ভদ্রলোক হতে চায়

ছিদাম চাষার কথা বলছি।

ছিদামকে চাষা বললুম বটে, কিন্তু সে সাধারণ চাষা নয়। একদিক দিয়ে তাকে ধনী বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ছিদামের বাপ ছ'কড়ি আমরণ জমিতে লাঙল চালনা করেছিল, এবং ছিদামকেও তার বাপের মৃত্যু পর্যন্ত যে লাঙ্গল চালাতে হয়েছিল, এ-কথা সকলেই জানে।

কিন্তু বাপ মারা যাওয়ার পর ছিদাম যখন দেখলে, সে কয়েক-শত-বিঘা-ব্যাপী চাষ-জমির মালিক, আর তার অধীনে কাজ করছে অগুন্তি লোক, তখন সে নিজে হাতে-নাতে কাজ করা ছেড়ে দিলে। অবশ্য তার নিজের চাল-চলন কিছুই বদলাল না। প্রতিদিন সে নিজের চাষ-জমিতে হাজির থেকে সমস্ত কাজকর্ম তদারক করত—এমন কি রোদে পুড়তে, জলে ভিজতে ও শীতে কাঁপতেও তার কিছুমাত্র আপত্তি হ'ত না।

কিন্তু যে-শ্রেণীর লোকই হোক, লক্ষ্মীলাভ করলে মানুষের মন অল্প-বিস্তর না বদলে পারে না। ছিদামের তিন ছেলে। সে নিজে হাঁটুর উপরে মোটা কাপড় পরে বটে, কিন্তু কলকাতায় লোক পাঠিয়ে ছেলেদের জন্যে 'চাঁদনি-চক' থেকে নানানরকম রঙচঙে জামা-কাপড় কিনে আনায়। ছিদামের নিজের কখনো হাতে-খড়িও হয় নি, কিন্তু ছেলেদের সে ভর্তি ক'রে দিয়েছে গাঁয়ের স্কুলে। নিজে লেখাপড়া জানে না বলে লক্ষ্মীলাভ ক'রে নানাদিকে আজ তার অসুবিধা হচ্ছে নানানরকম। দেনা-পাওনার ব্যাপার নিয়ে দু-লাইন চিঠি লেখবার

জন্যেও তাকে পরের দ্বারস্থ হতে হয়। তার মূর্খতার সুযোগ নিয়ে ধূর্ত লোকেরা মাঝে মাঝে তাকে বেশ দু-পয়সা ঠকিয়েও যায়। এই-সব বিপদ থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছেলেদের সে স্কুলে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ছিদামের বাড়ি বড় না হলেও সেখানা হচ্ছে কোঠাবাড়ি এবং ছিদামদের গাঁয়ে কোঠাবাড়ি আছে কেবল গাঁয়ের জমিদারদের। এই হিসেবে মদনপুর গাঁয়ের মধ্যে লোকে জমিদারদের পরেই নাম করত ছিদাম চাষার।

ছিদাম সেদিন সকালে বাড়ির সদর দরজার কাছে একখানা টুলের উপরে বসে হুঁকোয় টান মারছে, এমন সময় তার বড় ছেলে হারু সেখানে এসে হাজির হ'ল।

এখানে হারুর একটুখানি পরিচয়ের দরকার, কারণ আমাদের কাহিনীর নায়ক হচ্ছে এই হারু বা হারাধনই।

হারাধনের বয়স হবে পনেরো কি ষোলো। কিন্তু এই বয়সেই দেখতে সে হয়ে উঠেছে মস্ত জোয়ান এক পুরুষ মানুষের মতন। এখনি সে মাথায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা এবং তিন-চার বছরের ভিতরেই মাথায় যে ছয় ফুটকেও ছাড়িয়ে যাবে, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তার বুকের ছাতি রীতিমত চওড়া, আর তার সর্বাঙ্গ দিয়ে সর্বদাই চামড়ার তলা থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট মাংসপেশী। প্রতিদিন নিয়মিত ডন-বৈঠক দিয়ে ও কুস্তি ল'ড়ে দেহখানিকে সে রীতিমত তৈরি ক'রে তুলেছে। তার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ও সুন্দর মুখশ্রী দেখলে কেউ তাকে চাষার ছেলে বলে ধরতে পারবে না।

হারাধন এই বছরেই গাঁয়ের স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সফল হয়েছে। যে-কোন চাষার ছেলের পক্ষে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সফল হওয়া অল্প গৌরবের কথা নয়, এবং এ-বিষয়ে সে নিজে এবং তার বাপ ছিদাম দুজনেই দস্তুরমত সচেতন।

হারাধন চাষার ছেলের মতনও লালিত-পালিত হয় নি। কেমন ক'রে লাঙল ধরতে হয়, তাও বোধহয় সে জানে না। স্কুলের সমস্ত

ভদ্রলোকের সঙ্গে সে সমানভাবেই মেলামেশা করে এবং তার বাপের কাঞ্চন-কৌলীন্যের প্রসাদে গাঁয়ের ভদ্রলোকের ছেলেদের তরফ থেকেও কোনরকম আপত্তি ওঠে না।

আর আপত্তি উঠবেই বা কেমন ক'রে? মদনপুর হচ্ছে একখানি ছোটখাটো গ্রাম। এখানকার অধিকাংশ তথাকথিত ভদ্রলোকই হচ্ছে গরিব গৃহস্থ। তাদের সংসারে অভাব অনটন লেগেই আছে এবং যখন-তখন অনেক ভদ্রলোককেই টাকা ধার করবার জন্যে ছিদামের দ্বারস্থ হ'তে হয়। ভদ্রলোকদের এই অক্ষমতা দেখে এবং নিজের ক্ষমতার পরিমাণ বুঝে ছিদাম মনে মনে অনুভব করে বিশেষ একটা গর্ব।

কিন্তু মাঝে মাঝে বেসুরো সুর বেরিয়ে পড়ে। হয়তো কোনদিন হারাধন শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না, অমনি তাঁর মুখ থেকে টিটকারি শোনা গেল, "ব্যাটা চাষার ছেলে, কত আর বুদ্ধি হবে!"

গাঁয়ের জমিদাররা যে বিশেষ সম্পত্তিশালী, তা নয়; হয়তো দরকার পড়লে হারাধনের বাপ এককথায় তাদের চেয়ে বেশি টাকা ঘর থেকে বার ক'রে দিতে পারে। কলকাতা শহর হলে তাঁদের মতন জমিদারদের দিকে সাধারণ গৃহস্থরাও ফিরে চাইত না। কিন্তু তাহলে কি হয়, তবু তাঁরা জমিদার। এই বনগাঁয়ের শিয়াল-রাজা!

অতএব জমিদার-বাড়ির যে ছেলেটি হারাধনের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে, সে স্পষ্টাস্পষ্টিই চাষার ছেলে বলে তাকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করত। হারাধন একদিন তাকে "ভাই" ব'লে ডেকে কথা কইতে গিয়েছিল, কিন্তু জমিদার-নন্দন উত্তরে তার সঙ্গে একটা কথাও কয়নি বা তার দিকে একবার ফিরেও তাকায় নি। এমন কি ক্লাসের ভিতরে চাষার ছেলে হারাধনের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসতেও সে নারাজ ছিল। জমিদারের ছেলে প্রায়ই কলকাতায় যায় এবং শহরের সমস্ত হালচাল তার নখদর্পণে। যখন-তখন কলকাতা থেকে সে হাল-ফ্যাশানের কাপড়-চোপড় পরবার কায়দা শিখে আসে এবং হারাধনের 'চাঁদনি-চক' থেকে সস্তায় কেনা 'রেডিমেড' ও রঙচঙে পোশাকের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুখ টিপে-

টিপে হাসে এবং অন্য কোন ছেলেকে ডেকে চাপা-গলায় অথচ হারাধন যাতে শুনতে পায় এমন স্বরে বলে, "চাষার ছেলে, ভদ্রলোক হয়েছেন! আহা, কি পোশাক! হতভাগা, পাড়াগেঁয়ে ভূত!"

এই সব অপমান হারাধনকে মুখ বুজে সহ্য করতে হ'ত। যদিও সে জানে ইচ্ছা করলে এক ঘুষি মেরেই জমিদারপুত্রকে এখনি ভূমিসাৎ করতে পারে, তবু মনের রাগ তাকে মনেই পুষতে হ'ত নীরবে। কারণ তার বাপ বলে দিয়েছিল, জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া করলে তাদের নিজেদেরই বিপদের সম্ভাবনা বেশি।

একদিন এমনিতরো কি-একটা ব্যাপারের পর হারাধন মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলে, সে আর এ-গ্রামে থাকবে না। সে কলকাতায় চলে যাবে—যেখানে কেউ তাকে চাষার ছেলে বলে চেনে না। কলকাতা থেকে যদি সে কখনো ফিরে আসে, তবে ভদ্রলোক নাম কিনেই ফিরে আসবে। কয়েকদিন ধরে মনে মনে এই কথা ভেবে তার প্রতিজ্ঞা হয়ে উঠল ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মতন অটল ও সুদৃঢ়। এবং হারাধনকে যারা চেনে তারাই জানে যে সে হচ্ছে অত্যন্ত একরোখা ছেলে, যা ধরবে তা করবেই।

এইবার সেদিন সকালের কথা বলি।

টুলের উপরে উবু হয়ে বসে তামাক টানতে টানতে ছিদাম যখন অর্ধ-নিমীলিত চোখে দেখলে হারাধন তার সামনে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, তখন একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে আস্তে বললে, "কিরে হারু, কিছু বলতে চাস নাকি? নতুন জামা-কাপড় চাই, না আর কিছু?" সে জানত বিশেষ দরকার না হ'লে শ্রীমান হারু কোনদিনই তার সামনে এসে হাজির হয় না।

হারাধন মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "একটু দরকার আছে বাপি!"

—"দরকারটা কি শুনি?"
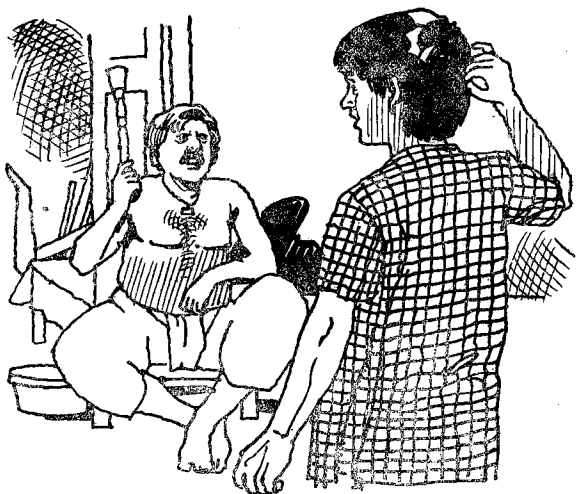
অল্প ইতস্তত ক'রে হারাধন মনের বাসনা একেবারেই প্রকাশ ক'রে ফেললে। বললে, "বাপি, আমি কলকাতায় যেতে চাই!"

ছিদাম দুই ভুরু তুলে সবিস্ময়ে বললে, "বলিস কিরে! কলকাতায় যাবি? কার সঙ্গে রে?"

—"কারুর সঙ্গে নয়।"

এবারে আর ছিদামের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে বললে, "কারুর সঙ্গে নয়? তুই একলা কলকাতা যাবি?"

—"হ্যাঁ বাপি।"

ছিদাম গম্ভীর মুখে হুঁকোয় দু-চারটে টান মেরে বললে, "তোর মাথায় এ কুবুদ্ধি কে দিলে শুনি?"

—"কেউ দ্যায় নি। আমি নিজেই অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করলুম যে কলকাতায় না গেলে কোনদিনই আমি ভদ্রলোক হতে পারব না।"

ছিদাম এইবারে রীতিমত হতভম্ব হয়ে তামাক-টানা ছেড়ে হুঁকোটা

নিচে নামিয়ে রাখলে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে বললে, "কলকাতায় না গেলে তুই ভদ্রলোক হতে পারবি না, বটে? তোর কথার মানে কি রে ব্যাটা? তুই যে চাষার ছেলে, কলকাতায় গিয়ে সেটা ভুলতে চাস নাকি?"

হারাধন পণ্ডিত না হলেও একালের লেখাপড়া কিছু কিছু শিখেছে। সে বললে, "কে যে চাষার ছেলে, আর কে যে মুটের ছেলে, এ-কথা কারুর গায়ে চিরদিন লেখা থাকে না! শুনেছি আমাদের গাঁয়ের জমিদার-দের পূর্বপুরুষরা ছিলেন খুনে, ঠগী, ডাকাত। কিন্তু আজও কি তাদের কেউ ঐ-সব নামে ডাকে? ডাকাতের বংশধররা যদি হতে পারে বড় বড় বাবু, ভদ্রলোক, তাহলে চাষার ছেলেরাই বা কি দোষটা করলে? ডাকাত হওয়ার চেয়ে কি চাষা হওয়া ভাল নয়? স্বর্গে যেতে পারে কারা, ডাকাতরা না চাষারা? তুমি তো জমিদারদের চেয়েও বড়লোক, তবে তোমার ছেলে আমিই বা ভদ্রলোক হতে পারব না কেন?"

ছিদাম জানে চাষ-বাস করতে, কুলি মজুর খাটাতে, শস্য বেচে টাকা জমাতে আর সেই টাকা সুদে খাটাতে; ক-য়ের পাশে খ-কে দেখলে সে চিনতে পারে না, কেতাবী বুলিও কোনদিন শিখতে পারে নি। হারাধন স্কুলে পড়লেও যে এমন সব আশ্চর্য কথা বলতে শিখেছে, এটা সে কোনদিন ধারণাতেও আনতে পারে নি। তার মতন এক চাষার ছেলে হারাধনের মুখে এই সব বড় বড় কথা শুনে সে কেবল ভড়কেই গেল না, মনে মনে খুশিও হল খানিকটা। ছেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক-বার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছিদাম বললে, "কলকাতা কত বড় শহর জানিস?"

হারাধন বললে, "কি ক'রে জানব বাপি? তুমি তো কোনদিন আমায় কলকাতায় নিয়ে যাও নি?"

ছিদাম বললে, "হেঁঃ, তোর বাপই কলকাতায় গেছে ক'বার রে ব্যাটা? মোটে তিনবার! একবার খুব ছেলেবেলায়, একবার দশ বছর আগে, আর একবার বছর-পাঁচেক আগে। যতবারই গিয়েছি, ততবারই

দেখেছি, ঐ রাক্ষুসে শহরটা দিনে দিনে যেন আরো ডাগর হয়ে উঠছে। সেখানে বাইরে বেরুলে লাখো লাখো মানুষের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়, সেখানে পথে পা বাড়ালেই মস্ত মস্ত হাওয়া-গাড়িরা বাঘ-ভাল্লুকের মতো মারমুখো হয়ে তেড়ে আসে, সেখানে হাওয়া-গাড়িদের ফাঁকি দিলেও চোর-জোচ্চোর-গুণ্ডাদের ফাঁকি দেবার জো নেই, সেখানে লাল-পাগড়ি-পরা চৌকিদাররা চোরদের কিছু বলে না, কিন্তু সাধুদের ধরে নিয়ে যায় হাতে দড়ির বাঁধন দিয়ে। এমন শহরে যে তুই যেতে চাস, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবি কেমন ক'রে?"

হারাধন বললে, "বুদ্ধির জোরে।"

ছিদাম হা হা ক'রে হেসে উঠে বললে, "দু-পাতা পড়তে শিখলেই কারুর বুদ্ধির জোর বাড়ে না রে গাধা। আর খালি বুদ্ধির জোরই সব নয়, বুঝেছিস?"

হারাধন বুক ফুলিয়ে বললে, "আমার গায়ের জোরও আছে।"

ছিদাম নীরবে আর একবার ছেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আয়, দেখি তোর গায়ের জোরের একটু নমুনা।" বলেই নিজের রৌদ্রদগ্ধ, পেশীবহুল সবল ও স্থূল ডান হাতখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলে, হাতের পাঁচ আঙুল ফাঁক ক'রে।

হারাধন বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, "আমায় কি করতে বল বাপি?"

ছিদাম বললে, "আমার এই হাতখানা দেখছিস? ভারী লাঙল ঠেলে ঠেলে আমার এই হাত হয়েছে লোহার মতন শক্ত! এই হাতের এক ঘুষি মেরে আমি ডাব ভেঙে তার জল খেতে পারি! আর এই হাতের এক এক টানে বড় বড় বলদ শান্ত-শিষ্ট ভেড়ার মতন সুড়সুড় ক'রে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। পারবি আমার এই হাতখানা ভাঙতে? পারবি আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে?"

হারাধন প্রথমটা ইতস্তত করতে লাগল। ভাবতে লাগল, ছেলে হয়ে

বাপের সঙ্গে পাঞ্জা-লড়া উচিত কিনা? সে আজ পর্যন্ত যত বই পড়েছে তার কোনখানার ভিতরেই দেখে নি, বাপের সঙ্গে ছেলের পাঞ্জা-লড়ার কোন কথাই। বাধো বাধো গলায় বললে, "তোমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ব কি বাপি?"

ছিদাম বললে, "কি রে হেরো, তোর ভয় করছে নাকি? পাঞ্জা লড়তে যে ভয় পায়, সে যেতে চায় কলকাতায়? আরে ধ্যেৎ!"

হারাধনের সমস্ত ইতস্ততভাব কেটে গেল। সে তখনি দৃঢ়পদে এগিয়ে এসে বাপের হাতের সঙ্গে নিজের হাত মেলালে।

ছিদাম অবহেলা-ভরে বললে, "ভাঙ দেখি আমার হাতখানা!" সে নিজের হাতে বিশেষ কোন জোর না দিয়েই কথাগুলো বলছিল, কিন্তু তার মুখের কথা ফুরুতে না ফুরুতেই হারাধন তার হাতখানা ভেঙে দিয়েছিল আর কি! ছিদাম তাড়াতাড়ি নিজের হাতখানা শক্ত ক'রে নিজেকে সামলে নিলে এবং বুঝলে যে তার ছেলের সঙ্গে ছেলেখেলা করলে চলবে না।

তারপর মিনিট-দুয়েক ধরে চলল তাদের পাঞ্জার লড়াই। তখন ছিদামের কাছে এই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, তার ছেলেকে আর ছেলে-মানুষ বলে অস্বীকার করা চলে না। আজ এখনও হারাধন তার পাঞ্জা ভাঙতে পারে নি বটে, কিন্তু সেও প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ ক'রেও ছেলের পাঞ্জাকে একটুও হেলাতে পারলে না। আর বছর-দুয়েক পরে হারাধনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়লে তার পরাজয় যে সুনিশ্চিত এ-বিষয়েও কোনই সন্দেহ নাই। নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছিদাম হাঁপাতে হাঁপাতে দেখলে তার ছেলের শ্বাস-প্রশ্বাস এখনও স্বাভাবিকই আছে।

সে খুশি হয়ে ছেলের পিঠ চাপড়ে বললে, "শাবাশ মরদের বাচ্চা, শাবাশ! তোকে আর আমার কিছুই বলবার নেই, তুই যেখানে ইচ্ছে যেতে পারিস।"

হারাধন তাড়াতাড়ি বাপের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "বাপি, তোমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছি বলে আমাকে মাপ কোরো!"

ছিদাম তাকে নিজের প্রশস্ত বুকের ভিতরে টেনে নিয়ে অভিভূত স্বরে বললে, "তোকে মাপ করব কিরে ব্যাটা? তোর মতন ছেলেই যে আমি চাই—বাপকো বেটা, সিপাইকা ঘোড়া!"

হারাধন বললে, "তাহলে আমি কলকাতায় যাব বাপি?"

—"আলবৎ যাবি!"

—"কিন্তু কলকাতায় গিয়ে আমি কোথায় থাকব বলতে পার?"

ছিদাম হেসে উঠে বললে, "কানা কখনো কানাকে পথ দেখাতে পারে রে? কলকাতায় গিয়ে তুই কোথায় থাকবি, তা আমি কেমন ক'রে বলব? কলকাতায় আমি গিয়েছি বটে, কিন্তু তাকে শুধু চোখে দেখেছি; বুঝেছিস? ও-শহরটাকে দেখলে আমার ভয় হয়, নিতান্ত দায়ে না পড়লে ওখানে আর আমি যাব না। তোর যদি বুকের পাটা থাকে, কলকাতায় নিজের বাসা নিজেই বেঁধে নিস। পারবি?"

—"খুব পারব।"

—"বেশ, তাহলে যাবার সময় আমার কাছ থেকে শ'দুয়েক টাকা নিয়ে যাস। পরে আরো টাকার দরকার হলে আমাকে চিঠি লিখিস।"

হারাধন মহা-আনন্দে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "আমার মতন বাপি আর কারুর নেই।"

দ্বিতীয়

মেয়েটির নাম খুকি নয়

মার্টিনের রেলগাড়িতে চড়ে হারাধন চলেছে কলকাতায়।

গাড়ির দুই ধারের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে খালি দেখা যায় আকাশ, মাঠ, বন, নদী, ধানক্ষেত, পানায়-ভরা পুকুর আর ছোট-বড় গ্রাম। এ-সব দেখতে তার একটুও ভাল লাগল না। সে মানুষ হয়েছে পল্লী-প্রকৃতির কোলে, এই সব দেখতে দেখতেই আজ তার বয়স হ'ল

প্রায় ষোলো।

আকাশ আর মাঠ আর গ্রাম, যেদিকেই তাকায় সে কলকাতার বিচিত্র সব স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। সারাপথ এমনি স্বপ্ন দেখতে দেখতে শেষটা সন্ধ্যার কিছু আগে সে মার্টিনের ডেরা কদমতলা ইস্টিশানে গিয়ে পৌঁছল।

যেখানে গিয়ে নামল হারাধন সেইখানটা দেখেই অবাক হয়ে গেল। একখানা গণ্ডগ্রামের বাসিন্দা সে, এক জায়গায় এত বাড়ির পর বাড়ি, এত গাড়ির পর গাড়ি আর এত লোকজনের ছুটোছুটি তার চোখে আর কখনো পড়ে নি। কিছুক্ষণ সে হতভম্বের মতন এদিকে-ওদিকে ঘোরা-ঘুরি করতে করতে ভাবতে লাগল, এই কদমতলার চেয়েও কি কলকাতা আরো বড়, আরো জমকালো?

সামনে এক ভদ্রলোককে দেখে হারাধন জিজ্ঞাসা করলে, "মশাই, আমি কোন পথ দিয়ে কলকাতা যেতে পারব, বলতে পারেন?"

ভদ্রলোক একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার পোশাক ও মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কলকাতায় কখনো আস নি বুঝি?

হারাধন মনে মনে বুঝলে তার চেহারায় এখনো পাড়াগেঁয়ে ভাব মাখা আছে বলেই বাবুটি তাকে এমন প্রশ্ন করলেন। একটু লজ্জিত হয়ে বললে, "আজ্ঞে না।"

—"তবে একলা কলকাতায় এসেছ কেন? বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ বুঝি?"

—"আজ্ঞে না। বাবাকে ব'লে এসেছি।"

—"তোমার বাবা তোমাকে আসতে দিলেন? দেখছি তোমার বাপের বুদ্ধিও তোমার চেয়ে বেশি নয়। কলকাতায় এসে কি করবে? চাকরি?"

হারাধন গর্বিত স্বরে বললে, "আজ্ঞে না, চাকরি করতে আসি নি। আমি কলকাতায় বেড়াতে এসেছি।"

ভদ্রলোক দুই ভুরু কপালে তুলে বললেন, "ও, তাই নাকি ? বেশ, তবে ঐ পথ ধরে চলে যাও!" বলে তিনি হাত তুলে একদিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করলেন।

হারাধন পায়ে পায়ে এগুতে লাগল। সে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে, এবং তার কৌতূহলী মুখ দেখলেই কারুর বুঝতে দেরি লাগবে না যে, সে হচ্ছে কোন অজ পাড়াগাঁয়ের বাসিন্দা।

আধঘণ্টা চলবার পর পথের ধারে একখানা খাবারের দোকান দেখে হারাধন-এর মনে পড়ল, আজ বৈকালে তার খাবার খাওয়া হয়নি। একটি টিনের বাক্সে ভরে তার মা দিয়েছিলেন খানকয় পরোটা, কিছু তরকারি ও গোটা-চারেক নারিকেল নাড়ু। খাবার তো সঙ্গে রয়েছে, কিন্তু জল তো নেই!

এধারে ওধারে চোখ রেখে আরও খানিক এগিয়ে পথের ধারে সে দেখলে একটি গাছপালায় ও ঝোপে ঝোপে ভরা জায়গা এবং তার পাশেই রয়েছে একটি পুষ্করিণী।

পুকুরের ধারে গিয়ে সে একটি বড় গাছের গুঁড়িতে পিঠ রেখে বসে পড়ল। তারপর খুললে খাবারের বাক্সের ডালা।

চারিদিক তখন সন্ধ্যার আবছা আলোয় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। মায়ের হাতের তৈরি খাবার খেতে খেতে বাড়ির কথা মনে ক'রে হারাধনের মনটা একটু হা-হা ক'রে উঠল। এর আগে সে কখনো নিজের গাঁয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে আসে নি, তাই তার কলকাতা আসবার কথা শুনেই তার মা যে কেঁদে-কেটে কতখানি কাতরতা প্রকাশ করেছিলেন, এটাও তার মনে পড়ল।

কেবল মা আর তার ছোট ভাইগুলির কথা নয়, মনে হতে লাগল তার সমবয়সী খেলুড়েদেরও কথা—যাদের সঙ্গে ছুটির সময় সে হাটে-মাঠে-বাটে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াত, নদীর জলে সাঁতার কাটত, নৌকো বাইত, পরের আম-জাম-কাঁঠাল বনে লুকিয়ে ঢুকে নিষিদ্ধ ফল চুরি করত এবং গাঁয়ের পথে পথে হা-ডু-ডু ও ডাণ্ডা-গুলি খেলত। আরো

কারুর কারুর কথা স্মরণ ক'রে তার মন হু-হু করতে লাগল; সেই ভুলো কুকুরটা, তার সঙ্গে খেতে না বসলে সে কেঁউ কেঁউ ক'রে কেঁদে সারা হ'ত, আর সেই পোষা মেনী বিড়ালটা, যার তিনটে ধবধবে সাদা বাচ্চার সবে ফুটেছে চোখ, আর তাদের সেই উঠোনের বকুল গাছের ডালে ঝোলানো খাঁচার সেই টিয়াপাখিটা, যে তাকে দেখলেই "হেরো, হেরো" বলে ডেকে উঠত।

এই সব ভাবতে ভাবতে তার মায়ের দেওয়া খাবার যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে হঠাৎ সে পিছনে কাদের সাড়া পেলে। ফিরে দেখে তুজন লোকের সঙ্গে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে রঙচঙে ভাল পোশাক পরা একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে, বয়স তার দশ-এগারোর বেশি নয়।

মেয়েটি বলছে, "এই তো একটা পুকুর রয়েছে! এইখানেই কি লাল মাছ পাওয়া যায়?"

একটা লোক বললে, "না খুকি, ঐ যে জঙ্গলটা দেখছ, ঠিক ওর ওপাশেই যে পুকুরটা আছে, সেইখানেই পাওয়া যায় রুইমাছের মতন বড় বড় লাল মাছ।"

মেয়েটি ভয় পেয়ে বললে, "মাগো! রুইমাছের মতন বড় বড় লাল মাছ নিয়ে খেলব কেমন ক'রে? আমি চাই বাটামাছের মতন ছোট ছোট লাল মাছ, যাদের চৌবাচ্চায় রাখা যায়!"

লোকটা বললে, "বেশ খুকি, তাই হবে। সেইরকম লাল মাছই আমরা তোমাকে ধরে দেবো।"

মেয়েটিকে নিয়ে লোক-তু'টো পাশের ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করলে।

হারাধন ভাবতে লাগল, মেয়েটিকে দেখলেই তো খুব বড়ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়, কিন্তু ঐ লোক-তুজনের চেহারা তো সুবিধের বলে বোধ হচ্ছে না! ওদের মুখ দেখলেই মনে হয়, ওরা যেন পাকা বদমাইশ। ও-রকম লোকের সঙ্গে অমন সুশ্রী মেয়ে কেন?

হঠাৎ ঝোপের ওপাশ থেকে উচ্চস্বরে কান্না জাগল, "ওগো মাগো—"

কান্নাটা হঠাৎ জেগেই হঠাৎ থেমে গেল—যেন যে কাঁদছে, জোর করে কেউ তার মুখ চেপে ধরেছে!

হারাধন একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর মাটির উপর থেকে তার মোটা লাঠিগাছা চট করে তুলে নিয়ে দৌড়ে সেই ঝোপের ভিতর গিয়ে ঢুকল। তারপর সেখানকার দৃশ্য দেখেই তার চোখ আর মন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

মেয়েটিকে মাটির উপরে লম্বা করে ফেলে একটা লোক হাঁটু দিয়ে তার দুই পা ও দুই হাত দিয়ে তার মুখ প্রাণপণে চেপে আছে, এবং আর একটা লোক তার গলা থেকে একছড়া সোনার হার টেনে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে!

হারাধন স্তম্ভিত হয়ে রইল এক মুহূর্তের বেশি নয়। ব্যাপারটা বুঝতে তার একটু দেরি হল না। তখনি সে বাঘের মতো লোক-দুটোর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং যে হার ছিনিয়ে নিচ্ছিল তার পিঠের উপরে মারলে প্রচণ্ড এক লাঠি, আর মেয়েটিকে যে চেপে ধরেছিল তাকে মারলে প্রচণ্ড এক লাথি!

এই লাঠি আর লাথি খেয়েই লোক-দুটো প্রথমে সশব্দে মাটির উপরে পড়ে গেল, তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই উঠে চোঁ-চা চম্পট দিলে। হারাধন লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে তাদের পিছনে পিছনে ছুটল, কিন্তু ঝোপের বাইরে এসে দেখলে, এর মধ্যেই তারা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। তারপর আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়ার ভিতরে তারা কোথায় একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের ধরবার চেষ্টা ক'রে আর কোনই লাভ নেই বুঝে সে আবার ঝোপের ভিতরে ফিরে এল।

মেয়েটি তখন মাটির উপরে পা ছড়িয়ে বসে চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু ক'রে দিয়েছে। হারাধনও তার পাশে গিয়ে বসে পড়ে মিষ্টিগলায় বললে, "আর কেঁদো না খুকি, আর কোন ভয় নেই! হতভাগারা পালিয়ে গিয়েছে।"

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বললে, "আমি বাড়ি যাব।"

হারাধন জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার বাড়ি কোথায় খুকি ?"

মেয়েটি হাত তুলে একদিক দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ঐ দিকে।"

—"তুমি বাড়ি যাবার পথ চিনতে পারবে ?"

—"হুঁ।"

—"ওরা তোমার কোন গয়না কেড়ে নিয়ে যায় নি তো ?

—"না।"

হারাধন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চল খুকি, তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই, চল।"

মেয়েটি তবু উঠল না, সভয়ে ও সন্দিগ্ধ চোখে হারাধনের মুখের পানে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল।

তার মনের ভাব বুঝে হেসে ফেলে হারাধন বললে, "খুকি, তুমি বুঝি ভাবছ, এক পাপের পাল্লা থেকে তুমি আর এক পাপের পাল্লায় এসে পড়েছ ? ভয় নেই, আমিও তোমার গয়না কেড়ে নেবো না।"

মেয়েটি লজ্জিত মুখে বললে, "না। তোমাকে আমার ভয় করছে না। তুমি লক্ষ্মীছেলে, না ?"

হারাধন হাসতে হাসতে বললে, "তুমি যখন বলছ, তখন লক্ষ্মীছেলে হতে আমি বাধ্য। তোমার অমন সুন্দর মুখের মিষ্টি হুকুম মানবে না, দুনিয়ায় এমন পাষণ্ড কে আছে ?"

মেয়েটিও এতক্ষণ পরে হেসে ফেলে বললে, "তুমিও সুন্দর নও নাকি ? তাহলে তোমাকে আমার ভাল লাগছে কেন ?"

—"বেশ, তাহলে আমরা দুজনেই সুন্দর। সন্ধ্যে হতে আর দেরি নেই, এখন ওঠ খুকি।"

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমার নাম খুকি নয়।"

—"তবে তোমার নাম কি ?"

—"প্রীতি।"

হারাধন মেয়েটিকে নিয়ে এগুতে এগুতে বললে, "আচ্ছা প্রীতি, ও লোক-দুটো কে ? ওদের সঙ্গে তুমি এখানে এসেছিলে কেন ?"

প্রীতি বললে, "পথের ধারে একটা গাছের ডালে বসে একটি রঙিন পাখি খাসা গান গাইছিল। তাকে ভাল ক'রে দেখবার জন্যে আমাদের বাগান থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম। কিন্তু গাছের কাছে যেতেই দুষ্ট পাখিটা গান থামিয়ে উড়ে গেল আর ঐ লোক-দু'টো কোথা থেকে বেরিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। যে-লোকটা আমার হার কেড়ে নিচ্ছিল, সে বললে, 'লাল পাখিটা উড়ে গেল খুকি?' আমি 'যাক গে' বলে চলে আসছি, সে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'লাল পাখি উড়ে গেল তো কি হয়েছে? তুমি বড় বড় লাল মাছ ভালবাস তো?' আমি বললুম, 'খুব ভালবাসি।' সে বললে, 'কাছেই একটা পুকুরে খুব বড় বড় লাল মাছ আছে। দেখে যদি তোমার পছন্দ হয়, আমি তোমাকে অনেকগুলো মাছ ধরে দিতে পারি।' তারপর সে আমার হাত ধরে বললে, 'তাহলে আমার সঙ্গে চল, তারপর যত চাও, তত মাছ ধরে দেব।' সেই কথা শুনেই আমি বোকার মতন ওদের সঙ্গে এসে-ছিলুম। আমাকে তুমি তাড়াতাড়ি বাড়িতে নিয়ে চল। আমাকে দেখতে না পেয়ে সবাই হয়তো ভেবেই সারা হচ্ছে।"

—"তোমাকে আমি কেমন ক'রে নিয়ে যাবো প্রীতি? তোমার বাড়ির পথ তো তুমিই জানো। বড়-জোর আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারি!"

—"তাই এস। তুমি সঙ্গে থাকলে আমার আর ভয় করবে না।"

হারাধনের একখানি হাত নিজের নরম-তুলতুলে ছোট্ট মুঠোর ভিতরে নিয়ে প্রীতি একদিকে অগ্রসর হ'ল।

হারাধন জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাদের বাড়িতে কে কে আছেন?"

—"বাবা আছেন। মা আছেন, আমার ছোট ভাই আছে আর ঝি-চাকর-বামুনরা আছে। কিন্তু যেখানে যাচ্ছি সেটা আমাদের বাড়ি নয়।"

—"তবে?"

—"আমাদের বাড়ি কলকাতায়। এখানে আমাদের বাগানবাড়ি।

মাঝে মাঝে এই বাগানে আমরা বেড়াতে আসি।"

—"তোমার বাবা কি করেন?"

—"তিনি ব্যারিস্টার।"

এই-রকম সব কথা কইতে কইতে মিনিট-দশেকের পরে প্রীতি যখন তাদের বাগানবাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হ'ল তখন সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে।

প্রীতির বাবার নাম মিস্টার রতন রায় ও তার মায়ের নাম প্রতিমা দেবী। ইতিমধ্যেই প্রীতিকে বাড়ির ভিতরে দেখতে না পেয়ে তাঁরা দুজনেই ব্যস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে বাগানের ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং মেয়ের খোঁজে চারিদিকে পাঠিয়েছেন বেয়ারা ও দারোয়ানদের। মা আর বাবাকে দেখতে পেয়েই প্রীতি দৌড়ে তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং প্রতিমা সানন্দে প্রীতিকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, "এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি প্রীতি?"

প্রীতি কোন জবাব না দিয়ে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে আবার কেঁদে উঠল। হারাধন ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল, মিস্টার রায় হঠাৎ কঠোর স্বরে তাকে ডেকে ব'লে উঠলেন, "এই ছোকরা! দাঁড়াও!"

মিস্টার রায়ের কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত হয়ে হারাধন ঘুরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মিস্টার রায় বললেন, "আমার মেয়ে কাঁদছে কেন? তুমি একে ধরে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে?"

প্রীতি তাড়াতাড়ি মায়ের কোল ছেড়ে বাবার কাছে এসে বললে, "ওকে তুমি বোকো না বাবা! ওকে আমার ভাল লেগেছে।"

মিস্টার রায় আরো বেশি বিস্মিত ভাবে বললেন, "ওকে তোর ভাল লেগেছে তো, কাঁদছিস কেন? তোর কি হয়েছে! তুই কোথায় গিয়েছিলি?"

প্রীতি তখন একে একে সব কথা খুলে বললে। শুনতে শুনতে মিস্টার রায় ও প্রতিমা দেবীর সর্বাঙ্গ ভয়ে আর বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়ে

উঠতে লাগল।

প্রীতির কথা শেষ হলে পর প্রতিমা আবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শিউরে উঠে বললেন, "আর তোকে কখনো বাইরে ছেড়ে দেব না, আজ ভগবান তোকে বাঁচিয়েছেন!"

মিঃ রায় এগিয়ে গিয়ে হারাধনের একখানি হাত ধরে অনুতপ্ত স্বরে বললেন, "ভগবান আমার প্রীতিকে বাঁচিয়েছেন বটে, কিন্তু তুমি হচ্ছ ভগবানেরই দূত। তোমাকে সন্দেহ করেছি বলে তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।"

হারাধন লজ্জিত মুখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, কোন জবাব দিতে পারলে না।

প্রতিমা সুমধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি বাবা?"

—"আজ্ঞে, হারাধন পাল।"

মিস্টার রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "হারাধন, তোমাকে দেখে তো এখানকার লোক বলে মনে হচ্ছে না? তুমি কোথায় থাকো?"

—"আজ্ঞে, আমার দেশ মদনপুরে। আমি কলকাতা দেখতে এসেছি।"

—"তুমি এর আগে কলকাতায় কখনো এসেছিলে?"

—"আজ্ঞে না?"

—"তুমি কার সঙ্গে এসেছ?"

—"আজ্ঞে, একলা এসেছি।"

মিস্টার রায় বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "তুমি এর আগে কলকাতায় কখনো আস নি, অথচ একলাই কলকাতা দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"এখানেও আমি ভগবানের হাত দেখতে পাচ্ছি। ভাগ্যে তোমার মাথায় এই দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, তাই আজ আমার মেয়ে প্রাণে বেঁচে বাড়িতে ফিরে এসেছে। হারাধন, তুমিই প্রীতির জীবন-রক্ষা করেছ! তোমাকে কি বলে আদর করব বুঝতে পারছি না।"

হারাধন আবার লজ্জিত হয়ে একটা নমস্কার করে পায়ে পায়ে এগুতে এগুতে বললে, "আজ্ঞে, আমি তবে আসি।"

মিস্টার রায় তাড়াতাড়ি তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "তা হয় না বাপু, আজ তোমাকে আমার এখানে থেকে যেতেই হবে। কাল আমি তোমাকে নিয়ে নিজেই কলকাতায় যাব।"

হারাধন মাথা নেড়ে বললে, "আজ্ঞে না! আমার সঙ্গে কারুকে যেতে হবে না। আমি একলাই কলকাতা যেতে পারব!"

তার কথা কইবার ধরন-ধারণ দেখে মিস্টার রায় হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। প্রতিমাও হাসতে হাসতে বললেন, "বেশ বাবা, তাই যেও। কিন্তু আজ নয়, কাল সকালে। আজ আমি তোমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করছি, আমার কথা রাখবে না বাবা?"

হারাধন কি জবাব দেবে বুঝতে না পেরে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল বোবার মতন।

মিস্টার রায় বললেন, "প্রীতি, আমাদের এই হারাধনবাবুটি হচ্ছেন তোর বড়দাদা। ওকে ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে আয় তো।"

প্রীতি ভারী খুশি হয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠে হারাধনের কাছে ছুটে এল, তারপর তার দুই হাত ধরে টানতে টানতে বাগানের ফটকের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

দুই পাশে দেশী-বিলাতী ফুলগাছের সারি, তারই মাঝখান দিয়ে কাঁকর-বিছানো পথখানি বাংলোর ধাঁচায় তৈরি একতলা বাড়ির দিকে চলে গিয়েছে।

পথের শেষে পাঁচ-ছয়টি সিঁড়ির ধাপ পার হয়েই বাংলোর বারান্দা। সেইখানে দাঁড়িয়েছিল ছোট্ট একটি টুকটুকে খোকা, বয়স তার ছয়-সাত বছরের বেশি নয়। তার টানা টানা জোড়া ভুরু, ডাগর-ডাগর চোখ, টিকলো নাক, রাঙা ফুলের পাপড়ির মতন পাতলা ঠোঁট আর কোঁকড়ানো চিকন-কালো চুলের গোছা দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না যে সে হচ্ছে প্রীতির ছোট ভাই। দুজনের চেহারায় আশ্চর্য মিল!

হঠাৎ অপরিচিত হারাধনের আবির্ভাবে খোকাবাবু যথেষ্ট দমে গিয়ে পায়ে পায়ে পিছোবার চেষ্টা করলেন।

প্রীতি তাকে অভয় দিয়ে বলে উঠল, "ও বিমান, ভয় কি রে বোকা? এ যে আমাদের নতুন দাদা!"

বিমান দাঁড়িয়ে পড়ে তার ডাগর চোখ-দুটিকে আরো বিস্ফারিত ক'রে তুলে হারাধনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অল্পক্ষণ। তারপরেই সকৌতুকে নেচে উঠে হাততালি দিয়ে বললে, "আমাদের নতুন দাদা? ও হো, কি মজা!"

মিস্টার রায়, প্রতিমা দেবী, প্রীতি ও বিমান সবাই মিলে তাদের নতুন অতিথিকে এমন স্নেহ-মায়ার মধুর বাঁধনে বেঁধে ফেললেন যে, হারাধন তিনদিনের আগে সে পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারলে না।

তিনদিনের পরেও মিস্টার রায় ও প্রতিমা তাকে ছাড়তে রাজি হচ্ছিলেন না, কিন্তু হারাধনের বিশেষ জেদ দেখে তাঁরা আর আপত্তি করতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে হারাধনের মুখে মিস্টার রায় তার সমস্ত কাহিনী ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শ্রবণ করেছেন। হারাধন যখন নিজের ব্যাগ ও মোটা লাঠিগাছটি নিয়ে বাংলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে পথের উপর গিয়ে দাঁড়াল, মিস্টার রায় তার দুই কাঁধের উপরে তাঁর দুই হাত রেখে বললেন, "হারাধন, তোমাকে আমি বিদায় দিচ্ছি না, আমি বলতে চাই —আবার এসো! তোমাকে আমার এত ভাল লেগেছে যে, ছেড়ে দিতে মন কেমন করছে। তুমি নিজের উপরে নির্ভর ক'রে একলাই যখন কলকাতায় যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তখন আমি আর বাধা দিতে চাই না। বাঙালীর ছেলেরা সহজে স্বাবলম্বী হতে শেখে না, এটা হচ্ছে আমাদের জাতের একটা মস্ত কলঙ্ক। আমি ইয়োরোপে গিয়ে দেখেছি, সেখানকার মানুষেরা শিশু-বয়স থেকে স্বাবলম্বন-মন্ত্রের সাধনা করে; সেইজন্যে যে-বয়সে

বাঙালীর ছেলেরা পৃথিবীর কিছুই বোঝে না, ইয়োরোপের প্রায়-বালকরাও সেই বয়সেই অনায়াসেই নিজের পায়ের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। তোমার এই অসাধারণতা দেখে আমি যে কত খুশি হয়েছি, প্রকাশ করতে পারছি না। বেশ, তুমি একলাই কলকাতায় যাও। কিন্তু শুনে রাখো, আমাদের কলকাতাকে আমিই বিশ্বাস করি না। তোমার বাবা পাড়াগেঁয়ে হলেও ঠিক কথাই বলেছেন। এই রাক্ষুসে শহরকে ভয় করাই উচিত। অতএব আমার কাছে তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে।"

হারাধন বললে, "আজ্ঞা করুন।"

নিজের জামার পকেট থেকে একখানি 'কার্ড' বার ক'রে মিস্টার রায় বললেন, "এই 'কার্ড'খানি তুমি নিজের কাছে রাখো। এতে আমার নাম, আমার কলকাতার বাড়ির ফোন-নম্বর আর ঠিকানা লেখা আছে। তুমি যদি কোন বিপদে পড়, তোমার যদি কখনো সাহায্যের দরকার হয়, তাহলে আমাকে খবর দিতে বা আমার সঙ্গে দেখা করতে ভুলবে না। কেমন, আমার এই অনুরোধটি রাখবে তো ?"

হারাধন 'কার্ড'খানি নিয়ে ঘাড় নেড়ে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ", তার-পরেই মিস্টার রায়কে প্রণাম ক'রে তাড়াতাড়ি ফিরে যখন হন হন ক'রে এগিয়ে চলল, তখন মিস্টার রায় দেখতে পেলেন না যে তার দু'টি চোখ ভরে উঠেছে অশ্রুজলে!

তৃতীয়

হারাধন ভাল চাকরি করতে নারাজ নয়

কলকাতা:।

হ্যারিসন রোডের ফুটপাথ ধরে হারাধন যখন চিৎপুর রোডের

চৌমাথায় এসে দাঁড়াল, তখন তার অবস্থা হয়ে উঠেছে রীতিমত কাহিল। তার দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত, তার বুক করছে ধুকপুক, তার মন উঠছে ক্রমাগত চমকে চমকে। এতখানি পথ সে পায়ে হেঁটে এসেছে, না জনতার শত শত লোক ধাক্কা মেরে এই পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিয়েছে, হারাধন নিজেই এটা বুঝতে পারলে না। এর মধ্যেই সে বার-কয়েক গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে এবং নিজের বোকামির জন্যে গাড়ির চালক ও পথের পথিকদের কাছ থেকে বারংবার ধমক খেয়ে খেয়ে একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। এবং কলকাতায় এসে সে প্রথম জ্ঞান অর্জন করলে যে, এই শহরে পথে বেরুলে ফুটপাত ছেড়ে নিচে নামতে নেই।

এখানকার যা-কিছু চোখে পড়ছে সমস্তই তার ধারণাতীত। নানা-দেশী স্ত্রী-পুরুষের বিচিত্র জনতা, রাস্তার দু'ধারকার আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকাগুলো, বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, জলের কল, হরেক-রকম দোকানের সারি, হাওড়ার পোল, গাড়ি আর জনতার কান-ফাটানো কোলাহল, মাথার উপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া এরোপ্লেনের পর এরোপ্লেন এ-সব যে সম্ভবপর, স্বপ্নেও সে কোনদিন ভাবতে পারে নি।

পথ চলতে চলতে বারবার সে দাঁড়িয়ে পড়ছে এবং মূর্তির মতন স্থির হয়ে দেখছে এক-একটি অভাবিত দৃশ্য। এইভাবে থেমে থেমে পথ চলার দরুন অবশেষে সে যখন কোনরকমে কলেজ স্ট্রীটের কাছ বরাবর এসে পৌঁছল, কলকাতার আকাশ থেকে সূর্য তখন বিদায় নেবার উপক্রম করছে।

ডানদিকে ফিরে খানিকটা এগিয়েই হারাধন কলেজ স্কোয়ারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ পরে এই মানব-অরণ্য এবং ইট-পাথরের মরুভূমির মধ্যে গাছপালার সুপরিচিত শ্যামলতা ও দীঘির জল দেখে সে যেন অনেকটা আশ্বস্ত হ'ল এবং তাড়াতাড়ি বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

বাগানের ভিতরে আবার পথের চেয়েও বেশি ভিড়—শিশু, যুবক

ও বৃদ্ধরা তখন সেখানে বায়ুসেবন করতে এসেছে। ভয়ে ভয়ে, অত্যন্ত সন্তর্পণে সেই ভিড় ঠেলে সে গোলদীঘির একটি ঘাটের সামনে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। ঘাটের সিঁড়িগুলোর উপরে বেশি লোকজন নেই দেখে হারাধন আস্তে আস্তে জলের কাছে নেমে গেল এবং দুই অঞ্জলি ভরে অনেকটা জলপান ক'রে ফেললে। এতক্ষণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সে ক্ষুধাতৃষ্ণার কথাও একেবারে ভুলে গিয়েছিল, সারাদিনের পর এই তার প্রথম জলপান।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হারাধন পৈঠার উপরে ধুপ ক'রে বসে পড়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বাগানের দৃশ্য দেখতে লাগল। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে বাগানের দৃশ্যও ঝাপসা হয়ে এল সন্ধ্যার অন্ধকারে।

হারাধন তখন ভাবতে লাগল, এইবারে সে কি করবে? পেটের ভিতরে ক্ষুধার আগুন জ্বলে উঠেছে বটে, কিন্তু তার জন্যে বিশেষ ভাবনা নেই; কারণ সে দেখেছে কলকাতার পথের দু'ধারেই আছে খাবারের দোকানের পর দোকান, পয়সা ফেললেই খাবার পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সন্ধ্যার পরে যখন রাত আসবে, তখন সে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে? কলকাতায় হাজার হাজার বাড়ি থাকতে পারে, এবং তার ভিতরে থাকতে পারে লক্ষ লক্ষ মানুষ, কিন্তু সে-সব বাড়ির কোন-খানারই ভিতরে তার জন্যে একটুখানি ঠাঁই নেই, কারণ সে কারুকেই চেনে না। আজকের রাতটা না হয় এই বাগানের বেঞ্চিতে শুয়েই কাটতে পারে, কিন্তু আজকের পরে আছে কাল, কালকের পরে আছে পরশু এবং তারপরেও আছে দিনের পর দিন। নিজের গর্বের খাতিরে মিস্টার রায়ের কাছ থেকে এ-সম্বন্ধে কোন উপদেশ নেয় নি বলে এখন তার মনে অত্যন্ত অনুতাপ হতে লাগল।

ক্রমে অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গেল। হারাধন নিজের চিন্তায় নিমগ্ন ছিল বলে দেখতে পায় নি যে, এতক্ষণ ধরে তার পিছনে একটু তফাতে বসে একটি লোক চুপ ক'রে তার ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করছিল।

লোকটিকে দেখে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। অন্ধকার গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি আরো নিচে নেমে এসে ঠিক হারাধনের পাশেই বসে পড়ল। তারপর তার কাঁধে একখানা হাত রেখে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হে জনার্দন, কেমন আছ?"

হারাধন বিস্মিত হয়ে লোকটির মুখ দেখবার চেষ্টা ক'রে বললে, "আমার নাম তো জনার্দন নয়।"

লোকটি তাড়াতাড়ি তার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে অপ্রস্তুত স্বরে বললে, "মাপ করবেন মশায়, অন্ধকারে আমি বুঝতে পারি নি। ভেবেছিলুম আপনি বুঝি আমাদের জনার্দন।"

—"আজ্ঞে না, আমার নাম শ্রীহারাধন পাল।"

—"আপনার নাম হারাধনবাবু? আপনার মতো আমারও উপাধি পাল। আমার নাম শ্রীতারাপদ পাল। বেশ, বেশ, এককথায় আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল।"

এই নতুন লোকটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে হারাধন কতকটা আশ্বস্ত হ'ল। সে ভাবলে, এর কাছ থেকেই আজকের রাত্রের আশ্রয়-লাভের সমস্যাটা পূরণ ক'রে নিতে পারবে।

কিভাবে কথাটা পাড়া যায় এই নিয়ে সে যখন মাথা ঘামাচ্ছে, তারাপদ তখন জিজ্ঞাসা করলে, "হারাধনবাবু, আপনার কোথায় থাকা হয়?"

হারাধন বললে, "আপাতত আমি এইখানেই আছি।"

লোকটি বিস্মিত স্বরে বললে, "এইখানে মানে?"

—"আমি আজই প্রথম কলকাতায় এসে এইখানে বসেছি। কলকাতার কারুকে আমি চিনি না। এরপর কোথায় যাব, কোথায় ঠাঁই পাব, কিছুই জানি।"

—"এর আগে আপনি কখনো কলকাতায় আসেন নি?"

—"না।"

—"তবে এখানে কি করতে এসেছেন?"

—"বেড়াতে।"

—"খালি বেড়াতে? চাকরি-টাকরি করতে নয়?"

হারাধন চুপ ক'রে ভাবতে লাগল, এ-কথার কি জবাব দেওয়া উচিত। সে পাড়াগেঁয়ে লোক হলেও এইটুকু বুঝলে যে, নিজের কলকাতায় আসার আসল ইতিহাসটা যার-তার কাছে প্রকাশ করলে অত্যন্ত বোকামি আর ছেলেমানুষি করা হবে। তার চেয়ে একে যদি বলি—হ্যাঁ, একটা চাকরি পেলেও আমি করতে রাজি আছি, তাহলে সেটা নিতান্ত মন্দ শোনাবে না। আর সত্যি কথা বলতে কি, যদি কোন ভাল, মনের মতো চাকরি অবলম্বন ক'রেই কিছুদিন কলকাতায় কাটানো যায়, তাতেও তো আপত্তি করবার বিশেষ কারণ নেই।

অতএব হারাধন বললে, "তারাপদবাবু, কলকাতায় আমি বেড়াতে এসেছি বটে, তবে মনের মতন কোন কাজ পেলে চাকরি করতেও নারাজ নই।"

তারাপদ হা হা ক'রে হেসে তার পিঠে আস্তে একটি করাঘাত ক'রে বললে, "ও, আপনি রথও দেখতে আর কলাও বেচতে চান? তা আমি আপনার একটা উপায় ক'রে দিতে পারি।"

হারাধন উৎসাহিত হয়ে বললে, "পারেন? কিন্তু কি রকম চাকরি?"

—"আমার হাতে চাকরি আছে অনেক রকম। কিন্তু আপনি তো দেখছি বিশেষ ভদ্রলোক, চাকরি যদি করেন আপনাকে ভদ্রলোকের মতন চাকরি করতে হবে।"

হারাধন জীবনে এই প্রথম শুনলে, তাকে কেউ ভদ্রলোক বলে সম্বোধন করছে। সে মনে মনে খুশি হয়ে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ভদ্রলোকেরই মতন চাকরি করতে চাই।"

তারাপদ একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললে, "আপনি লেখাপড়া কতদূর শিখেছেন?"

—"এই বছরে ছাত্রবৃত্তি পাস করেছি।"

তারাপদ উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, "বহুৎ আচ্ছা, তাহলেই হবে! আমাদের জমিদার বাবুর একজন সহকারী ম্যানেজার দরকার।

আজকেই আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাই। আপনি রাজি আছেন?"

হারাধন খুব খুশি হয়ে বললে, "নিশ্চয়ই আমি রাজি আছি। কিন্তু তার আগে আমাকে একটি বাসা ঠিক ক'রে দিতে পারবেন?"

তারাপদ বললে, "আগে থাকতেই ও-ভাবনার দরকার নেই। জমিদারবাবু আপনাকে চাকরি দিতে যদি রাজি হন, তাহলে আজ থেকেই তো আপনি তাঁর বাড়িতে থাকবার ঠাঁই পাবেন। কিন্তু আর একটি কথা আছে।"

—"বলুন।"

—জমিদার-বাড়ির কাজে অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে নাড়ানাড়ি করতে হয়। এখানে আপনাকে কেউ চেনে না, সুতরাং কেউ আপনার জন্যে জামিনও হতে পারবে না। কাজেই জমিদার বাবুর কাছে আপনাকে বোধহয় কিছু টাকা জমা রাখতে হবে।"

হারাধন সরলভাবেই বললে, "বাবাকে চিঠি লিখলে পরে আমি আরো টাকা পেতে পারি বটে, কিন্তু আপাতত আমার কাছে দু'শো টাকার বেশি নেই।"

তারাপদ বললে, "আমার বোধহয় জমিদারবাবু আপনার মতন ভদ্রলোকের কাছ থেকে খুব বেশি টাকা দাবি করবেন না। তাহলে উঠুন, আর দেরি ক'রে কাজ নেই, আপনাকে একেবারে যথাস্থানেই নিয়ে যাই।"

চতুর্থ

গোঁফের মধ্যে ভাবের অভিব্যক্তি

তারাপদর সঙ্গে ট্রামে উঠে হারাধন উত্তর-কলিকাতার একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে নামল। তারপর পায়ে হেঁটে এ-গলি সে-গলি দিয়ে তারা মস্ত একখানা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজায় বসেছিল দারোয়ান, তারাপদকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম ঠুকলে।

তারাপদর সঙ্গে সঙ্গে হারাধন বাড়ির ভিতরে ঢুকে খুব চওড়া এক কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দোতলার একখানা প্রশস্ত ও আলোকিত হলঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে।

ঘরে ঢুকেই হারাধন হতভম্বের মতন হয়ে গেল। এত বড় হল এবং ঘরের এমন জমকালো সাজসজ্জা সে জীবনে আর কখনো দেখে নি।

উপরে বনবন ক'রে ঘুরছে বৈদ্যুতিক পাখা এবং বৈদ্যুতিক আলোর ঝাড়। দেওয়ালের গায়ে টাঙানো বড় বড় আয়না ও ছবি। ঘরের মেঝে কার্পেটে মোড়া। কার্পেটের উপরে আবার চাদর-ঢাকা নরম বিছানা পাতা। একদিকে ছোট্ট একখানি পালঙ্কের উপরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে একটি হোমরাচোমরা গৌরবর্ণ ও মোটাসোটা লোক কোঁচকানো কাপড় ও সিল্কের পাঞ্জাবি পরে বসে আছেন। তাঁর হাতে আলবোলার রুপো বাঁধানো নল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাঁর গোঁফজোড়া। গোঁফের দুই প্রান্ত ঝুলে এসে পড়েছে প্রায় তাঁর কাঁধের কাছাকাছি। মানুষের এত বড় গোঁফ হারাধন কখনও স্বপ্নেও দেখে নি। হলের কার্পেটের উপরে বিছানো বিছানায় বসে আছে আরো পনেরো-ষোলো জন লোক। তারাও কয়েকটি দলে বিভক্ত। কোন দল খেলছে তাস, কোন দল বসে

বসে কৌতূহল ভরে খেলা দেখছে এবং কোন দল তাকিয়ে আছে পালঙ্কের উপরকার বাবুটির দিকে তীর্থের কাকের মতন।

একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে হারাধন তার দৃষ্টিকে আবার নিবদ্ধ করলে পালঙ্কের উপরকার সেই আশ্চর্য গোঁফজোড়ার দিকে।

তারাপদ তার কানে কানে চুপি চুপি বললে, "উনিই জমিদারবাবু, ওঁকে প্রণাম কর।"

হারাধন তার কথামত কাজ করলে বটে, কিন্তু জমিদারবাবু না তাঁর গোঁফ-জোড়া, কাকে যে নমস্কার করলে সেটা সে নিজেই বুঝতে পারলে না।

জমিদারবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, "কিহে তারাপদ, এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?"

তারাপদ এগিয়ে গিয়ে বললে, "আজ্ঞে, গোলদীঘিতে একটু হাওয়া খেতে গিয়েছিলুম।"

—"বেশ, বেশ! কিন্তু তোমার সঙ্গে ঐ ছোকরাটি কে?"

তারাপদ পালঙ্কের কাছে গিয়ে জমিদারবাবুর সঙ্গে অস্পষ্ট স্বরে কি কথা কইতে লাগল। হারাধন যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে সেই অদ্বিতীয় গোঁফজোড়াকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। সে দেখলে, তারাপদর কথা শুনতে শুনতে গোঁফজোড়া মাঝে মাঝে ফুলে ফুলে এবং মাঝে মাঝে দুলে দুলে উঠছে। গোঁফ যে ফোলে আর গোঁফ যে দোলে, এটাও সে আগে জানত না।

তারপর হঠাৎ সে শুনলে ও দেখলে যে জমিদারবাবু তার দিকে তাকিয়ে দুই হাতে গোঁফের দুই প্রান্ত ধরে পাকাতে পাকাতে বললেন, "ওহে ছোকরা, এদিকে এগিয়ে এসো তো।"

গোঁফ থেকে চোখ না ফিরিয়েই হারাধন ভয়ে ভয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে পালঙ্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গুম্ফাধিকারী বললেন, "তোমার নাম হারাধন পাল?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তুমি ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছ ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তুমি এখানে চাকরি করতে চাও ?"

হারাধনের সেই একই উত্তর—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তোমার কত মাইনে হবে জানো ?"

—"আজ্ঞে না।"

—"মাসে দেড়শো টাকা। এক বছর কাজ করলে আরো পঞ্চাশ টাকা বাড়বে।"

হারাধন এতটা আশা করে নি। এবারে সে একেবারে বোবা হয়ে রইল।

গুম্ফধারী বললেন, "কিন্তু এ-বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ। তোমার হাত দিয়ে অনেক টাকা যাবে আর অনেক টাকা আসবে। তোমাকে বিশ্বাস কি ? কেউ তোমার জামিন হবে ?"

হারাধন মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "আজ্ঞে, কাজটি পেলে আমি দু'শো টাকা জমা রাখতে রাজি আছি।"

গোঁফ ফুলিয়ে জমিদারবাবু বললেন, "ফুঃ! দু'শো টাকা আবার টাকা নাকি ? এক-একদিন তোমার কাছে থাকবে আমার তিন-চার হাজার টাকা। তোমার দু'শো টাকা জমা রেখে আমি কি করব ?"

হারাধন বললে, "আজ্ঞে—"

গোঁফের দুই প্রান্তে আঙুল বুলোতে বুলোতে জমিদারবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "ও আজ্ঞে-টাজ্ঞে চলবে না বাপু! তারাপদর অনুরোধে আমি তোমাকে চাকরি দিতে রাজি আছি বটে, কিন্তু তোমাকে জমা রাখতে হবে অন্তত এক হাজার টাকা।"

হারাধন হতাশ ভাবে বললে, "আজ্ঞে, অত টাকা তো আমার কাছে নেই!"

এইবারে এক পায়ের উপর আর এক পা দিয়ে নিজে দুলতে দুলতে এবং গোঁফ-জোড়াকেও দোলাতে দোলাতে জমিদারবাবু বললেন, "তাহলে

পথ দেখ বাপু, এখান থেকে সরে পড়।"

হারাধন ফিরে নিরাশ চোখে তারাপদর দিকে তাকালে। তারাপদ তাকে হাত ধরে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে তার কানে কানে বললে, "হারাধনবাবু, আপনি এত বোকা কেন? এই না খানিক আগে আপনি আমাকে বললেন, বাড়িতে চিঠি লিখলেই আপনার বাবা টাকা পাঠিয়ে দেবেন?"

হারাধন ম্রিয়মাণ ভাবেই বললে, "কিন্তু এক হাজার টাকা?"

তারাপদ বললে, "শুনলেন তো, এক বছর পরেই আপনার দু'শো টাকা মাইনে হবে! আজকাল বড় বড় এম-এ, বি-এ পাস-করা ভদ্রলোকেরও একশো টাকার চাকরি যোগাড় করতে জিব বেরিয়ে পড়ে। জমিদারবাবু আপনাকে চাকরি দিতে রাজি হয়েছেন খালি আমার কথাতেই তো? এমন চাকরির জন্যেও আপনার বাবা হাজার টাকা জমা রাখতে পারবেন না?"

হারাধন ভাবতে ভাবতে বললে, "তা পাঠালেও পাঠাতে পারেন।

কিন্তু বাবার মত না জেনে কেমন ক'রে আমি কথা দিই?"

তারাপদ বললে, "আমি বলছি আপনার বাবার মত হবেই। তাহলে আপনি এইখানেই দাঁড়ান, আমি জমিদারবাবুকে ব'লে আসি, আপনি হাজার টাকা দিতেই রাজি আছেন।"

তারাপদ আবার এগিয়ে গিয়ে জমিদারবাবুর কানে কানে ফিসফিস ক'রে কি বললে হারাধন তা শুনতে পেলে না বটে, কিন্তু এটা দেখতে পেলে যে তাঁর গোঁফ-জোড়া আবার ফুলে এবং দুলে উঠল। সে আন্দাজ করলে জমিদারবাবুর যত ভাবের অভিব্যক্তি হয় ঐ গোঁফ-জোড়ার দ্বারাই।

তারাপদ ফিরে হাসতে হাসতে বললে, "হারাধনবাবু, আপনাকে চাকরিতে গ্রহণ করা হল। আসুন, এগিয়ে আসুন, আপাতত দু'শো টাকা এইখানে জমা রাখুন।"

হারাধন পালঙ্কের কাছে গিয়ে জমিদারবাবুর সামনে কুড়িখানি দশ টাকার নোট স্থাপন করলে।

জমিদারবাবু সেদিকে ফিরেও না তাকিয়ে ডাকলেন, "নিমাই!"

কার্পেটের উপর উপবিষ্ট লোকদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আজ্ঞে হুজুর!"

জমিদারবাবু বললেন, "আজ থেকে এইখানেই হারাধনবাবুর শোবার ও খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি এঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও।"

নিমাইয়ের পিছনে পিছনে হারাধন সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জমিদারবাবু বললেন, "এ-জীবটিকে কোথায় যোগাড় করলে তারাপদ?"

তারাপদ একগাল হেসে বললে, "ঠিক যোগাড় করতে হয় নি বাবু! ধরতে গেলে ও এক-রকম যেচেই আমাদের জালে এসে ধরা দিয়েছে। মনে হ'ল ওর ভেতরে কিছু শাঁস আছে, তাই ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি।"

বাবু বললেন, "দেখলে তো মনে হয় না শাঁসালো মাল। দু'শো টাকা

দিয়েছে বটে, কিন্তু হাজার টাকা কি ছাড়তে পারবে ?”

—“সে খোঁজ না নিয়ে কি ওকে সঙ্গে এনেছি ?” ব্যাটা পাড়াগেঁয়ে ভূত, শহরে এসেছে বাবুগিরি শেখবার জন্যে। পথে আসতে আসতে ঠারে-ঠোরে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছি, ছোঁড়ার বাপের হাতে কিছু টাকা আছে। খালি হাজার টাকা কেন, আমার বিশ্বাস, নানা অছিলায় ওর কাছ থেকে আরো বেশ-কিছু আদায় করতে পারব।”

বাবু তখন প্রসঙ্গ বদলে বললেন, “কিন্তু তারাপদ, ওদিকের খবর শুনেছ কি ?”

—“কোন্ খবর ?”

—“রতন রায়ের মেয়ের ? তুমি জানো, রতন রায়ের মেয়ে কি ছেলেকে ধরে আনবার জন্যে শম্ভু আর পঞ্চুকে পাঠিয়েছিলুম ? হত-ভাগারা সব-কাজ পণ্ড ক'রে ফিরে এসেছে।”

—“পণ্ড ক'রে ফিরে এসেছে ?”

—“হ্যাঁ। শুনলুম মেয়েটাকে ওরা ভুলিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছিল। কিন্তু পথে আসতে আসতে গাধারা লোভ সামলাতে না পেরে মেয়েটার গা থেকে গয়না খুলে নিতে গিয়েছিল, মেয়েটা চ্যাচামেচি করে, আর তার চিৎকার শুনে কোথা থেকে কে একটা লোক এসে শম্ভুকে আর পঞ্চুকে এমন উত্তম-মধ্যম দিয়েছে যে, উল্লুকরা পালিয়ে আসবার পথ পায় নি। নচ্ছাররা ঘাটে এনে নৌকো ডুবিয়েছে, ওদের আর কোন কাজে পাঠানো হবে না।”

তারাপদ সখেদে বললে. “হায় হায়, এমন দাঁও ফস্কে গেল। রতন রায় মস্ত বড়লোক, মেয়েটাকে কিছুদিন ধরে রাখতে পারলে তার কাছ থেকে বেশ মোটা টাকা আদায় করা চলত।”

বাবু বললেন, “কিন্তু আমি এখনো হাল ছাড়ি নি তারাপদ। রতন রায়ের পেছনে আবার লোক লাগিয়েছি, হয় তার মেয়ে, নয় তার ছেলেকে আমার চাইই চাই।”

তারাপদ বললে, “কিন্তু বাবু, মাছ একবার ছিপের সুতো ছিঁড়ে

পালালে আর কি টোপ গেলে? রতন রায় নিশ্চয় খুব সাবধান হয়েই থাকবে।"

—"তবু দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।"

পঞ্চম

হারাধন বাবাকে চিঠি লিখলে

হারাধন তার বাবাকে এই পত্রখানি লিখলে :

শ্রীশ্রীদুর্গামাতা সহায়

পরম পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীচরণকমলেষু,

বাবা,

আপনাকে প্রণাম করিয়া জানাইতেছি যে, আমি নিরাপদে কলিকাতা নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আপনি শুনিলে হয়তো বিশ্বাস করিবেন না যে, পথে আসিতে আসিতেই এক বিখ্যাত ব্যারিস্টার সাহেবের সহিত আমার অত্যন্ত আলাপ হইয়াছে। তাঁহার বাড়িতে আমি তিন দিবস জামাই-আদরে বাস করিয়াছিলাম। পরে যথাসময়ে সেই বিবরণ আপনাকে জ্ঞাত করিব।

আপনাকে আর-একটি সুসংবাদ প্রদান করিতে চাহি। আপনি শুনিলে নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন যে, কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া প্রথম দিবসেই আমি এক অতিশয় অর্থশালী জমিদারের বাড়িতে ম্যানেজারের পদ লাভ করিয়াছি। বেতন এখন মাসিক দেড়শত মুদ্রা, এক বৎসর পরে মাহিনা বাড়িয়া দুইশত মুদ্রা হইবে।

আমি যে-জমিদারের আশ্রয়ে এখন বাস করিতেছি, তাঁহার তুলনায় আমাদের দেশের জমিদার অতিশয় ক্ষুদ্র। কিন্তু আমাদের সেই জমিদারের ম্যানেজার তো দূরের কথা, গোমস্তা ও বাজার-সরকারদেরও

তো আপনি অবগত আছেন? তাহারাও আমাদের কীট-পতঙ্গের মতো বলিয়া বিবেচনা করে এবং সর্বদাই চাষার ছেলে বলিয়া অপমান করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। আমি রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে এ-হেন বৃহৎ জমিদারের আলয়ে এত টাকা মাহিনায় ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছি শুনিয়া এইবারে তাহারা কি বলে তাহা অবগত হইবার জন্য আমার অতিশয় আগ্রহ হইতেছে। মনস্থ করিয়াছি, কিছুকাল পরে তিন-চারি দিবসের ছুটি লইয়া দেশে গমন করিয়া আমি আপনার পদ-বন্দনা করিব এবং আমাদের দেশস্থ জমিদারবাটীর কুকুর ও টিকটিকিদের পর্যন্ত বুঝাইয়া দিয়া আসিব যে, আমি আর চাষার ছেলের মতো তুচ্ছ নহি, আমি এখন রীতিমত শহুরে বাবু হইয়া উঠিয়াছি, এমন কি কলিকাতার বড় বড় ভদ্রলোকরা অবধি আমাকে এখন বাবু বলিয়া সম্বোধন করে।

কিন্তু আপনার নিকটে আমার আর একটি প্রার্থনা আছে। কলিকাতায় আমার জামিন হইবার মতো লোক কেহ নাই। অথচ জমিদারবাবুর হাজার হাজার মুদ্রা লইয়া আমাকে নাড়াচাড়া করিতে হইবে। আমার চাকুরি হইয়াছে এবং আমি জমিদারবাবুর আশ্রয়েও বাস করিতেছি বটে, কিন্তু এক সহস্র মুদ্রা জমা না রাখিলে আমার ভাগ্যে এ-চাকুরিটি টিকিবে না। ইতিমধ্যেই আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত সেই দুইশত মুদ্রা আমি জমিদারবাবুর নিকট জমা রাখিয়াছি। অতঃপর আপনার শ্রীচরণে নিবেদন এই যে, পত্রপ্রাপ্তিমাত্র আপনি বক্রী আট-শত মুদ্রা আমার নিকটে ডাকযোগে পাঠাইয়া দিবেন।

ভুলো কুকুরটাকে প্রতি দিবস যেন পাতের ভাত খাইতে দেওয়া হয়। ভুলো কি আমার অদর্শনে বড়ই ক্রন্দন করিতেছে? মেনীর বাচ্চাগুলো আরও কত বড় হইয়াছে? আমার বোমা লাটাইটা ভুলিয়া ছাদের উপরে ফেলিয়া আসিয়াছি, মাতাঠাকুরানী তাহা যেন তুলিয়া রাখিয়া দেন। আমার ভ্রাতৃগণ যেন আমার মার্বেল ও লাট্টু প্রভৃতিতে হস্তার্পণ না করে। এ-সব বিষয়ের উপরে আপনিও অনুগ্রহ করিয়া কিছু

কিছু দৃষ্টিপাত করিবেন।

এখানকার সমস্ত কুশল। আপনাদের কুশল-সংবাদ দিয়া সুখি করিবেন। আপনি এবং মাতাঠাকুরানী আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ভ্রাতৃগণকে আমার আশীর্বাদ জানাইবেন। আজ তবে আসি। ইতি—

সেবক

শ্রীহারাধন পাল

চিঠিখানি দেশের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ে শ্রীমান হারাধন দিন-কয়েক নিশ্চিন্ত হয়ে জমিদারবাবুর বাড়ির অন্ন ধ্বংস ক'রে কলকাতার পথে পথে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগল। হপ্তা-খানেকের মধ্যেই কলকাতার অনেক বিশেষত্বের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেল। একদিন থিয়েটার ও দু'দিন বায়োস্কোপ পর্যন্ত সে দেখে ফেললে। জাদুঘর ও চিড়িয়াখানাতেও ঘুরে আসতে ভুললে না। এমন কি মোটরগাড়ির মারাত্মক আক্রমণ হতে কেমন ক'রে আত্মরক্ষা করতে হয় সে-কায়দাটাও শিখে ফেললে খুব চটপট।

আমাদের হারাধন বোকা না হলেও একে অজ পাড়াগেঁয়ে ছেলে, তার উপরে বয়সে বালক এবং পৃথিবী ও সংসারের কোন অভিজ্ঞতাই তার নেই। সে আন্দাজ করতে পারে নি যে, তার মতন একজন অল্প-শিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ বালককে কলকাতার কোন অতি নির্বোধ জমিদারও দেড়শো দুইশো টাকা মাহিনায় কোন কাজে নিযুক্ত করতে পারে না। তাই সে রীতিমত মূর্খের স্বর্গে বসে দিবা-স্বপ্ন দেখতে দেখতে আকাশে প্রাসাদ নির্মাণ করতে লাগল।

কিন্তু কোন কোন ব্যাপার তার চোখেও ঠেকল কেমন যেন বিসদৃশ।

এমন মস্ত অট্টালিকা, কিন্তু এ যেন একটা প্রকাণ্ড মেসবাড়ির মতো। এর মধ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক বাস করে, কিন্তু তারা সবাই পুরুষ-মানুষ। এ-বাড়ির ভিতরে অন্তঃপুর বলে কোন জায়গা নেই। বাসিন্দা-দের অনেকেরই চেহারা, কথাবার্তা ও ব্যবহারও ঠিক ভদ্রলোকের মতো

নয়, বরং তার উলটো। অনেকে আবার প্রকাশ্যেই মদ বা গাঁজা খায়, জমিদারবাবু স্বচক্ষে দেখেও কিছু বলেন না। অনেকেরই পকেটে সর্বদাই ছোরা বা বড় বড় ছুরি থাকে।

হারাধন ভাবলে, হয়তো কলকাতার জমিদারদের হালচালই এইরকম।

দিন-সাতেক পরে হারাধন একদিন সিঁড়ির সামনে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ সিঁড়ির উপরে চার-পাঁচজন লোকের পায়ের শব্দ হল।

কচি কচি গলায় কোন শিশু কেঁদে বললে, "কৈ, আমার বাবা কৈ? আমি বাবার কাছে যাব।"

কে একজন বললে, "তোমার বাবা ওপরে আছেন, দেখবে চল।"

তারপরেই জন চারেক লোক দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল, তাদের একজনের কোলে একটি শিশু। লোকটা শিশুকে নিয়ে দ্রুতপদে তেতলার সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল।

কিন্তু হারাধন এর মধ্যেই শিশুর মুখ দেখতে পেয়েছিল। কি আশ্চর্য, তাকে দেখতে যে অবিকল মিঃ রায়ের ছেলে বিমানকুমারের মতো!

তারাপদ সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখের ভাব লক্ষ্য করছিল। সে শুধোলে, "কি হে হারাধন, তুমি অমন চমকে উঠলে কেন?"

হারাধন বললে, "ঐ খোকাটিকে আমি চিনি।"

তারাপদ সবিস্ময়ে বললে, "ঐ খোকাকে তুমি চেনো?"

—"হ্যাঁ।"

—"ও কে বল দেখি?"

—"মিঃ রতন রায়ের ছেলে বিমান।"

—"রতন রায়কে তুমি চিনলে কেমন ক'রে?"

—"কলকাতায় আসবার আগে আমি তাঁর বাড়িতে তিনদিন ছিলুম।"

—"আর সেইখানেই তুমি ঐ খোকাকে দেখেছ?"

—"হ্যাঁ। বিমান আমাকে নতুন দাদা বলে ডাকে।"

—"হারাধন, তুমি আস্ত পাগল।"

—"কেন?"

—"সহজ মানুষের কখনো এমন চোখের ভুল হয় না।"

—"আমার কি ভুল হয়েছে?"

—"ঐ খোকাটি হচ্ছে আমাদের বাবুর নিজের ছেলে। অসুখ হয়েছে বলে চিকিৎসার জন্যে ওকে কলকাতায় আনা হয়েছে।"

হারাধন হতভম্ব হয়ে গেল। এমন অদ্ভুত চেহারার মিল কি হয়? সেই চুল, সেই কোঁকড়া চুল, সেই জোড়া ভুরু, সেই নাক, সেই ঠোঁট—এমন কি সেই গায়ের রঙ! একেবারে বিমানের প্রতিমূর্তি!

সে বললে, "এ যে অবাক কাণ্ড! আমাকে একবার খোকার কাছে নিয়ে চলুন, আমি আর একবার ভাল ক'রে দেখব।"

—"কী ভাল ক'রে দেখবে?"

—"ঐ খোকাটি বিমান কিনা!"

তারাপদ ক্রুদ্ধ, কর্কশ কণ্ঠে বললে, "আবার ঐ কথা! আমাদের বাবুর ছেলেকে আমি চিনি না? না, ওর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না, বাবু রাগ করবেন!"

—"রাগ করবেন! কেন?"

—"অচেনা লোক দেখলে ভয় পেয়ে খোকার অসুখ বাড়তে পারে।"

—"আমি কি রাক্ষস যে আমাকে দেখে খোকা ভয় পাবে?"

—"দেখ বাপু, তোমার অত কথার জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। তুমি হচ্ছ কর্মচারী, মনিবদের ঘরোয়া কথা নিয়ে তুমি যদি এখন থেকেই মাথা ঘামাতে শুরু কর, তাহলে এ-বাড়িতে আর তোমার ঠাঁই হবে না।" বলতে বলতে তার মুখের উপরে এমন একটা কঠিন ও কুৎসিত ভাব ফুটে উঠল, এর আগে হারাধন যা আর কখনো লক্ষ্য করে নি।

সে আস্তে-আস্তে সরে পড়ল এবং যেতে যেতে শুনতে পেলে তারাপদ আবার বললে, "যারা নিজের চরকায় তেল দেয় না, তাদের

সঙ্গে আমরা কোন সম্পর্ক রাখি না।"

হারাধন কিছুতেই বুঝতে পারলে না, তার অপরাধ হয়েছে কোন-খানে! অবাক হয়ে ব্যাপারটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল ক্রমাগত।

ওদিকে জমিদারবাবু তখন বৈঠকখানায় বসে আছেন আলবোলার নলটি হাতে ক'রে।

হঠাৎ শম্ভু এসে ঘরে ঢুকল, তার মুখের ভাব উদ্বিগ্ন।

বাবু শুধোলেন, "কিরে শম্ভো, এতদিন তুই কোথায় ছিলি? আর তোর মুখখানাই বা এমন জাম্বুবানের মতন হয়েছে কেন?"

জাম্বুবান যে কি জীব এবং তার মুখের ভাব যে কি-রকম, অত খবর শম্ভু রাখত না। সে-সব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সে বললে, "বাবু, যে-ছোকরাটাকে আপনি এখানে ঠাঁই দিয়েছেন, সে কে?"

—"অত খবরে তোর দরকার কি?"

—"আমি আজ এখানে এসেই ওকে চিনতে পেরেছি!"

—"কি চিনতে পেরেছিস? ও তোর মামা, না শ্বশুর।"

—"না বাবু, ঠাট্টা নয়! ঐ ছোঁড়াই লাঠি চালিয়ে রতন রায়ের মেয়েকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল!"

বাবু ভয়ানক চমকে উঠলেন। তাঁর হাত থেকে তামাকের নলটা খসে পড়ে গেল। একটু ভাববার পর একটু হেসে তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "দূর, তাও কখনো হয়? ঐ তো একফোঁটা পাড়াগেঁয়ে ভূত, এখনো ওর গাল টিপলে দুধ বেরোয়, ও কখনো একলা লাঠি চালিয়ে তোদের মতন দু-দুটো হাড়-পাকা পুরানো পাপীকে খেদিয়ে দিতে পারে? তোর রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছে!"

—"কখখনো নয়! আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি ও হচ্ছে সেই ছোকরাই!"

—"কেন বাজে বকচিস!"

—"আমি খাঁটি কথাই বলছি।"

এমন সময়ে তারাপদর প্রবেশ।

বাবু বললেন, "ওহে তারাপদ, শম্ভা আবার কি বলে শোনো।"

—"তুই আবার কি সমাচার এনেছিস রে?"

শম্ভু সব বললে। তারাপদ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ভাবতে লাগল।

বাবু বললেন, "কি তারাপদ, তুমি আবার চিন্তা-নদে ঝাঁপ দিলে কেন?"

—"আজ্ঞে বাবু, শম্ভুর চোখ বোধ হয় ভুল দেখে নি।"

—"বল কি হে?"

—"হারাধনই বোধ হয় শম্ভু আর পঞ্চুকে ধনঞ্জয় দান করেছে। রতন রায়কে সে চেনে। আজ এখানে রতন রায়ের ছেলেকে দেখেও সে চিনে ফেলেছে।"

—"কি সর্বনাশ!"

—"আমাকে সে অনেক কথা জিজ্ঞাসাও করছিল।"

—"তবেই তো! হারাধন বেটা নিশ্চয়ই পুলিসের চর!"

—"বোধ হয় নয়। আমার বিশ্বাস, রতন রায়ের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে দৈবগতিকে।"

দুই হাতে নিজের সুদীর্ঘ গোঁফের দুই প্রান্ত ধারণ ক'রে বাবু বললেন, "এই গুরুতর ব্যাপারটাকে তুমি এত সহজে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কোরো না তারাপদ! হারাধন পুলিসের চর হোক আর না হোক, সে যখন এত খবর রাখে তখন তার মুখবন্ধ করতেই হবে!"

—"কেমন ক'রে?"

—"যেমন ক'রে আমরা লোকের মুখবন্ধ করি।"

—"ওকে খুন করবেন?"

—"নিশ্চয়!"

—"তাহলে ওর কাছ থেকে আর টাকা আদায় হবে না।"

—"বয়ে গেল! তুমি কি বলতে চাও ওর কাছ থেকে দু-চার হাজার টাকা পাওয়ার লোভে আমরা রতন রায়ের মতন এত বড় শিকারকে

হাত-ছাড়া করব? তারপর তুমি আর একটা কথা ভেবে দেখছ না, 'ঐ ছোঁড়া পুলিসের চর না হলেও যদি কিছু সন্দেহ ক'রে পুলিসে খবর দেয় তাহলে আমাদের প্রত্যেকেরই হাতে দড়ি পড়বে তা জানো?"

—"বাবু, আমার বিশ্বাস আপাতত হারাধনের সন্দেহ আমি দূর করতে পেরেছি। আমি কি বলি জানেন? আগে ওকে ভাল ক'রে নিংড়ে সব রস বার করে নিই, তারপর যা-হয় একটা ব্যবস্থা করলেই চলবে।"

—"বেশ, যা ভাল বোঝো কর। তবে এক বিষয়ে খুব সাবধানে থেকো। হারাধনকে নজরবন্দী ক'রে রেখো, ও বাড়ি থেকে বেরুলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে লোক থাকে—কোথায় যায়, কি করে দেখবার জন্যে। কেন জানি না তারাপদ, আমার মেজাজটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল।" বলতে বলতে বাবুর গোঁফ-জোড়া মুখের দুই দিকে ঝুলে পড়ল। অন্যমনস্কের মতন তিনি আবার তামাকের নলটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে টানতে লাগলেন।

ষষ্ঠ

জনার্দন সিঁড়ি জুড়ে বসে থাকে

কলকাতায় এসে হারাধনের নতুন একটি শখ হয়েছিল।

সে দেখলে, কলকাতার লোকেরা লাইব্রেরীতে, চায়ের দোকানে বা বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পাঠ করে। এটা শহুরে ভদ্রলোকের অন্যতম প্রধান লক্ষণ স্থির ক'রে সেও প্রত্যহ একখানি ক'রে বাংলা দৈনিকপত্র কিনতে আরম্ভ করেছে। আজও সে বাসায় যাবার সময় একখানি বাংলা খবরের কাগজ কিনে নিয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে চৌকির উপরে শুয়ে সে খবরের কাগজখানি খুললে। প্রথমে অন্যান্য খবর এবং সম্পাদকীয় টীকা-টিপ্পনী খানিক বুঝে এবং খানিক না বুঝে পাঠ করলে। তারপর দৃষ্টিপাত করলে বিজ্ঞাপন

বিভাগের উপরে।

সংবাদপত্রের মধ্যে তাকে সব-চেয়ে বেশি আকর্ষণ করত এই বিজ্ঞাপন-বিভাগটি। খবরগুলো তো প্রায়ই হয় একঘেয়ে—কোথায় কোন্ সভা হয়েছে তারই বিবরণ ও বড় বড় নামের ফর্দ, কোথায় কে মোটর বা লরি চাপা পড়ে পটল তুলেছে, কোথায় কে দশ পয়সার জিনিস চার আনায় বেচে আদালতে গিয়ে জরিমানা দিয়ে এসেছে, যুদ্ধক্ষেত্রের কোথায় জারমানি পঞ্চাশ পা এগিয়ে এসেছে এবং মিত্র-শক্তিরা প্রবল আক্রমণ ক'রেও সাড়ে-বত্রিশ পা পিছিয়ে পড়েছে, এই তো হচ্ছে প্রতিদিনকার এক-রকম পচা পুরাতন 'টাটকা খবর।'

কিন্তু বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে দেখ। তার সর্বত্রই অফুরন্ত বৈচিত্র্য। কেউ দিতে রাজি তিন টাকায় চূড়ান্ত বাবুয়ানার পুরো সাজ-সজ্জা। কোনো পরম উদার ব্যক্তি মাত্র চার আনা পাঠিয়ে দিলেই এক-ভরি সুবর্ণ বিতরণ করবেন। বরেরা অন্বেষণ করছেন গানে-নাচে-বিদ্যায় ও রূপে শ্রেষ্ঠ কন্যাদের। জ্যোতিষীরা সগর্বে প্রচার করছেন, তাঁদের একখানি মাত্র কবচ কিনলেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সমস্তই একসঙ্গে লাভ করা যেতে পারবে। তথাকথিত চিকিৎসকরা ভরসা দিচ্ছেন তাঁদের 'পেটেণ্ট' ঔষধ একমাত্রা সেবন করলেই পূর্বজন্মেরও সমস্ত ব্যাধি থেকে রোগীরা আরোগ্যলাভ করবেন। কেউ কেউ অশীতিপর বৃদ্ধদেরও জানিয়ে দিচ্ছেন, সন্ন্যাসীদের কাছে প্রাপ্ত দ্রব্যবিশেষের গুণে তাঁরা প্রত্যেকেই আবার দেখতে হবেন নব-যুবকের মতো। এমনি আরো কত ব্যাপার।

হারাধন বিস্ফারিত নেত্রে বিপুল আগ্রহভরে প্রায় শ্বাস রোধ ক'রেই এই-সব বিজ্ঞাপন পড়তে ভালবাসত।

সেদিন বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার দিকে চেয়ে সর্ব-প্রথমে এই বিষয়টি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল :

পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার

"আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান বিমানকুমার রায়কে গত শনিবার হইতে আর পাওয়া যাইতেছে না। হয় সে হারাইয়া গিয়াছে, নয় কেহ

দেখতে হবে। টাকা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তোমাকে চাকরি দিতে পারবেন না, আর এদিকে লোকের অভাবে তাঁর জমিদারীর কাজে বড়ই ক্ষতি হচ্ছে। আমি কি বলি জানো হারাধন? তুমি আজই বাবাকে একখানা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দাও।"

—"আচ্ছা, কালকের দিনটা পর্যন্ত দেখে বাবাকে টেলিগ্রামই করব।"

—"বেশ, তাই কোরো। তবে কাজটা আজ করলেই ভাল হ'ত।" বলতে বলতে তারাপদ আবার ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

এরা টাকার জন্যে হঠাৎ এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেন, হারাধন সে-রহস্যও বুঝতে পারলে না। এই জমিদারবাবুটি যে পৃথিবীর দশ হাত মাটিরও অধিকারী নন, তিনি যে কলকাতার একজন গুণ্ডা, খুনী ও ডাকাতদের বড় সর্দার, হারাধন এ-সত্যটা এখনও আন্দাজ করতে পারে নি। আপাতত ঐ হাজার টাকা হস্তগত করতে পারলেই সর্দারজী যে নিরাপদ হবার জন্যে দুনিয়ার খাতা থেকে তার নাম একেবারে লুপ্ত ক'রে দিতে চান, এটা ধরতে পারলে হারাধনের পিলে যে কতখানি চমকে যেত, আমরা তা বলতে পারি না। কিন্তু এখন তার মন সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে বিমানের চিন্তায়। কারণ অন্তত এইটুকু সে বুঝতে পেরেছে যে, কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বিমানকে এইখানে নিয়ে আসা হয় নি। মফস্বলে সে ধনীদের মধ্যে পারিবারিক শত্রুতার অনেক কাহিনী শ্রবণ করেছে। সেখানে প্রতিহিংসার খাতিরে অনেক খুন-খারাপি পর্যন্ত হয়ে গেছে। মিস্টার রায়ের সঙ্গে জমিদারবাবুর নিশ্চয়ই কোন শত্রুতার সম্পর্ক আছে। বোধহয় মিস্টার রায়ের একমাত্র পুত্র বিমানকে হরণ ক'রে তিনি প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চান। হারাধন নিজের বুদ্ধিতে এইটুকু পর্যন্ত অনুমান করতে পারলে।

তখন সে ভাবতে লাগল, এখন আমার কর্তব্য কি? চাকরির মায়া ছাড়ব? বিমানকে উদ্ধার করব? বিমান হচ্ছে মিস্টার ও মিসেস রায়ের বড় আদরের নিধি, তাঁরা কিছুক্ষণের জন্যেও তাকে চোখের আড়ালে রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না। ছেলের অভাবে না জানি এতক্ষণে

তাঁরা কতই কষ্ট পাচ্ছেন। মিসেস রায় হয়তো আহার-নিদ্রা ছেড়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের কাছ থেকে এই অল্প-পরিচয়েই সে কতখানি আদর, স্নেহ ও ভালবাসা লাভ করেছে। তাঁদের সে নিজের মুখে মা আর বাবা বলে সম্বোধন করেছে। সব জেনেশুনেও সে কি এখনো হাত গুটিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকবে? তাহলে সে কি ভগবানের অভিশাপ কুড়োবে না?

হারাধন উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর দোতলার বারান্দার যেখান থেকে তেতলার সিঁড়ি আরম্ভ হয়েছে, পায়ে পায়ে সেইদিকে হ'ল অগ্রসর।

তেতলার সিঁড়ির নিচের ধাপেই যে-লোকটা বসেছিল তার নাম হচ্ছে জনার্দন। লোকটার চেহারাই কেবল যমদূতের মতন নয়, তার কথাবার্তাগুলোও রীতিমত কাটখোট্টার মতো।

হারাধন হাসিমুখে বললে, "কি জনার্দনবাবু, কখন থেকে দেখছি আপনি এই সিঁড়ি জুড়েই বসে আছেন, বাড়িতে এত ভাল ভাল ঘর থাকতে সিঁড়ির ওপর ধুলোয় বসে কেন?"

অকারণেই তেলে-বেগুনের মতন জ্বলে উঠে জনার্দন মুখ খিঁচিয়ে বললে, "সে-খবরে তোমার দরকার কি হে ছোকরা?"

হারাধন বললে. "না ভাই, দরকার কিছু নেই, কথার কথা জিজ্ঞাসা করছি আর কি! সিঁড়ির ওপর এমনভাবে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তো?"

জনার্দন হুমকি দিয়ে বললে, "হেঁঃ, কষ্ট হচ্ছে! না, আমার কিচ্ছু কষ্ট হচ্ছে না! ভাল চাও তো এখান থেকে মানে মানে সরে পড়!"

—"কেন ভাই, তুমি যে দেখছি একেবারে মারমুখো হয়ে আছ! এখানে এসে আমি কী দোষ করলুম? দু'টো গল্প করছি বৈ তো নয়?"

—"না, না, এটা তোমার গল্প করবার বা বেড়াবার জায়গা নয়! বাবুর হুকুম পেয়েছি, এদিকে কেউ এলেই তাকে গলাধাক্কা দিতে হবে। এখান থেকে যাবে, না গলাধাক্কা খাবে?"

হারাধন আর-কিছু বললে না। বিস্মিত হয়ে এই ভাবতে ভাবতে

তাহাকে মন্দ অভিপ্রায়ে চুরি করিয়াছে। শ্রীমান বিমানের বয়স সাত বৎসর। তাহার বর্ণ গৌর, মাথায় দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশদাম, জোড়া ভুরু, মুখশ্রী সুন্দর। তাহার পরিধানে ছিল লাল রঙের পোশাক। যে-কোনো ব্যক্তি তাহার সন্ধান আনিতে পারিবেন, তাঁহাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

বিজ্ঞাপনের নিচে মিস্টার রায়ের নাম ও ঠিকানা।

হারাধন বিছানার উপর ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। গতকল্য সে এখানেই হুবহু বিমানের মতন দেখতে একটি শিশুর দেখা পেয়েছে—তারাপদ যাকে জমিদারবাবুর ছেলে বলে পরিচয় দিলে। আজ মিস্টার রায়ের নামে এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ ক'রেই তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, কাল সে যাকে দেখেছে সে বিমান ছাড়া আর কেউ নয়। তার কিছুমাত্র ভুল হয় নি, পুরো তিনদিন যাকে নিয়ে সে এত খেলেছে, এর মধ্যেই তার চেহারা কি ভুলে যেতে পারে? হ্যাঁ, ঐ খোকাটিই হচ্ছে বিমানকুমার।

কিন্তু বিমান এখানে এসেছে কেন? কিংবা মিস্টার রায় বিজ্ঞাপনে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, সেইটেই কি সত্য? বিমানকে কেউ কি চুরি ক'রে এখানে নিয়ে এসেছে? কিন্তু কেন?

হারাধন কিছুতেই মনের ভিতর থেকে এই 'কেন'র জবাব পেলে না। তার মনের ভিতরে আরো অনেক 'কেন' জাগতে লাগল। তারাপদ তার কাছে মিছে কথা বললে কেন? বিমানকে সে জমিদারবাবুর ছেলে বললে কেন? আর জমিদারবাবুই বা পরের ছেলে বিমানকে চুরি ক'রে নিজের বাড়িতে এনে রাখবেন কেন?

এই-সব 'কেন'র কোন উত্তরই পাওয়া যায় না। ভেবে হারাধনের মাথা ক্রমেই গুলিয়ে যেতে লাগল, সে হতাশভাবে শেষটা কার্য ও কারণের সম্পর্ক আবিষ্কার করবার চেষ্টা ছেড়ে দিলে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে তারাপদ বললে "কিহে হারাধন, তুমি যে পাকা কলকাতার বাবু হয়ে উঠলে দেখছি!"

পাছে বিজ্ঞাপনটা তার চোখে পড়ে সেই ভয়ে হারাধন খবরের

কাগজখানা মুড়ে ফেলে জোর ক'রে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, "কেন বলুন দেখি ?"

—"আজকাল রোজ খবরের কাগজ না পড়লে তোমার পেটের ভাত হজম হয় না বুঝি ?"

—"আজ্ঞে না তারাপদবাবু, আপনারা তো এখনো আমাকে কোন কাজে বহাল করলেন না, সময় কাটাবার জন্যে একলা বসে বসে কি আর করি বলুন ?"

—"তাই বুঝি যত-সব বাজে ঝুটো খবর পড়বার জন্যে মিছে পয়সা খরচ ক'রে মরছ ?"

—"নাটক-নভেলেও সত্যিকথা তো থাকে না তারাপদবাবু, তবু তো লোকে নাটক-নভেল কেনবার জন্যে পয়সা খরচ করে।"

তারাপদ তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে, "বা-বা, আমাদের হারাধন যে বচন আওড়াতেও শিখেছে। এটা কি কলকাতার হাওয়ার গুণ ?"

হারাধন জবাব না দিয়ে একটু চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, "আচ্ছা তারাপদবাবু, আমাকে আপনারা এমন অলসভাবে বসিয়ে রেখেছেন কেন ? আমার চাকরি হয়েছে, মাসে মাসে আপনারা মাইনে দেবেন, তবু আমার হাতে আপনারা কোন কাজ দিচ্ছেন না কেন ?"

তারাপদ গম্ভীর হয়ে বললে, "আমি সেই কথাই বলতে এসেছি। তোমার বাবা চিঠির কোন জবাব দিয়েছেন ?"

—"না এখনো কোন জবাব পাই নি।"

—"আমার বোধহয় তোমার বাবা টাকা পাঠাতে রাজি নন।"

হারাধন হেসে মাথা নেড়ে বললে, "আপনি আমার বাবাকে জানেন না বলেই এই কথা বলছেন। বাবা আমাকে এত ভালবাসেন যে আমার উন্নতির জন্যে সব করতে রাজি হবেন। দেখুন না, দু'-একদিনের মধ্যেই একেবারে মনিঅর্ডারে বাবার টাকা এসে পড়বে।"

—"হ্যাঁ, এসে পড়াই ভাল। কারণ বাবু বলছিলেন, এই হপ্তার ভেতরেই যদি তোমার টাকা না আসে, তাহলে তাঁকে নতুন লোক

ফিরে এল, জমিদারবাবু হঠাৎ এমন কড়া হুকুম দিলেন কেন? পাছে বিমানকে কেউ দেখতে পায়, সেইজন্তেই কি এই সাবধানতা? তাহলে জনার্দনকে ওখানে পাহারায় নিযুক্ত করা হয়েছে? নাঃ, ব্যাপারটা ক্রমেই বেশি রহস্যময় হয়ে উঠছে—এইবারে দেখা দরকার এই রহস্যের শেষ কোথায়?

সপ্তম

রেড়ীর তেল ভারী ভাল জিনিস

ঢং!……রাত্রি একটা।

সারা কলকাতা ঘুমিয়ে পড়েছে। খালি মানুষরা নয়, ঘুমোচ্ছে যেন বাড়িগুলোও! কোন বাড়ির ভিতর থেকে একটাও শব্দ নির্গত হচ্ছে না। ঘুমোচ্ছে যেন রাজপথগুলোও।

ষষ্ঠীর চাঁদের তিলকও মুছে গিয়েছে আকাশের কপাল থেকে! তারাগুলো যেন ঊর্ধ্বলোকের স্থির জোনাকির আলো। বিশ্বের সবাই যখন নিদালী-মন্ত্রে অচেতন, তখন তাদের আসে রাত জাগবার পালা।

তুনিয়ার এত লোকের মধ্যে আমাদের দরকার এখন হারাধনকে। সে এখন কি করছে? স্বপ্নদর্শন? দেখা যাক।

দরজায় কান পাতলে বুঝবে, তার নাসিকা এখন গর্জন করছে না! আর দরজার ফাঁকে উঁকি মারলে দেখবে, সে এখনো ঘুমিয়ে পড়ে নি।

তবে এত রাতে কি করছে সে? দিচ্ছে ডন, দিচ্ছে বৈঠক। কেন? দেহটাকে সে একটু তাতিয়ে নিতে চায়। তার পরনে কেবল একটা কপনি।

হারাধনের ডন-বৈঠক দেওয়া শেষ হ'ল। তারপর ঘরের কোণে গিয়ে সে একটা বোতল তুলে নিলে। তার ভিতরে ছিল রেড়ীর তেল। সে বোতল কাত ক'রে হাতে রেড়ীর তেল ঢেলে সর্বাঙ্গে ভাল ক'রে মাখতে

লাগল। সে কি পাগলা হয়ে গিয়েছে? রাত একটার সময়ে কেউ কি গায়ে দুর্গন্ধ রেড়ীর তেল মর্দন করে?

তেল-মাখা শেষ হ'ল। এইবারে হারাধন আর দুটো জিনিস তুলে নিলে। মালার মতন জড়ানো একগাছা লম্বা নারিকেল-দড়ি এবং তার তৈলপক্ব মোটা বাঁশের খাটো লাঠিটা।

সে ধীরে ধীরে ঘরের দরজা খুললে। বাইরে একবার উঁকি মেরে দেখলে। বাড়ি স্তব্ধ। কিন্তু তেতলায় ওঠবার সিঁড়িতে আলো জ্বলছে।

বারান্দায় বেরিয়ে সে এগিয়ে গেল পা টিপে টিপে। তেতলার সিঁড়ির কাছে এসে দেখলে, সিঁড়িতে ওঠবার পথ জুড়ে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে জনার্দন। সে হাসছে! জেগে নয়, ঘুমিয়ে। বোধহয় সুখস্বপ্ন দেখছে!

হারাধন দড়ি আর লাঠি মাটির উপরে রাখলে। তারপর ঝাঁপ খেলে জনার্দনের বক্ষদেশে। তারপর দুই হাতে তার গলাটা সজোরে চেপে ধরলে।

জনার্দনের হাসি মিলিয়ে গেল এবং সুখস্বপ্ন গেল ছুটে। সে জাগল দুই চোখ কপালে তুলে। বার-দুয়েক গোঁ গোঁ শব্দ করলে। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল।

হারাধন দড়ি দিয়ে জনার্দনের হাত-পা আচ্ছা ক'রে বেঁধে ফেললে। একবার এদিকে-ওদিকে তাকালে। না, গোঁ-গোঁ শব্দে কারুর নিদ্রাভঙ্গ হয় নি। সে দ্রুতপদে তেতলায় উঠে গেল।

মস্ত-বড় ছাদ—একসঙ্গে বসে তিন-শো লোক পাত পাততে পারে। একেবারে ওদিকে, ছাদের শেষ-প্রান্তে আছে একখানা মাত্র ঘর। হারাধন নিঃশব্দে সেইদিকে ছুটল। বাহির থেকেই বোঝা গেল, সে ঘরের আলোও নেবানো হয় নি।

ঘরের দরজায় বাহির থেকে শিকল তোলা ছিল। দরজা তালাবন্ধ নেই দেখে সে একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। শিকল নামিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে।

এককোণে বিছানা পাতা। বিছানায় ঘুমিয়ে রয়েছে সুন্দর একটি শিশু। তার দুই গালে শুকনো অশ্রুর চিহ্ন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তার

ওষ্ঠাধর এখনো ফুলে ফুলে উঠছে। হ্যাঁ, এই তো বিমানকুমার!

শিশুকে ধরে দুই-একবার নাড়া দিতেই সে ভয়ে শিউরে জেগে উঠল, কাঁদবার উপক্রম করলে।

হারাধন তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত-চাপা দিয়ে নিম্নস্বরে বললে, "চুপ, চুপ, কেঁদো না! বিমান, কোন ভয় নেই, এই দেখ আমি এসেছি!"

বিমানের দুই চোখে ফুটে উঠল গভীর বিস্ময়ের আভাস। সে বললে, "নতুন দাদা!"

—"হ্যাঁ ভাই, আমি তোমার নতুন দাদা!"

—"নতুন দাদা, আমাকে বাবার কাছে নিয়ে চল!"

—"তোমাকে নিয়ে যেতেই তো এসেছি ভাই। কিন্তু শোনো। তুমি আর একটিও কথা বোলো না, তাহলে আর তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারব না। এস, আমার কোলে ওঠ।"

বিমানকে কোলে তুলে নিয়ে হারাধন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ছাদ পেরিয়ে সিঁড়ি বয়ে আবার নামল দোতলার বারান্দায়। জনার্দন তখনো পড়ে রয়েছে মড়ার মতো। তার ভির্মি ভাঙে নি।

দোতলা থেকে একতলায়। সেখানটায় ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। হারাধন আন্দাজে সদর দরজার দিকে অগ্রসর হল।

অন্ধকারে হঠাৎ বাজখাঁই আওয়াজ জাগল—"কোন্ হায় রে?

দ্বারবান! এও বোঝা গেল, সে ছুটে আসছে! ছায়ামূর্তিটা অল্প অল্প দেখাও গেল। হারাধন তাড়াতাড়ি বিমানকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে।

দ্বারবান লাফিয়ে পড়ে হারাধনকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরলে। কিন্তু তার গা এখন রেড়ীর তেলের মহিমায় মাছের চেয়েও পিচ্ছল! হারাধন এক ঝটকান মেরে দ্বারবানের বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলে অত্যন্ত সহজেই। তারপর অন্ধকারেই চালালে দমাদম লাঠি!

মারোয়াড়-নন্দন ষাঁড়ের মতন চেঁচিয়ে উঠল, "বাপ রে বাপ, জান গিয়া!" তারপরেই একটা ভারী দেহ-পতনের শব্দ!

দ্বারবান পপাত ধরণীতলে, কিন্তু চারিদিকে শোনা গেল দরজার পর

দরজা খোলার দুম-দাম শব্দ! চারিদিকে দ্রুত-পদধ্বনি! চারিদিকে জ্বলে উঠল আলোর পর আলো!

দলে দলে লোক নিচে ছুটে এসে দেখলে, দ্বারবান রক্তাক্ত মস্তকে উঠানে পড়ে ছটফট করছে এবং সদর দরজা খোলা!

বাবু দ্বারবানকে শুধোলেন, কি হয়েছে? কিন্তু দ্বারবান বিশেষ কিছুই বলতে পারলে না।

এমন সময়ে তারাপদ ঝোড়ো কাকের মতো নিচে নেমে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "বাবু, বাবু! জনার্দনের হাত-পা বাঁধা, তেতলায় রতন রায়ের ছেলে নেই, দোতলায় হারাধনও নেই!"

বাবুর গোঁফ ঝুলে পড়ল। তিনি বললেন, "কেয়াবাৎ! 'তব বাক্য শুনি ইচ্ছি মরিবারে'!"

—"হারামজাদাকে আমি দেখে নেব!" তারাপদ সদরের দিকে পদ-চালনার চেষ্টা করলে।

বাবু খপ ক'রে তার হাত ধরে ফেলে বললেন, "কোথা যাও?"

—"হারাধনকে ধরতে।"

—"অর্থাৎ নিজেও ধরা দিতে? বাপু, তুমি কি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির? রাস্তায় গোলমাল হলেই লাল-পাগড়ির আবির্ভাব হবে, তা কি জানো না? তারপর কেঁচো খুড়তে বেরুবে সাপ, এ বুদ্ধিটুকুও কি তোমার নেই?"

তারাপদ পদচালানার ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ দমন ক'রে বললে, "আমার যে নিজের হাত-পা কামড়াবার সাধ হচ্ছে!"

বাবু গোঁফের উপরে আঙুল বুলিয়ে বললেন, "নিজের হাত-পা যত-খুশি কামড়াও, আমরা কেউ তোমাকে বাধা দেব না। কিন্তু ও-কাজটাও তোমাকে চটপট সংক্ষেপে সারতে হবে, কারণ আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই! এখনি পুলিসের টনক নড়বে, সকাল হবার আগেই আমাদের তল্পি-তল্পা গুছোতে হবে। বুঝেছ?

—"হায় হায় হায় হায়! একটা পাড়াগেঁয়ে ভূতের হাতে শেষটা কিনা ঠকে মরতে হল!"

—"উঁহু, আমি বলি হারাধান হচ্ছে পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আর তুমি হচ্ছ শহুরে ভূত! এই বেনো-জলকে এখানে ঢুকিয়েছিল কে?"

—"আমিই বটে!"

—"প্রথম সন্দেহ হতেই ওর ভবলীলার পালা সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গ ক'রে দিতে বলেছিলুম। তখন আপত্তি করেছিল কে?"

—"আমিই বটে।"

—"অতএব বাবাজী, এরপর থেকে আমি যা বলি কান পেতে শুনো।"

—"বলুন, কি বলতে চান?"

—"তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি। আমার বুদ্ধি কম হলে তোমার গোঁফও আমার চেয়ে লম্বা হ'ত। বুঝেছ? এখন চল, নেপথ্যে গিয়ে যবনিকাপাত করি!"

হারাধনের ফাঁড়া এইখানেই কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু নিমরাজী হয়েও শেষটা কি ভেবে তারাপদ বেঁকে দাঁড়াল, হঠাৎ মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল, "না, না, এ হতেই পারে না, হতেই পারে না!"

—"কি হতে পারে না?"

—"হারাধনকে ছেড়ে দেওয়া!"

—"কেন হতে পারে না বাপু?"

—"বাবু, আমি ভেবে দেখলুম, হারাধনকে যদি ছেড়ে দি, তাহলে কেবল আমাদের দলই ভেঙে যাবে না, সেইসঙ্গে আমাদেরও চিরদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে!"

—"কিন্তু হারাধনকে ধরবে কেমন ক'রে? সে কোন্ পথ দিয়ে চোঁচা দৌড় মেরেছে, আমরা কেউ তা জানি না!"

তারাপদ বললে, "বাবু, আপনি এত বড় বুদ্ধিমান হয়েও, বুঝতে পারছেন না যে, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্তই!"

এইভাবে বাবুরও বুঝতে বিলম্ব হল না। মাথা নেড়ে ও গোঁফে তা দিয়ে তিনি বললেন, "হুঁ, ঠিক! ছেলেটাকে নিয়ে হারাধন এখন সোজা ছুটবে রতন রায়ের বাড়ির দিকেই!"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। রতন রায়ের বাড়িতে পৌঁছতে গেলে টালিগঞ্জের রিজেণ্ট পার্কের ভিতর দিয়ে যেতেই হবে। সেখানে আনাচে-কানাচে আমরা লুকিয়ে থাকব, তারপর হারাধন এলেই—হুঁহুঁ, বুঝতে পারছেন? এত রাতে সেখানে জনমানব থাকবে না, সুতরাং—"

সমূহ উত্তেজনায় বাবুর গোঁফজোড়া ফুলে উঠল। বাবুর গ্যারাজ বা গুদামে ছিল একখানা চোরাই মোটর, তৎক্ষণাৎ সেখানা বার ক'রে আনা হ'ল এবং তার উপর টপাটপ উঠে বসল কয়েকজন গুণ্ডার মতো লোক।

তারাপদ মুখে মুরুব্বিয়ানার ভাব ফুটিয়ে তুলে বললে, "ঘুঘু, দেখি ধান খেয়ে তুমি কেমন ক'রে পালাও। আমরা বাসা আগলে বসে থাকব। কেমন বাবু, ফন্দিটা কি মন্দ?"

—"না, মন্দ নয়। কিন্তু—"

—"আবার কিন্তু কেন বাবু?"

হঠাৎ বাবুর মুখে ফুটল উদ্বেগের চিহ্ন। তাঁর গোঁফজোড়া নেতিয়ে পড়তে চাইলে। কেমন যেন মনমরার মতো তিনি বললেন, "তারাপদ, তারাপদ, আমার চোখ এমন নাচতে শুরু করলে কেন? এটা তো ভাল লক্ষণ নয়!"

তারাপদ উৎসাহ দিয়ে বললে, "কুছ্ পরোয়া নেহি! চোখ নাচছে শিকার ধরবার আনন্দে! এই, চালাও গাড়ি! জয় মা কালী—কলকাত্তাওয়ালী!"

অষ্টম

দুমুখো ভূতের কাঁচা-পাকা হাসি

সেই ভয়াবহ বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিমানকে কাঁধে ক'রে হারাধন রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল প্রাণপণে।

অন্ধকার রাস্তা, জনপ্রাণীর সাড়া নেই। সে কোথায় যাচ্ছে তা

জানে না, হারাধন ছুটছে দিগ্বিদিক্‌-জ্ঞানহারার মতো। তার মনে জাগছে কেবল এক কথাই—পিশাচদের কবল থেকে যেমন করে হোক বিমানকে রক্ষা করতেই হবে, নিজের প্রাণ যায় তাও স্বীকার!

এইভাবে বেশ খানিকটা পথ পার হয়ে সে যখন চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, কোথাও কোন বিভীষিকার ছায়া পর্যন্ত নেই, তখন বিমানকে কাঁধ থেকে নামিয়ে একটিবার দাঁড়িয়ে পড়ল হাঁপ ছাড়বার জন্যে।

তখন তারা এসে পড়েছে চৌরঙ্গীতে গড়ের মাঠের ধারে। দপদপে আলোগুলো তখন চোখ মুদে অন্ধকারকে পথ ছেড়ে দেয় নি বটে, কিন্তু কোথাও নেই বিপুল জনতার চিহ্ন, মোটর ট্রাম বাসের ধূমধড়াক্কা ও হরেক রকম হট্টগোলের শব্দ—এ যেন এক অবিশ্বাস্য নতুন চৌরঙ্গী!

একদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা সার বেঁধে আকাশের দিকে মাথা তুলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে যেন প্রেতপুরীর পর প্রেতপুরী; এবং আর একদিকে দূরবিস্তৃত গড়ের মাঠ তার গাছপালা ঝোপঝাপ নিয়ে আলোকরাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে হারিয়ে গিয়েছে প্রথমে আবছায়া ও তারপর অন্ধকারের অন্তরালে। কোনখানেই নেই জনপ্রাণীর সাড়া, চারিদিক এত স্তব্ধ যে শোনা যায় নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ! হারাধনের মনে হতে লাগল সে যেন কোন মৃত শহরের মাঝখানে এসে পড়েছে!

পাহারাওয়ালাদের লালপাগড়িগুলোও তখন রাস্তার উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, নইলে এমন অসময়ে হারাধনের তেল-চকচকে কপনি-পরা দেহ দেখলে নিশ্চয়ই লাঠি ঘুরিয়ে তেড়ে আসত! কিন্তু এখন তার পাহারাওয়ালার হাতে গ্রেপ্তার হতে কোন ভয়ই নেই—কারণ সেটা হবে শাপে বরের মতো! লালপাগড়ির পাল্লায় পড়লে জমিদার-বাবুর চ্যালা-চামুণ্ডারা আর তাকে ধরতে পারবে না! মারাত্মক রোগযন্ত্রণায় কাতর রোগীরা যেমন যমকেও স্মরণ করে, হারাধনও তখন মনে মনে ডাকতে লাগল—হে লালপাগড়ি, দয়া ক'রে একটিবার তুমি দেখা দাও! কিন্তু মিছেই ডাকাডাকি, হারাধন তো খাস কলকাতার ছেলে নয়, কাজেই সে জানে না যে, দরকারের সময়ে লালপাগড়িরা

কোনদিনই খবরদারি করতে আসে না।

হারাধন জানত, চৌরঙ্গীর রাস্তা ধরে সিধে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হলে টালিগঞ্জে গিয়ে পড়া যায়। তারপর 'ট্রামওয়ে টার্মিনাস' পার হয়ে বাঁয়ে মোড় ফিরে মাইল দেড়েক গেলেই রতন রায়ের বাড়ি পাওয়া যাবে।

সে বললে, "বিমান, এইবারে তুমি পিঠে চ'ড়ে দুইহাত দিয়ে আমাকে ভাল ক'রে জড়িয়ে থাকো! কিন্তু দেখো, যদি কোন হাঙ্গাম হয়, তুমি যেন ভয় পেয়ে হাত ছেড়ে দিও না।"

বিমান হাসিমুখে বললে, "আচ্ছা।"

—"হ্যাঁ, কিছুতেই হাত ছেড়ে পিঠ থেকে নেমে পড়বে না! যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, ততক্ষণ তোমার কোন ভয় নেই।"

বিমানের হাসিমুখ দেখেই বোঝা গেল, নতুনদাদাকে পেয়ে সে-সব ভয়ভাবনাই ভুলে গিয়েছে! নিস্তব্ধ রাত্রে চৌরঙ্গীর এমন আশ্চর্য নির্জনতাও সে কখনো চোখে দেখে নি এবং মানুষ ঘোড়ার পিঠে চড়ে এমন ছুটোছুটি খেলাও আর কোনদিন খেলে নি, কাজেই তার কাছে সমস্তটাই খুব মজার ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছিল।

বিমানকে পিঠে তুলে নিয়ে হারাধন আবার ছুটতে শুরু করলে জোরকদমে। তারা যখন গড়ের মাঠের শেষ প্রান্তে বড় গীর্জার কাছে এসে পড়েছে তখন আবার আর এক কাণ্ড!

একটা লালমুখো গোরা বেধড়ক মদ খেয়ে ফুটপাতে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে ঝিমোতে ঝিমোতে নেশার স্বপন দেখছিল। আচমকা দ্রুতপদশব্দ শুনে চোখ মেলে দেখে, একটা তেল-চকচকে ন্যাংটা কালা আদমি ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে—কি আশ্চর্য, তার দেহের উপর দুই-দুইটা মুণ্ড! নিশ্চয়ই ভূত দেখেছে ভেবে সে আর্তনাদ ক'রে দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললে!

মাতাল গোরাটার রকম-সকম দেখে এত বিপদেও হারাধন হো হো ক'রে না হেসে থাকতে পারলে না এবং তার সঙ্গে কচি গলায় খিল-খিলিয়ে হাসতে লাগল বিমানও!

এইবারে গোরাটার নাড়ী ছেড়ে যাবার যো আর কি। বাপরে, এই দুমুখো ভূতটা আবার একসঙ্গে দু-রকম গলায় হাসতেও পারে। পাছে সেই অসম্ভব চেহারাটা আবার স্বচক্ষে দেখতে হয় সেই ভয়ে আরো জোরে প্রাণপণে চোখ মুদে গোরাটা কান্নার সুরে ইংরেজীতে যা বললে, বাংলায় তার মানে দাঁড়ায় এই : "হে আমার ভগবান, এই দুমুখো ভূতের খপ্পর থেকে আমাকে রক্ষা কর।"

হারাধন হাসতে হাসতে আবার নিজের পথ ধরলে। যদিও ব্যাপারটা আরো কতদূর গড়ায় সেটা দেখবার তার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন তো মজা দেখবার সময় নেই।

এল ভবানীপুর, এল কালীঘাট, এল রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের মোড়। তারপর টালিগঞ্জের পোল পেরিয়ে, ট্রামওয়ে টার্মিনাস পিছনে রেখে রিজেণ্ট পার্কে যাবার রাস্তা।

শেষরাতে মানুষদের ঘুম আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে, মাথার উপরে জেগে আছে খালি উড়ন্ত প্যাঁচা আর বাদুড়রা। এখানে চৌরঙ্গীর মতো বিদ্যুৎবাতির মালা নেই, মাঝে মাঝে ঘুটঘুটে অন্ধকারকে ছ্যাঁদা ক'রে জ্বলছে এক একটা মিটমিটে আলো। অন্ধকার দূর হয় না, আলো দেখা যায় নামমাত্র। পথের এপাশে-ওপাশে আবছায়া মেখে দাঁড়িয়ে আছে গাছের পরে গাছ, তাদের পাতায় পাতায় থেকে থেকে বাতাসের শিউরে ওঠার শব্দ।

সেইখানে পথের একধারে রাত-আঁধারে কালো গা মিলিয়ে অপেক্ষা করছে একখানা মোটরগাড়ি। তার ভিতরে কোন আরোহী নেই, কিন্তু তার আড়ালে রাস্তার উপরে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে কতকগুলো ছায়ামূর্তি। শিকারী হিংস্র জন্তুর মতো তাদের হাবভাব।

সিগারেট ধরাবার জন্যে ফস ক'রে কে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে, অল্পক্ষণের জন্যে দেখা গেল জাল জমিদারবাবুর কাঁকড়াদাড়া গোঁফ।

তারাপদ ফিসফিস ক'রে বলে উঠল, "ও বাবু, করেন কি, করেন কি?"

শুয়োরের মতো ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে বাবু বললেন, "কি আবার করব,

সিগারেট ধরালুম দেখতে পাচ্ছ না?"

—"আমি তো দেখছি, যদি আরো কেউ দেখে ফেলে?"

—"এখানে আর কে দেখবে? ঝিঁঝিপোকা? কোলা ব্যাঙ? না বুনো মশা?"

—"না বাবু, সাবধানের মার নেই।"

মহা ক্রোধে আর উত্তেজনায় বাবুর মস্তবড় ভুঁড়িটা একবার ফুলে উঠতে ও আর একবার চুপসে যেতে লাগল। জ্বলন্ত চক্ষে তিনি বললেন, "চুপ ক'রে থাকো! কাকে সাবধান হতে বলছ? এতদিন তোমরা কতটা সাবধান হয়ে ছিলে? তোমরা যদি সাবধান হতে পারতে তাহলে আজ —উঃ, বাপরে বাপ।" কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে তিনি আর্তনাদ ক'রে উঠলেন।

—"কি হ'ল বাবু, কি হ'ল?"

—"যা হবার তাই হ'ল। একটা বোম্বাই মশা আমার নাকের ডগায় কামড়ে দিয়েছে। খালি কি নাক? আমার গোটা মুখখানা ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছ কি?"

আর একটা লোক অভিযোগ ক'রে বললে, "বাবু, এখানটা হচ্ছে মশার ডিপো, আমরা আর সহ্য করতে পারছি না।"

রাগে গসগস করতে করতে ও নাকের ডগায় হাত বুলোতে বুলোতে বাবু বললেন, "তারাপদর অসাবধানতার জন্যেই সকলের আজ এই দুর্দশা। তারাপদ আবার আমাদের সাবধান হতে বলছে। না, আমরা আর সাবধান হব না! বেশ বোঝা যাচ্ছে, হারাধন-বেটা ছোঁড়াটাকে নিয়ে অন্য কোনদিকে পিঠটান দিয়েছে—ইস্, ইস্, ইস্।" বাবু লম্ফ ত্যাগ ক'রে ঘন ঘন পা ঝাড়তে লাগলেন।

—"আবার কিছু হ'ল নাকি বাবু?"

—"হ'ল না তো কি? নিশ্চয় বিছে কি সাপের বাচ্চা। পা বেয়ে সড়সড় ক'রে উপরে উঠছিল! চল হে, এখান থেকে সবাই মানে মানে সরে পড়া যাক—আজ আর কেউ আসবে না।"

তারাপদ বললে, "বাবু, আর একটু সবুর করুন।"

বাবু নাচার ভাবে ব'সে পড়ে বললেন, "আমি বেশ বুঝতে পারছি তারাপদ, আজকের গতিক সুবিধের নয়।"

—"চুপ, চুপ! চেয়ে দেখুন!"

বাবু সচমকে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দৃষ্টিচালনা করলেন। দূরে 'ল্যাম্পপোস্টে'র তলায় চকিতের জন্যে দেখা গেল একটা ছুটন্ত মূর্তি। তারপরই শোনা গেল কার দ্রুত পায়ের শব্দ। কে দৌড়তে দৌড়তে এদিকেই আসছে!

তারাপদ বললে, "নিশ্চয় হারাধন!"

বাবু বললেন, "খুব হুঁশিয়ার! বেটা অনেক কষ্ট দিয়েছে, আবার যেন চোখে ধুলো না দেয়! চারিদিক থেকে ওর উপরে লাফিয়ে পড়ো—ওকে একেবারে শেষ করে ফ্যালো, তারপর রতন রায়ের ব্যাটাকে গাড়িতে এনে তোলো!"

যমদূতের মতো লোকগুলো ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল এবং প্রত্যেকেরই হাতে চকচকিয়ে উঠল এক-একখানা শাণিত ছোরা!

সকলের আগে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল তারাপদ—তার চোখে-মুখে বীভৎস হিংসার ছাপ!

দৌড়ে আসছিল হারাধনই বটে! কিন্তু তারাপদ তার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারলে না—সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর নিজের পৃষ্ঠদেশে লম্বমান বিমানের কানে ফিসফিস ক'রে বললে, "খোকন, তোমার কোন ভয় নেই! তুমি চোখ মুদে ফ্যালো, তারপর আরো জোরে আমাকে জড়িয়ে ধর!"

তারাপদ তখন তার উপরে লাফিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

মোটা বাঁশের লোহাবাঁধানো খাটো লাঠিটা তখনও হারাধনের হাতে ছিল। তড়িৎবেগে তার হাত উঠল শূন্যে এবং ভারী লাঠিগাছা সবেগে ও সজোরে নিক্ষিপ্ত হ'ল তারাপদর দিকে। অব্যর্থ তার লক্ষ্য! বিকট আর্তনাদে আকাশ ফাটিয়ে তারাপদ তৎক্ষণাৎ মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে মাথাকাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে লাগল—লৌহমণ্ডিত লাঠির অগ্রভাগটা প্রচণ্ড বেগে গিয়ে পড়েছে তার চোখের উপরে!

এই আকস্মিক ও অভাবিত বিপর্যয়ে আততায়ীরা দাঁড়িয়ে পড়ল স্তম্ভিতের মতো এবং হারাধনও ত্যাগ করলে না তাদের সেই কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তার সুযোগ—পরমুহূর্তেই পাশের দিকে লাফিয়ে পড়ে তড়বড় ক'রে একটা উঁচু গাছের উপরে উঠতে লাগল। পাড়াগেঁয়ে ছেলে,

শিশুকাল থেকেই গাছে চড়তে ওস্তাদ, সকলের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়ল অবিলম্বেই।

তারাপদর ষণ্ডকণ্ঠের গণ্ডগোলে ভেঙে গেল দুই পাহারাওয়ালার চটকা। আর্তনাদের উৎপত্তি কোথায় জানবার জন্যে তারা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে।

কিন্তু বাবু সে সম্ভাবনা আমলেই আনলেন না, চণ্ডালে-রাগে আত্মহারা হয়ে তিনি বলে উঠলেন, "তোরাও গাছে চড়্, পাড়াগেঁয়ে শয়তানটাকে ধরে মাটির উপরে ছুঁড়ে ফেলে দে—কেটে কুটি-কুটি ক'রে ফ্যাল—আজ এস্পার কি ওস্পার!"

গাছের টঙে উঠে হারাধনও গলা ছেড়ে চ্যাঁচাতে লাগল—"খুন, খুন! ডাকাত! কে কোথায় আছ দৌড়ে এস! খুন! ডাকাত!"

তারাপদর ভয়ঙ্কর আর্তনাদেই সেখানকার অনেকের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, এখন আবার হারাধনের বলিষ্ঠ কণ্ঠের গোলমাল জাগিয়ে তুললে গোটা অঞ্চলটাকেই!

এই হট্টগোলের নিশ্চিত পরিণাম বুঝে বাবুর সাঙ্গপাঙ্গরা হারাধনকে বধ করবার জন্যে গাছে চড়বার প্রস্তাব কানেই তুললে না। তারা মোটরকারের দিকে দৌড়ে গেল হন্তদন্তের মতো। কিন্তু বিপদকালে গাড়িখানাও ত্যাগ করলে তাদের পক্ষ—সে 'স্টার্ট' নিতে রাজি হ'ল না।

প্রথমেই শোনা গেল ধাবমান পাহারাওলাদের পায়ের শব্দ।

ষণ্ডামার্কের দল তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারলে দৌড় মারলে।

কিন্তু ফল হ'ল না, তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে জাগ্রত বাসিন্দাদের বেড়াজাল। সর্বাগ্রে পেটমোটা কাঁকড়া-গুঁফো জাল জমিদার, তারপর একে একে প্রত্যেক বদমাইশ ধরা পড়তে বিলম্ব হ'ল না।

তখন বৃক্ষশাখা ত্যাগ ক'রে মাটির উপরে অবতীর্ণ হ'ল একসঙ্গে ডবল মূর্তি।

প্রশ্ন হ'ল, "কে তোমরা, কে তোমরা?"

—"আমি হারাধন।"

—"আমি বিমান।"

হারাধন বললে, "ওরা আমাদের খুন করতে এসেছিল।"

বিমান বললে, "আমি বাড়িতে যাব!"

পাহারাওয়ালারা বললে, "না, তোমরা এখন থানায় যাবে।"

বিমান চকোলেট খেতে দেবে

তারা থানায় গিয়ে হাজির হ'ল। ভোর না হওয়া পর্যন্ত হারাধন ও বিমানকে বসিয়ে রাখা হ'ল একটা ঘরে। নতুন দাদার তৈলাক্ত কোলের উপরে শুয়ে বিমানও বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিতে আপত্তি করলে না।

সকালবেলায় হারাধনের কপনি-পরা তৈলাক্ত চেহারা দেখে ইনস্পেক্টার-বাবুর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে বাপু?"

—"আজ্ঞে, হারাধন পাল।"

—"তোমার সঙ্গের ও-খোকাটি কে?"

—"ব্যারিস্টার মিঃ রতন রায়ের ছেলে।"

—"কি বললে? মিঃ রতন রায়ের ছেলে? ওকে তুমি কোথায় পেলে?"

—"জমিদার-বাবুর বাড়িতে।"

—"কে জমিদারবাবু?"

—"তাহলে সব কথা খুলে বলি শুনুন।"

হারাধন গোড়া থেকে আরম্ভ ক'রে নিজের সমস্ত কাহিনী বর্ণনা ক'রে গেল, কিছুই লুকোলে না। শুনতে শুনতে ইনস্পেক্টারবাবুর মুখের উপরে নানাভাবের রেখা ফুটে উঠতে লাগল।

হারাধনের আত্মকাহিনী সমাপ্ত হ'লে পর ইনস্পেক্টারবাবু উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, "হারাধন, কি ব'লে তোমার প্রশংসা করব জানি না, যেখানে তোমার মতন ছেলে থাকে, সে পাড়াগাঁ হচ্ছে কলকাতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ! তুমি হচ্ছ দেশের সুসন্তান! একটু অপেক্ষা কর, আমি ফোনে মিঃ রায়কে সুখবরটা দিয়ে আসছি।"

ইনস্পেক্টারবাবু পাশের ঘরে চলে গেলেন।

হারাধন ডাকলে, "বিমান!"

—"কি নতুন দাদা?"

—"তোমার ভয় করছে?"

—"উঁহু!"

—"কেন ভয় করছে না?"

—"তুমি যে কাছে রয়েছ।"

—"তুমি আমাকে এত ভালবাসো?"

—"হুঁ, খুব—খুব ভালবাসি।"

—"তোমার ক্ষিদে পেয়েছে?"

—"না।"

—"কেন ক্ষিদে পায় নি?"

—"বাবা আর মাকে না দেখলে আমার ক্ষিদে পাবে না।"

—"তোমার বাবা এখনি এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন।"

—"তুমিও আমার সঙ্গে যাবে তো?"

—"না ভাই, আমি যাব অন্য জায়গায়।"

—"ইস্, তাই বৈকি! আমি তোমাকে ধরে নিয়ে যাব।"

—"ছিঃ ভাই, কারুকে কি ধরে নিয়ে যেতে আছে? এই ছাখো না, তোমাকে দুষ্টু লোকেরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল ব'লে তোমার কত কষ্ট হচ্ছে।"

—"দূর, আমি কি তোমাকে ঐ-রকম ধরে নিয়ে যাব?"

—"তবে?"

—"আমি তোমাকে আদর ক'রে ধরে নিয়ে যাব।"

—"ধ'রে নিয়ে গিয়ে কি করবে?"

—"তোমার সঙ্গে খেলা করব।"

—"আমার যখন ক্ষিদে পাবে?"

—"চকোলেট, টফি, লজেঞ্জুস, বিস্কুট খেতে দেব।"

—"তাহলে তো দেখছি আর আমার কোন ভাবনাই নেই।"

এমন সময়ে ইনস্পেক্টারবাবু ফোন ক'রে ফিরে এসে বললেন, "মিঃ রায় এখনি থানায় আসছেন।"

হারাধন ব্যস্ত হয়ে বললে, "এই কপনি পরে তেলমাখা গায়ে কেমন ক'রে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব?"

ইনস্পেক্টারবাবু হেসে বললেন, "ভয় নেই হারাধন, এখনি তোমাকে সাবান, তোয়ালে আর শুকনো কাপড় দেবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

হারাধন তাড়াতাড়ি সাবান মেখে স্নান ক'রে শুকনো কাপড় পরে নিলে।

তারপর মিঃ রায় এলেন। গাড়িতে কেবল তিনি নন, তাঁর স্ত্রী

প্রতিমা ও তাঁর মেয়ে প্রীতিকেও সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন।

বিমান দোড়ে গিয়ে একেবারে বাবার কোল অধিকার করলে।

মিঃ রায় হারাধনের মাথার উপরে একখানি হাত রেখে অভিভূত কণ্ঠে বললেন, "বাবা হারাধন, তুমি গেল-জন্মে আমার কে ছিলে জানি না, কিন্তু যে উপকারটা করলে এ-জীবনে আর তা ভুলব না?"

প্রতিমা তার দুটি হাত ধরে বললেন, "প্রীতিকেও তুমি বাঁচিয়েছ, বিমানকেও তুমি বাঁচালে। এবার থেকে ওদের আমি তোমার হাতেই সমর্পণ করলুম। কেমন বাবা, এ ভারটি নিতে পারবে তো?"

হাধারন বললে, "মা, পারলে এ ভারটি নিশ্চয়ই নিতুম। কিন্তু আমি যে আজকেই দেশে চলে যাচ্ছি।'

মিঃ রায় সবিস্ময়ে বললেন, "সে কি, এর মধ্যেই তোমার কলকাতা দেখার শখ মিটে গেল?"

—"হ্যাঁ বাবা। আমাদের মতো পাড়াগেঁয়েদের জন্যে কলকাতা শহর তৈরি হয় নি। কলকাতার যেটুকু পরিচয় পেয়েছি তাইতেই বুঝে নিয়েছি যে, আমাদের পক্ষে পাড়াগাঁই ভাল। কলকাতা যতই সুন্দর হোক, তাকে আমার সহ্য হবে না।"

প্রীতি এগিয়ে এসে হারাধনের হাত চেপে ধরে বললে, "ইস্, তোমাকে যেতে দিলে তো যাবে!"

হারাধন বললে, "না বোন, আমাকে যেতে হবেই। কলকাতায় থাকতে আমার ভয় হচ্ছে, এখানকার মানুষরা ভয়ানক।"

মিঃ রায় বললেন, "না হারাধন, যতটা ভাবছ কলকাতা ততটা খারাপ নয়। এখানকার অন্ধকারটাই আগে তোমার চোখে পড়েছে বটে, কিন্তু কিছুদিন এখানে থাকলে কলকাতার আলোও তোমার চোখে পড়বে। আমাদের কলকাতা হচ্ছে বহুরূপী, যে যেমন চায় সে তার কাছে সেই রূপেই ধরা দেয়। কলকাতাকে দেখবার জন্যে তুমি ভুল পথ বেছে নিয়েছিলে, তাই বিপদেও পড়েছ। আমার কাছে থাকলে তুমি দেখবে এক নতুন কলকাতাকে।"

হারাধন বললে, "বাবা, আপনি আমাকে ভালবাসেন বটে, কিন্তু আমি আপনার গলগ্রহ হতে চাই না।"

—"না, না হারাধন, এ তোমার ভুল বিশ্বাস। আমি তোমাকে নিজের ছেলের মতই দেখব। আমি দেখেছি তোমার ভিতরে আগুন আছে। ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখিয়ে আমি তোমার ভিতরকার আগুন আরো উজ্জ্বল ক'রে তুলতে চাই—তুমি হবে দেশের এক উজ্জ্বল রত্ন!"

—"কিন্তু আমার বাবা মত দেবেন কি?"

—"তোমার বাবাকে রাজী করবার ভার নিলুম আমি নিজেই।...... হ্যাঁ, ভাল কথা। আমার কাছে তোমার একটি পাওনা আছে।"

—"আমার পাওনা আছে?"

—হ্যাঁ, একখানি পাঁচ হাজার টাকার চেক, বিমানকে উদ্ধার করবার জন্যে পুরস্কার। চেক আমি লেখেই নিয়ে এসেছি। এই নাও।" মিঃ রায় পকেট-বুকের ভিতর থেকে চেকখানি বার করলেন।

জোরে মাথা-নাড়া দিয়ে হারাধন বললে, "না, না! পুরস্কারের লোভে আমি বিমানকে উদ্ধার করি নি!"

—"এ কথা আমি জানি হারাধন, এ কথা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু চেকখানি তোমাকে নিতেই হবে, আমারও অঙ্গীকারের একটা মূল্য আছে তো?"

—"ও টাকা আমি কিছুতেই নেব না! আপনি বরং ঐ টাকাটা

আমার নামে কোন হাসপাতালে দান করবেন।"

মিঃ রায় প্রগাঢ় স্বরে বললেন, "হারাধন, তোমাকে যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি! বেশ, আমি এই পাঁচ হাজার টাকা তোমার নামে কোন হাসপাতালেই পাঠিয়ে দেব। কিন্তু তোমার একটা কথা আমি কোনমতেই শুনব না। তোমাকে এখনি আমার সঙ্গেই যেতে হবে।"

প্রীতি ও বিমান দুই দিক থেকে হারাধনের দুই হাত ধরে টানতে টানতে বললে, "আমাদের সঙ্গে চল নতুন দাদা, আমাদের সঙ্গে চল!"

হারাধন বিব্রত হয়ে বললে, "ও দিদি, ও দাদা, আর টানাটানি কোরো না, আমি তোমাদেরই সঙ্গে যাব!"

বিমান নৃত্য শুরু ক'রে দিয়ে বললে, "নতুন দাদা সঙ্গে যাবে—নতুন দাদা সঙ্গে যাবে! কী মজা ভাই, কী মজা!"

ইন্‌স্পেক্টারবাবু এতক্ষণ চুপ ক'রে সব দেখছিলেন ও শুনছিলেন। এখন তিনি বললেন, "হারাধন, তোমার গুণ দেখে আমিও মুগ্ধ হয়েছি। তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে এলে খুব খুশি হব।"

বিমান সভয়ে বললে, "না, আমার নতুন দাদা আর এখানে আসবে না। এখানে একটা ঘরে সেই রাক্ষসের মতো লোকটা আছে!"

ইন্‌স্পেক্টার হেসে বললেন, "ও, তুমি বুঝি সেই জাল জমিদারের কথা বলছ? না খোকা, সে আর কোন নষ্টামিই করতে পারবে না! এখন তাকে হাজতে পোরা হয়েছে, এরপর যাবে জেলখানায়।"

হারাধন শুধোলে, "তারাপদবাবু কোথায়?"

—"তোমার ডাণ্ডা খেয়ে এখন হাসপাতালে। তার একটা চোখ একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেরে উঠলে একটিমাত্র চোখ নিয়ে তাকেও বেড়াতে যেতে হবে জেলখানায়।"

কাঁচুমাচু মুখে হারাধন বললে, "লাঠিটা যে চোখে গিয়ে পড়বে তা আমি জানতুম না!"

মিঃ রায় বললেন, "লাঠিটা তার চোখে গিয়ে পড়েছে ভগবানের ইচ্ছায়। শয়তানির শাস্তি! এখন আর কথায় কথায় সময় কাটানো নয়, সবাই বাড়ির দিকে চল,—এস বিমান, তোমার নতুন দাদাকে সঙ্গে নিয়ে এস।"

●

আধুনিক রবিন্‌হুড

বিখ্যাত চোরের অ্যাড্‌ভেঞ্চার

এক বিশ্ববিখ্যাত চোরের সত্যিকার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী!

কিছু কম চারশো বছর আগে বিলাতে এই চোরের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু আজ সারা পৃথিবীর সব দেশই তাকে ঘরের লোকের মতন আদর করে। কেবল আদর নয়, শ্রদ্ধাও করে। আর কোন চোরই পৃথিবীর কাছ থেকে এত সম্মান, এত ভালবাসা পায় নি। এই সবচেয়ে বিখ্যাত চোরের নাম তোমাদেরও অজানা নয়। গল্প শুনতে শুনতে তার নামটি আন্দাজ কর দেখি!

বিলাতে ওয়ারউইক্‌সায়ার বলে একটি জেলা আছে। তার শুকনো বুক ভিজিয়ে বয়ে যায় সুন্দরী অ্যাভন নদী। তারই তীরে চার্লেকোট নামে এক তালুক। জমিদারের নাম, স্যর টমাস লুসি।

মস্ত বড় তালুক—তার মধ্যে গ্রামও আছে, বনও আছে। বনে দিকে দিকে চরে বেড়ায় হরিণের দল। এ-সব হরিণ, স্যর টমাসের নিজের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য! কেউ হরিণ চুরি করলে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। হরিণদের উপরে পাহারা দেবার জন্যে অনেক লোক নিযুক্ত আছে। তবু আজকাল প্রায়ই হরিণের পর হরিণ চুরি যাচ্ছে।

কাজেই স্যর টমাস ভয়ানক খাপ্পা হয়ে উঠেছেন। দেওয়ানকে ডেকে ধমক দিয়ে তিনি বললেন, "ব্যাপারখানা কি বল দেখি? ফি হপ্তায় দেখছি আমার জমিদারি থেকে হরিণ চুরি যাচ্ছে! চোরেরা বাছা-বাছা হরিণ নিয়ে পালায়! এ-চুরি বন্ধ করতেই হবে! চারিদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা কর! আমার বিশ্বাস, এ-সব এক আধজন চোরের কীর্তি নয়, এর মধ্যে অনেক লোক আছে!"

দেওয়ান ভয়ে-ভয়ে বললে, "হুজুর, চারিদিকেই আমি পাহারা বসিয়েছি। এতদিন পরে কালকে একদল চোর প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে! সেপাইরা তাদের পেছনে তাড়া করেছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কারুকেই ধরতে পারে নি!"

স্যর টমাস জিজ্ঞাসা করলেন, "কারুর ওপরে কি তোমার সন্দেহ হয় না?"

দেওয়ান বললে, "গাঁয়ে গিয়ে আমি খোঁজ নিয়েছি। কতকগুলো

ছোকরাকে দেখলুম, তারা আপনার নামে যা-খুশি-তাই বলে বেড়ায়। হরিণ-চুরির কথা তুলতে তারা আবার মুখ টিপে-টিপে হাসে। কিন্তু তাদের মধ্যে কে চোর আর কে সাধু, সে কথা বলা ভারী শক্ত!"

স্যর টমাস মুখভঙ্গি করে বললেন, "একবার যদি হতভাগাদের ধরতে পারি, তাহলে তাদের কেউ আর মুখ টিপে টিপে হাসবে না! বারবার চুরি! দেওয়ান, এ চুরি বন্ধ করতেই হবে!"

হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল উঠল—বাদ-প্রতিবাদ, ধস্তাধস্তি!

তারপরেই একজন লোক ঘরের ভিতর ঢুকে সেলাম করে বললে, "হুজুর, কাল রাত্রে একটা চোর ধরা পড়েছে!"

স্যর টমাস অত্যন্ত আগ্রহে বলে উঠলেন, "কোথায় সে বদমায়েশ?"

—"অনেক কষ্টে তাকে ধরে এনে কাছারি বাড়ির একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে!"

—"তাকে তুমি চেনো?"

—"না হুজুর! কিন্তু গাঁয়ের সবাই তাকে চেনে। হাড়-বখাটে ছোকরা, আরো দুএকবার নাকি অন্যায় কাজ করে ধরা পড়েছে।"

—"কেমন করে তাকে ধরলে?"।

—"হরিণটাকে মেরে কাঁধে তুলে সে বনের ভিতর দিয়ে পালাচ্ছিল। সেই সময়ে দেখতে পেয়ে আমাদের লোকেরা তাকে তাড়া করে। তখন যদি হরিণটাকে ফেলে দিয়ে সে পালাতো, তাহলে কেউ তাকে ধরতে পারত না!"

বিকট আনন্দে স্যর টমাস বললেন, "নিয়ে এস—এখনি তাকে এখানে নিয়ে এস, পরদ্রব্য চুরি করার মজাটা সে ভোগ করুক! দেওয়ান, তুমি এখন যেতে পারো। কিন্তু সাবধান! মনে রেখো, আরো অনেক চোর আমার বনে বেড়াতে আসে, একে একে তাদের সবাইকে ধরে দশ ঘাটের জল খাওয়াতে হবে!"

স্যর টমাস কেবল জমিদার নন। তিনি পার্লামেণ্টের সভ্য, আদালতের বিচারক! কাজেই তাড়াতাড়ি নিজের পদ-মর্যাদার উপযোগী জমকালো পোশাক পরে নিলেন। তারপর খুব ভারিক্কেচালে পা ফেলে, মুখখানা প্যাঁচার মতো গম্ভীর করে তুলে প্রকাণ্ড হলঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। এইখানে বসেই তিনি জমিদারীর কাজকর্ম

করেন, প্রজাদের আবেদন-নিবেদন শোনেন, দোষীদের শাস্তি দেন। হরিণ-চোর ধরা পড়েছে শুনে স্যর টমাসের পরিবারের অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষেরাও মজা দেখবার জন্যে সেখানে এসে জুটলেন।

শোনা গেল, দূর থেকে একটা গোলমাল ক্রমেই বাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে। তারপর অনেক লোকের পায়ের শব্দ হলঘরের দরজার সামনে এসে থামল। তারপর দুজন পাহারাওয়ালা দুদিক থেকে এক নবীন যুবককে ধরে টানতে টানতে ঘরের ভিতর এনে হাজির করলে। তার পিছনে আর একজন লোকের কাঁধে একটা দিব্য মোটাসোটা মরা হরিণ। আর একজন লোকের হাতে রয়েছে একটা ধনুক—এই ধনুকেই বাণ জুড়ে চোর হরিণটাকে বধ করেছে। সব পিছনে আরো একদল লোক, তারাও এসেছে মজা দেখতে। পৃথিবীতে চিরদিনই চোরের শাস্তি দেখা, ভারী একটা মজার ব্যাপার!

চোরের বয়স কুড়ি বছরের মধ্যেই। দেখতে সুপুরুষ, মাথায় ঢেউ-খেলানো লম্বা চুল, ডাগর-ডাগর চোখ, মুখে কচি গোঁফ-দাড়ির রেখা, মাঝারি আকার। তাকে দেখলে কেউ চোর বলে সন্দেহ করতে পারবে না।

কড়া চালে, চড়া স্বরে স্যর টমাস বললেন, "এদিকে এগিয়ে এস ছোকরা!"

চোর এগিয়ে এল।

—"কি নাম তোমার?"

চোর নিজের নাম বললে।

নাম শুনে স্যর টমাসের কিছুমাত্র ভাব-পরিবর্তন হল না। তখন সে নামের কোনই মূল্যই ছিল না, যদিও আজ সে নাম শুনলে বিশ্বের মাথা নত হয়!

দুই চোখ পাকিয়ে স্যর টমাস বললেন, "তোমার নামে চুরির অভি-যোগ হয়েছে। তোমার বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে, তাদের সন্দেহ করবার কোন উপায় নেই। তুমি বামাল সমেত ধরা পড়েছ। তোমার অপরাধ গুরুতর। কাজেই তোমার দণ্ডও লঘু হবে না। এ-অঞ্চলে তোমার মতন আরো কয়েকজন পাজী চোর-ছ্যাঁচোড় আছে বলে খবর পেয়েছি। তাই তোমাকে আমি এমন শাস্তি দিতে চাই, যাতে সবাই সময় থাকতে সাবধান হয়।"

চোর মৃদু স্বরে বললে, "বেশ, আমি জরিমানা দেব।"

স্যর টমাস কঠোর কণ্ঠে বললেন, "না।"

—"তাহলে আমাকে জেলে পাঠান।"

স্যর টমাস কঠোর কণ্ঠে বললেন, "না, না। তোমার জরিমানাও হবে না, তোমাকে জেলেও পাঠাব না। তোমার পৃষ্ঠে ত্রিশবার বেত্রাঘাত করা হবে।"

বেত্রাঘাত ছিল তখন অত্যন্ত অপমানকর দণ্ড। আসামীর মুখ রক্ত-বর্ণ হয়ে উঠল। এমন দণ্ডের কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি, তাড়াতাড়ি আর্ত-স্বরে সে বলে উঠল, "জরিমানা করুন—জেলে পাঠান, কিন্তু দয়া করে বেত-মারার হুকুম দেবেন না।"

স্যর টমাস অটলভাবে বললেন, "আসামীকে নিয়ে যাও এখান থেকে। তার পিঠে সপাসপ ত্রিশ ঘা বেত মারা হোক।"

চোরকে সবাই টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল। তারপর তাকে সকলকার সামনে এক প্রকাশ্য স্থানে দাঁড় করিয়ে তার দুই হাত বেঁধে, পিঠে বেতের পর বেত মারা হল।

সেদিন রক্তাক্ত দেহে মাথা নিচু করে চোর বাড়িতে ফিরে এল, তখন পিঠের যাতনার চেয়ে মনের যাতনাই তাকে বেশি কাবু করে ফেলেছে। প্রতিহিংসা নেবার জন্যে তার সারা প্রাণ ছটফট করতে লাগল, কিন্তু মহাধনী মহা শক্তিশালী জমিদার স্যর টমাস লুসির বিরুদ্ধে কী প্রতিহিংসা সে নিতে পারে? তার সহায়ও নেই, সম্পদও নেই! আবার কি সে বনে ঢুকে হরিণ চুরি করবে? না, চারিদিকে সতর্ক পাহারা, এবারে ধরা পড়লে, অপমানের আর অন্ত থাকবে না।

কিন্তু প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—যেমন করে হোক প্রতিশোধ নিতেই হবে—ধনী স্যর টমাসকে বুঝিয়ে দিতেই হবে, গরিবও প্রতিশোধ নিতে পারে। চোর বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। হঠাৎ ছেলেবেলার স্কুলের কথা তার মনে পড়ল। ছেলেরা এক দুষ্ট মাস্টারের নামে পদ্য লিখে তাঁকে প্রায় পাগল করে ছেড়েছিল। হ্যাঁ, প্রতিশোধ নেবার এই একটা সহজ উপায় আছে বটে। কিন্তু সে তো জীবনে কখনো পদ্য লেখে নি। সে তো পদ্য লিখতে জানে না! আচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

চোর কাগজ নিলে, কলম নিলে এবং একমনে স্যর টমাসের নামে পদ্য লিখতে বসল। লিখতে লিখতে সবিস্ময়ে সে আবিষ্কার করলে যে, তার পক্ষে পদ্য লেখা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। শেষ পর্যন্ত কবিতাটি যা দাঁড়াল, তা পাঠ করলে স্যর টমাস যে আহ্লাদে আটখানা হবেন না, এটুকু বুঝে চোরের মন অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হল। সমস্ত পদ্যটি এখানে তুলে দেবার সময় নেই, মাত্র কয়েকটি লাইনের নমুনা দেখলেই তোমরা তার কতকটা পরিচয় পাবে।

"পার্লামেণ্টের সভ্য সে যে,
আদালতের জজ সে হাঁদা,
ঘরের ভেতর জুজুবুড়ো,
বাইরে তাকে দেখায় গাধা!
কান ধরে তার নিয়ে গিয়ে
গাধীর সঙ্গে দাও-গে বিয়ে—প্রভৃতি।

আমাদের কবি তখনি তার এই অপূর্ব রচনাটি নিয়ে দৌড়ে গাঁয়ের সঙ্গীদের কাছে হাজির হল এবং সকলকে আগ্রহ-ভরে পড়ে শোনালে। কবিতাটি তাদের এত চমৎকার লাগল যে, তখনি তারা মুখস্থ করে ফেললে। তাদের মধ্যে ছিল একজন গাইয়ে, সে আবার স্থর দিয়ে কবিতাটিকে গানের মতন গাইতে আরম্ভ করলে। দুদিন যেতে-না-যেতেই সারা গাঁয়ের লোক মনের আনন্দে উচ্চস্বরে কবিতাটি আওড়াতে বা গাইতে শুরু করে দিলে। সে-অঞ্চলে স্যর টমাসকে কেউ পছন্দ করত না।

কিন্তু এতেও নবীন কবির মনের সাধ মিটল না। কারণ, স্যর টমাস হয়তো স্বকর্ণে এমন মূল্যবান কবিতাটি শ্রবণ করেন নি। অতএব সে এক রাত্রে চুপি চুপি গিয়ে জমিদার-বাড়ির ফটকের গায়ে কবিতাটি লটকে দিয়ে এল।

পরদিন সকালে ছেলে মেয়ে বউ নিয়ে স্যর টমাস খেতে বসেছেন, এমন সময়ে এক চাকর সেই কবিতার কাগজখানা নিয়ে এসে তাঁর হাতে দিয়ে বললে, "হুজুর, এখানা ফটকে ঝুলছিল। আমরা পড়তে জানি না, দেখুন তো দরকারী কাগজ কিনা?"

স্যর টমাস কাগজখানার উপরে চোখ বুলিয়েই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, "হতভাগা, নিশ্চয়ই তুই পড়তে জানিস। কাগজখানা

পড়েই আমাকে দেখাতে এসেছিস। দূর হ, বেরো এখান থেকে। চাবকে তোর বিষ ঝেড়ে দেব জানিস?"

চাকর তো এক ছুটে পালিয়ে বাঁচল,—সত্যিই সে লেখাপড়া জানত না।

স্যর টমাস একটু ভেবেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "বুঝেছি, এ সেই পাজীর-পা-ঝাড়া চোরের কাণ্ড। আমি তার কান কেটে নেব—আমি তার কান কেটে নেব!"

চোর-কবির কান অবশ্য কাটা যায় নি, কিন্তু স্যর টমাসের অত্যাচারে তাকে গ্রাম ছেড়ে পালাতে হল। তবে অনেক বছর পরে আবার যখন গ্রামে ফিরে এল, তখন সে একজন দেশবিখ্যাত কবি ও নাট্যকার।

স্যর টমাস কবে মারা গিয়েছেন। আজ তাঁকে কেউ চিনত না। কিন্তু পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার তাঁকে নিয়ে প্রথম কবিতা রচনা করেছিলেন বলেই লোকে আজও তাঁর নাম ভোলেনি। চারশো বছর আগেকার সেই হরিণ-চোরের নাম কি তোমরা শুনতে চাও? তিনি উইলিয়ম সেক্সপিয়ার।

টেলিফোনে গোয়েন্দাগিরি

ক

যে গল্পটি বলতে বসেছি তা গল্প বটে, কিন্তু একেবারে সত্য ঘটনা। কবি সেক্সপিয়ার বলেছেন, 'সত্য হচ্ছে, উপন্যাসের চেয়ে আশ্চর্য।' অন্তত এ-ঘটনাটি সত্য হলেও এমন আশ্চর্য যে, বিখ্যাত বিলাতী লেখক কন্যান ডইল সাহেব একে অবলম্বন করেই শার্লক হোম্‌সের একটি গল্প লিখে ফেলেছেন। আমি কিন্তু শার্লক হোম্‌সের গল্প তোমাদের শোনাব না, আমি যা বলব তা হচ্ছে অস্ট্রিয়া দেশের সত্যিকার পুলিসের কাহিনী, এর প্রত্যেকটি কথা পুলিসের নিজস্ব দপ্তরে লেখা আছে।

অস্ট্রিয়ার পুলিস, চোর ডাকাত হত্যাকারী ধরবার জন্যে অনেক সময়ে এক নতুন উপায় অবলম্বন করে। ঘটনাস্থলে যে-সব জিনিস পাওয়া যায়, পুলিস সেগুলো দেয় রাসায়নিক পণ্ডিতদের হাতে। তাঁদের পরীক্ষার ফলে অপরাধীরা প্রায়ই বিচিত্র উপায়ে ধরা পড়ে। সে পরীক্ষার পদ্ধতি কি-রকম, নিচের ঘটনা থেকে কতকটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আর-একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, রসায়ন-শাস্ত্রের দুজন অধ্যাপক ঘটনাস্থল থেকেই তিনশো ষাট মাইল দূরে অবস্থান করেও এবং ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত কোন জিনিস চোখে না দেখেও আসল অপরাধী ধরে ফেলে পুলিসের চক্ষুস্থির করে দিয়েছিলেন! অপরাধের ইতিহাসে, এমন কি, কাল্পনিক গোয়েন্দা-কাহিনীতেও এ-রকম ঘটনার কথা কেউ কখনো শোনে নি!

ভিয়েনা হচ্ছে অস্ট্রিয়ার রাজধানী। ভিয়েনা শহরের পা ধুয়ে বয়ে যায় ডানিউব নদী। তার উপরে আছে কয়েকটি সাঁকো। একদিন খুব ভোরবেলায় সাঁকোর পিল্লাদার রেলিংয়ের তলায় পাওয়া গেল একটি মৃতদেহ!

দেখলেই বোঝা যায়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দেহ। জমকালো দামী পোশাক-পরা। বয়সে লোকটি প্রাচীন। দেহের খানিক তফাতে পাওয়া গেল রিভলবার, খুব সম্ভব, হত্যাকারী তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে ফেলে

গিয়েছে। দেহে গুলির দাগ আছে। মৃতের পকেট একেবারে খালি।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, মৃত ব্যক্তির নাম হ্যান্স্ ভোগেল; লোহার ব্যবসায়ে কোটিপতি। নিমন্ত্রণ খেয়ে শেষ-রাতে ফিরছিলেন, পথেই এই কাণ্ড। আরও প্রকাশ পেল, তাঁর পকেটে অনেক টাকা ছিল।

পুলিস স্থির করলে, অর্থলোভে কেউ ভোগেলকে হত্যা করেছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত! সে যে কে, তা জানা গেল না; কারণ, হত্যাকারী কোন সূত্র রেখে যায় নি।

পুলিস এ মামলা নিয়ে হয়তো বেশি মাথা ঘামাতো না, কিন্তু ঘামাতে বাধ্য হল। এক জীবন-বীমা-কোম্পানির অধ্যক্ষ এসে পুলিসের বড়-সাহেবকে জানালেন, "ভোগেল আমাদের কোম্পানিতে তিন লক্ষ টাকার জীবন-বীমা করেছেন। দুষ্ট লোকেরা আমাদের বড় বড় মক্কেলকে যদি এইভাবে খুন করে পার পায়, তাহলে বেশি ক্ষতি হয় আমাদেরই। অতএব খুনীকে ধরা চাই, আর যে ধরতে পারবে তাকে আমরা তিন হাজার টাকা পুরস্কার দেব।"

পুরস্কার বড় সামান্য নয়। হত্যাকারীকে ধরবার জন্যে পুলিসের বড়-সাহেব উঠে-পড়ে লাগলেন।

খ

বড়-সাহেব নিজে হালে পানি না পেয়ে, বিখ্যাত রাসায়নিক প্রফেসর 'এক্স'-এর খোঁজে বেরুলেন।

কিন্তু প্রফেসর 'এক্স' তখন ভিয়েনা শহর থেকে তিনশো ষাট মাইল দূরে টাইরেল গেছেন বায়ু-পরিবর্তনে।

বড়-সাহেব তাঁকে ফোন করলেন।

প্রফেসর আগাগোড়া সব শুনে বললেন, "ডাক্তারের মানা আছে, আমার পক্ষে এখন ভিয়েনায় ফেরা অসম্ভব!"

বড়-সাহেব এত সহজে ছোড়নেওয়ালা নন। বললেন, "আচ্ছা প্রফেসর, ফোনের সাহায্যেই তাহলে কাজ চালানো যাক। আপনি যা বলবেন, আমি তা পালন করব। বলুন আমায় কি করতে হবে? যদি

কোন দরকারী তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন, তাহলে তিন হাজার টাকা লাভের সম্ভাবনা।"

প্রফেসর বললেন, "বহুৎ আচ্ছা, ইজি-চেয়ারে এই আমি খুব আরাম করে গদীয়ান হয়ে বসলুম। আমার সামনে আছে তামাকের পাইপ, খবরের কাগজ, পেন্সিল আর টেলিফোন। বেশ, তাহলে কাজ শুরু করা যাক···আচ্ছা, একজন 'কেমিস্ট'কে ডাকুন, আমার এই সব 'কেমিকেল' দরকার।" তিনি 'কেমিকেলের' ফর্দ দিলেন।

ভিয়েনায় পুলিসের অফিসে 'কেমিস্ট'কে আনবার জন্যে খবর পাঠানো হল।

টাইরেল থেকে ফোনে প্রফেসর বললেন, "বড়-সাহেব, ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে যে রিভলবারটা পেয়েছেন, তার নলচেটা (barrel) খুলে ফেলুন। নলচের দুটো মুখই ছিপি এঁটে এমনভাবে বন্ধ করে দিন, ভিতরে যাতে ধুলো-হাওয়া ঢুকতে না পারে।"

বড়-সাহেব খানিক পরে জবাব দিলেন, "প্রফেসর, আপনার কথামত কাজ করা হয়েছে। 'কেমিস্ট'ও এসেছেন।"

টেলিফোনে 'কেমিস্ট'কে ডেকে প্রফেসর বললেন, "আমি যা বলি তাই করুন। রিভলবারের নলচের ছিপি দুটো খুলে ফেলুন। হয়েছে? আচ্ছা, খানিকটা distilled জল নলচের ভিতরে পুরে বেশ করে নাড়াচাড়া করুন। হয়েছে? আচ্ছা, এইবার নলচের জলটুকু filter করে নিন।···আচ্ছা, এইবারে নলচের জলে sulphuric acid, alkaline sulphides আর salts of iron-এর খোঁজ করুন। পরীক্ষার ফল কি হল? নলচের ভিতর থেকে মর্চে, কি green crystals of ferrous sulphate পাওয়া গেল?"

—"না।"

—"যে জলটা বেরুলো তার রঙ কি হালকা হলদে নয়?"

—"না মশাই!"

—"সে কি, এ তো বড় অদ্ভুত কথা! আচ্ছা, ও-জলে কি sulphuretted hydrogen-এর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে?"

—"না।"

—"তাই তো, আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না! বেশ, জলের

সঙ্গে salts of lead মিশিয়ে দিন তো !…কি হল ? কালো তলানি দেখতে পাচ্ছেন ?"

—"উঁহু !"

—"কী !"…বিশেষজ্ঞ প্রফেসরের কাছ থেকে খানিকক্ষণ কোন জবাবই এল না। তারপর তাঁর গলা আবার পাওয়া গেল : "শুনুন ! এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে নিশ্চয় কোন গভীর রহস্য আছে !…নলচের জলের ভিতরে sulphuric acid পেলে প্রমাণিত হত যে, ঐ রিভলবার চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে ছোঁড়া হয়েছে। কিন্তু তা যখন পাওয়া যায়নি তখন বুঝতে হবে যে, রিভলবারটা ছোঁড়া হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টার আগেই। কিন্তু তা হতে পারে না, কারণ তাহলে অমন প্রকাশ্য সাঁকোর উপরে মৃতদেহটা ঘটনার আগের দিন সকালেই পাওয়া যেত। আচ্ছা, জলে বোধ হয় oxide of iron আছে ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে !"

—"বেশ। পুলিসের বড়-সাহেবকে ফোন ধরতে বলুন।"

বড়-সাহেব ফোন ধরে বললেন, "প্রফেসর, এ-সব কী শুনছি ? ও রিভলবারটা পাওয়া গেছে লাশের ঠিক পাশেই, আর তা-থেকে যে একটা গুলি ছোঁড়া হয়েছে, সে প্রমাণও রয়েছে !"

—"হতে পারে। কিন্তু ও-রিভলবারটা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর জন্যে দায়ী নয়। কারণ, ওটা ছোঁড়া হয়েছে ঘটনার দেড়দিন থেকে পাঁচদিন আগে !"

—"তাহলে আমাদের ঠকাবার জন্যেই হত্যাকারী ওটা ওখানে ফেলে গেছে।"

—"আচ্ছা, আরেকটু পরখ করা যাক। আচ্ছা, মৃত ব্যক্তির দেহের ভিতর থেকে গুলি পাওয়া গেছে ?"

—"হ্যাঁ, সেটা আমার টেবিলের উপরেই রয়েছে।"

—"গুলিটা পরীক্ষা করেছেন ?"

—"এখনো করি নি।"

—"বেশ, এখন পরীক্ষা করে দেখুন দেখি, গুলিটার মাপ কত ?"

…খানিক পরেই বড়-সাহেব অভিভূত কণ্ঠে বললেন, "প্রফেসর প্রফেসর ! আপনি যা বলেছেন, তাই ! ও গুলিটা এ-রিভলবারের ব্যাসের চেয়ে বড় ! ওটা অন্য কোন রিভলবারের গুলি !"—

বড়-সাহেব প্রায় হতভম্ব ! চোর-ডাকাত-খুনে ধরা তাঁর ব্যবসায়, ঘটনাস্থল তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, সমস্ত প্রমাণ তাঁরই হাতে রয়েছে এবং শত শত গোয়েন্দা তাঁকে সাহায্য করছে, অথচ একজন প্রফেসর সাড়ে-তিনশো মাইল দূরে বসে, কোন-কিছু চোখে না দেখে এবং হাতে-নাতে পরীক্ষা না করে অনায়াসেই রহস্যটা ধরে ফেললেন। তাঁর আত্মসম্মানে বোধহয় অত্যন্ত আঘাত লাগল।

প্রফেসর 'এক্স' বললেন, "বড়-সাহেব, বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ-তত্ত্বের সহকারী প্রফেসর 'ওয়াই' সম্প্রতি আমার এখানে আছেন। এই-বারে আপনি ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।…হ্যাঁ, আর এক জিজ্ঞাসা। মৃত ব্যক্তির জামাটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে ? দেখুন তো, জামায় যেখানে গুলি ঢুকেছে, সেখানে পোড়া বারুদের দাগ আছে কিনা ?"

—"আছে।"

—"হুঁ। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, মৃতের দেহের খুব কাছ থেকেই গুলি ছোঁড়া হয়েছে। আচ্ছা, প্রফেসর 'ওয়াই' কথা বলছেন।"

প্রফেসর 'ওয়াই' ফোন ধরে বললেন, "নমস্কার বড়-সাহেব। ভোগেলের মৃতদেহ থেকে আপনি কি কি জিনিস পেয়েছেন, আর কি কি হারিয়েছে ?"

প্রাপ্ত জিনিসের ফর্দ দিয়ে বড়-সাহেব বললেন, "কিন্তু, ভোগেলের পকেটে তিনখানা গভর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট ছিল, তা পাওয়া যাচ্ছে না।"

—"বড়-সাহেব, আসল ব্যাপার আমরা কতকটা আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু সেটা এখন আপনাকে বলতে পারব না। ঐ প্রমিসরি নোটগুলোর নম্বর আপনার কাছে আছে তো ?"

—"আছে।"

—"সরকারি ব্যাঙ্কের নামে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিন, যে-ব্যক্তি ঐ নোটগুলো ফেরত দেবে, সে ওদের বর্তমান দামের চেয়ে বেশি মূল্য পাবে।"

বড়-সাহেব বললেন, "প্রফেসর, আপনি কি খুনীকে এতই বোকা ভাবেন যে, সে এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে ধরা দিয়ে আত্মহত্যা করবে?"

—"একবার বিজ্ঞাপন দিয়েই দেখুন না। আমাদের বিশ্বাস, অপরাধী নিজে না এসে, অর্থলোভে অন্য কোন লোককে ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেবে।"

গ

পরদিনেই প্রফেসরদের ঘরে পুলিসের বড়-সাহেব ফোনের ঘণ্টা বাজিয়ে বললেন, "আশ্চর্য প্রফেসর, আশ্চর্য ব্যাপার! আপনারা যা বলেছিলেন ঠিক তাই হয়েছে। একজন লোক সেই নোটগুলো নিয়ে সত্যি সত্যিই ব্যাঙ্কে এসেছিল। তাকে যে পাঠিয়েছিল, আমরা সে-ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করেছি।"

—"সে কি বলে?"

—"সে ভয়ে দিশেহারা হয়ে মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। বলে, ভোগেল নিমন্ত্রণ খেয়ে মাতাল হয়ে ফেরবার পথে এক জায়গায় বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেইসময়ে সে তার পকেট কেটে, নোট নিয়ে পালিয়ে এসেছে।"

—"আপনার কি মনে হয়?"

—"প্রফেসর, আমার বিশ্বাস, সে খুন করে নি। যারা মানুষ খুন করে তাদের চেহারা, ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা অন্যরকম হয়। আপাতত তাকে আমি গারদে পুরে রেখেছি।"

—"বেশ করেছেন। কারণ, সে যে ভোগেলের পকেট কেটেছে তাতে তো আর সন্দেহ নেই।......বড়-সাহেব, এক কাজ করতে পারবেন?"

—"কি কাজ ?"

—"সাঁকোর উপরে যেখানে ভোগেলের লাশ পাওয়া গেছে, একবার সেইখানে যান। সাঁকোর ধারে যে লোহার রেলিং পাবেন, তার নিচে—মনে রাখবেন ভিতরদিকে—লোহার গায়ে কোন চটা-ওঠা দাগ আছে কিনা দেখে আসুন।"

প্রফেসরের অদ্ভুত অনুরোধ শুনে পুলিস-সাহেব রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। রেলিংয়ের গায়ে দাগই-বা থাকবে কেন, আর থাকলেও তার সঙ্গে এই খুনের সম্পর্ক কি ?

...খানিকক্ষণ পরে টেলিফোনে আবার পুলিস-সাহেবের বিস্মিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "হেলো প্রফেসর! আমি দেখতে গিয়েছিলুম। হ্যাঁ, নিচের রেলিংয়ের ভিতরদিগের রঙ একজায়গায় চটে গেছে বটে। নতুন দাগ! যেন সেখানে কোন-একটা ভারী জিনিস গিয়ে পড়েছিল! কিন্তু সেটা আপনি জানলেন কি করে ? কেউ কি আপনাকে বলেছে?"

সশব্দে হাস্য করে খুশি গলায় প্রফেসর বললেন, "না! আমরা দুই প্রফেসরে মাথা খাটিয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি। আমরা যে গল্পটি তৈরি করেছি সেটা সত্যি কিনা, আপনারা খোঁজ নিলেই বুঝতে পারবেন! এ হচ্ছে আমাদের গল্প :

ঘ

ভোগেলের ব্যবসায় আজকাল খুব লোকসান হচ্ছিল, আর দুদিন পরেই হয়ত তাকে দেউলে হতে হ'ত এবং তার পরিবারবর্গ পথে বসত।

চোখের সামনে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার দারিদ্র্যের ছবি দেখতে দেখতে ভোগেল প্রায় পাগলের মতন হয়ে উঠল। দিনরাত ভাবতে লাগল, এই দুর্ভাগ্যের দায় থেকে কী-উপায়ে সে পরিবারবর্গকে উদ্ধার করবে ?

প্রথমে সে তিন লক্ষ টাকায় নিজের জীবন-বীমা করলে। কিন্তু জীবন-বীমার শর্তে লেখা রইল, সে আত্মহত্যা করলে জীবন-বীমা-কোম্পানি তার পরিবারবর্গকে টাকা দিতে বাধ্য থাকবে না। এ শর্ত না

থাকলে ভোগেলের খুবই সুবিধা হ'ত। কারণ, সে স্থির করেছিল, এই উপায়েই পরিবারবর্গকে রক্ষা করবে।

প্রথমে সে একটি রিভলবারে ছয়টি গুলি পুরে একটি গুলি ছুঁড়লে। সেই রিভলবারের সঙ্গে আর-একটা গুলিভরা রিভলবার পকেটে পুরে ভোগেল নিমন্ত্রণ-বাড়িতে যায়।

অনেক রাতে নিমন্ত্রণ খেয়ে সে পথে বেরুলো। দেখলে একটা চোরের মতন লোক তার পিছু নিয়েছে। তখন তার মাথায় আর এক বুদ্ধি জুটল। সে মাতলামির অভিনয় করতে করতে একজায়গায় বসে পড়ে ঘুমের ভান করলে। চোর তার পকেট কাটলে, কিন্তু সজ্ঞানেও সে বাধা দিলে না!

তারপর ভোগেল উঠে সাঁকোর উপরে গেল। প্রথম রিভলবারটা বার'করে একটু তফাতে ফেলে দিলে। লোকে ভাববে, তাকে খুন করে পালাবার সময়ে খুনী ঐ রিভলবারটা ফেলে গেছে। রিভলবারটা তার কাছে থাকলে পাছে কেউ ভাবে যে, ওর দ্বারা সে-ই আত্মহত্যা করেছে, তাই সেটাকে ফেলে দিলে খানিক তফাতে। দ্বিতীয় রিভলবারটা বার করে একগাছা শক্ত দড়ির একপ্রান্তে বেঁধে ফেললে। এবং দড়ির অন্য-প্রান্তে বঁধলে একটা খুব ভারী জিনিস—খুব সম্ভব মস্ত একখানা পাথর। তারপর পাথরখানা রেলিং গলিয়ে সাঁকোর বাইরে ঝুলিয়ে দিলে। তারপর নিজের বুকে রিভলবার রেখে গুলি ছুঁড়লে!

হতভাগ্য ভোগেলের তখনি মৃত্যু হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে দড়ি-বাঁধা রিভলবারটা ছিনিয়ে নিয়ে সেই মস্ত-ভারী পাথরখানা ডানিউব নদীর ভিতরে গিয়ে পড়ল। কিন্তু রেলিংয়ের ভিতর দিয়ে গলবার সময়ে ভারী পাথরের টানে রিভলবারটা খুব জোরে রেলিংয়ের উপরে গিয়ে পড়ল—লোহার গায়ে তাই চটা-ওঠা দাগ হয়ে গেল।

বড়-সাহেব, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই নাটকের দুরাত্মা ঐ পকেটমার বেচারা নয়, ভোগেল নিজেই। ডানিউব নদীতে ডুবুরী নামিয়ে খোঁজ করলেই দড়ির দুই প্রান্তে বাঁধা সেই রিভলবার ও পাথরখানা খুঁজে

পাওয়া যাবে। ভোগেল ভেবেছিল, এত চালাকির পরেও তার মৃত্যুকে কেউ আত্মহত্যা বলে সন্দেহ করতে পারবে না, জীবন-বীমা-কোম্পানি তার পরিবারবর্গকে তিন লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হবে এবং নম্বরী নোট ভাঙাতে গিয়ে তাকে হত্যা করবার অপরাধে ধরা পড়বে ঐ পকেট-কাটা-ই।

"কিন্তু নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সুখের জন্যে সে আর-এক অভাগাকে ফাঁসিকাঠে তুলে দিতে চেয়েছিল, আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়েও, তাই সে ভগবানের দয়া পেলে না।"

৬

প্রফেসরদের অনুমান সব দিক দিয়েই সত্যে পরিণত হল।

ডানিউব নদীর গর্ভ থেকে দড়ি-বাঁধা পাথর ও রিভলবার দুইই পাওয়া গেল।

জীবন-বীমা-কোম্পানি তিন লক্ষ টাকা লোকসানের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে, কৃতজ্ঞ হয়ে, অঙ্গীকৃত তিন হাজার টাকার চেয়েও বেশি পুরস্কার দিয়ে প্রফেসরদের খুশি করলে।

এই ব্যাপারটি কি উপন্যাসের চেয়ে আশ্চর্য নয়? কখনো কোন

উপন্যাসের ডিটেকটিভও কি ঐ দুই প্রফেসরের চেয়ে বেশি বুদ্ধির পরিচয় দিতে পেরেছে? কিন্তু তোমরা কেউ এই ব্যাপারটিকে অবিশ্বাস করো না, কারণ, এটি হচ্ছে অস্ট্রিয়া দেশের একটি বিখ্যাত সত্য ঘটনা!

প্যারীর বালক বিভীষিকা

এক

টেট্ ডি-ওর হচ্ছে এক গাঁটকাটার ছেলে। তার মা সার্কাসে খেলা দেখাত। জাতে সে ফরাসী।

টেট্‌কে দেখতে ছিল ভারী সুন্দর। যেমন মুখ-চোখ, মাথায় তেমনি এক রাশ সোনালী চুলের গোছা। তার মিষ্টি চেহারা দেখলেই লোকে আদর না করে পারত না।

দিনরাত সার্কাসের খেলোয়াড়দের সঙ্গে থেকে সে খুব কম বয়সেই হরেক-রকম কায়দা শিখে ফেললে। লম্বা বাঁশ বেয়ে বানরের মতো সড়-সড় করে উপরে উঠে যেতে পারত। কেউ ধরতে এলে তার পায়ের তলা দিয়ে ফস করে গলে পালিয়ে যেতে পারত। কেউ হাতে চেপে ধরেও তাকে বন্দী করতে পারত না—সে মাছের মতন হাত থেকে পিছলে সরে পড়ত! তারের খেলা, দড়ির খেলা, এ-সব কিছুই তার অজানা ছিল না। এই দুষ্টু খোকাটির দৌরাত্ম্যে সার্কাসের সমস্ত লোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

একদিন টেটের গাঁটকাটা বাপ তাকে একটা টাকা দেখিয়ে বললে, "টাকা নিবি?"

টেট্ খুশি হয়ে বললে, "হুঁ, নেব বৈকি!"

—"এই নে তবে। কিন্তু দেখিস কেউ যেন কেড়ে নেয় না।"

টেট্ টাকাটা সাবধানে পকেটে রেখে বললে, "ইস, কেড়ে নেবে বৈকি! আমি তেমন বাচ্চা নই।"

তার বাপ বললে, "তুই তো ভারী অসাবধানী দেখছি! টাকাটা এর মধ্যেই হারিয়ে ফেললি?"

টেট্‌ মাথা নেড়ে বললে, "কখ্‌খনো না। টাকা আমার পকেটেই আছে।"

বাপ একটা টাকা দেখিয়ে হাসতে হাসতে বললে, "এই ত্যাখ তোর সেই টাকাটা।"

টেট্‌ তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিলে,—পকেট ফোক্কা। বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে সে হাঁ করে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাপ বললে, "কেমন করে তোর টাকাটা আমার হাতে এল, বুঝতে পারছিস না? আয় তোকে প্যাঁচটা শিখিয়ে দিই!"

তারপর থেকে টেট্‌ সকলকার পকেট মারতে শুরু করলে—তার বাপ-মায়ের পকেটও বাদ গেল না। যে-সব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সার্কাস দেখতে আসত, প্রায়ই তাদের পকেট থেকে জিনিস হারাতে লাগল।

টেটের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন এক অগ্নিকাণ্ডে তার মা আর বাপ পুড়ে মারা পড়ল। সার্কাসের লোকেরা তাকে এক অনাথ-আশ্রমে ভর্তি করে দিলে। কিন্তু অনাথ-আশ্রম তার ভাল লাগল না। কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে টেট্‌ একদিন পালিয়ে গেল।

একখানা গাড়িতে লুকিয়ে উঠে সে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী শহরে এসে হাজির হল।

দুই

প্যারী শহরে এসেই টেট্‌, এক মেয়ে-দোকানীর টাকার ব্যাগ নিয়ে সরে পড়ল।

সেই টাকায় নতুন জামা-কাপড় কিনে সে ভদ্রলোকের ছেলে সাজলে। তারপর একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করে এই আত্ম-পরিচয় দিলে :

"আমি এক মস্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনী লোকের একমাত্র ছেলে। আমার মা নেই। আমার বাবা ভয়ানক মাতাল। মদ খেয়ে রোজ বিনাদোষে মেরে আমার হাড় ভেঙ্গে দেন। সে অত্যাচার আর সইতে না পেরে আমি পালিয়ে এসেছি। আমার বাবা এক সাংঘাতিক অসুখে ভুগছেন,—তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। তখন তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালিক

হব আমি। আপাতত আমাদের এক পুরানো চাকর লুকিয়ে আমাকে টাকা পাঠাবে।"

স্ত্রীলোকটি বালক টেটের সুন্দর মুখ দেখে, তার সব কথায় বিশ্বাস করে তাকে আশ্রয় দিলে।

টেট্ পুরানো জামার দোকানে গিয়ে এমন একটা লম্বা জামা কিনলে, যা পরলে তার পা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। তারপর বসে বসে নিজের হাতে জামার ভিতরদিকে অনেকগুলো নতুন ও বড় বড় পকেট তৈরি করলে। জামার বাইরেকার দুই দিকে দুই পকেটে দুটো এমন লম্বা ছ্যাঁদা করলে, যাতে পকেটের ভিতর থেকে ইচ্ছা করলেই সে হাত বার করতে পারে।

এই অদ্ভুত জামা পরে সে শহরের পথে পথে শিকার করতে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুদিন পরেই পুলিসের কাছে খবর এল যে, শহরে গাঁটকাটার সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে উঠেছে। তখনি এদিকে চোখ রাখবার জন্যে একজন ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত হল। তার নাম ডুবইস্।

ডুবইস খুব চালাক ডিটেক্‌টিভ। ভেবে-চিন্তে সে পাড়াগেঁয়ে

ভদ্রলোকের বেশ ধরে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে পকেট থেকে ব্যাগ বার করে খোলে—তার ভিতরে একতাড়া নোট। ব্যাগটা আবার পকেটে রেখে দেয়। কিন্তু ব্যাগটা যে একগাছা সুতো দিয়ে পকেটে বাঁধা আছে, এ গুপ্তকথা সে ছাড়া আর কেউ জানে না।

ডুবইস্ পথের এক জায়গায় ভিড়ের ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই তার পকেটে টান পড়ল। তৎক্ষণাৎ ফিরেই সে একটি ছোকরাকে চেপে ধরলে। সে হচ্ছে, টেট্। মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া লম্বা চুলগুলো সে এমনভাবে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে যে, তার মুখ প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

এক মুহূর্তেই অদ্ভুত কৌশলে ডিটেক্‌টিভের হাত ছিনিয়ে টেট্ সুতো ছিঁড়ে, ব্যাগ নিয়ে তীরের মতো দৌড় মারলে। ডুবইস্‌ও তার পিছনে পিছনে ছুটল। একটি গলির মোড় ফিরেই টেট্ অদৃশ্য হল।

সে চটপট উপরকার জামাটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। একখানা চিরুনি বার করে মাথার চুলগুলো অন্যরকমভাবে আঁচড়ে নিলে।

ডুবইস সেখানে এসে ছোকরা গাঁটকাটার বদলে দেখলে, একটি ফিটফাট পোশাক-পরা স্কুলের ছেলে পাশের এক দোকানের দিকে তাকিয়ে আছে।

ডুবইস্ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "হ্যাঁ খোকা, একটা লম্বা কোর্তা-পরা ঝাঁকড়া-চুলো ছোকরাকে এইদিক দিয়ে যেতে দেখেছ?"

অত্যন্ত নির্দোষের মতো টেট্ বলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ঐদিকে দৌড় মেরেছে।"

তার নির্দেশ মতো ডুবইস্ অন্যদিকে ছুটল।

সুতোসুদ্ধ ব্যাগটা পরীক্ষা করে টেট্ বুঝলে, এইবারে পুলিসের টনক নড়েছে। সেও সাবধান হল।

টেট্ তার বয়সী অনেকগুলো ছেলের সঙ্গে ভাব করলে। তারপর তাদেরও হাতের কায়দা শেখাতে লাগল।

টেটের উপদেশে তারা প্রথমে আত্মীয়-স্বজনের পকেট মেরে হাত পাকাতে আরম্ভ করলে। তারপর রাস্তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পকেট লুণ্ঠন। তারপর ভিড়ের ভিতরে গিয়ে তারা দাস-দাসীদের পকেট পরীক্ষা করতে লাগল।

এইভাবে তাদের হাত যখন বেশ সাফ হয়ে উঠল, টেট্‌ তখন তাদের গুরুতর কার্যে নিযুক্ত করলে।

এই ছোকরা গাঁটকাটারা টেট্‌কে নিজেদের সর্দার বলে মেনে নিলে। তাদের লাভের আধাআধি অংশ টেটের পাওনা হ'ত।

তিন

প্যারী শহরের চারিদিকে মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল—ছোকরা-গাঁট-কাটাদের অত্যাচারে টাকা-পয়সা নিয়ে পথে বেরুনো দায় হয়ে উঠেছে। এমন পকেটমারের উপদ্রব শহরে আর কখনো হয় নি।

ডুবইস্‌ তখনো হাল ছাড়ে নি। সে একজন স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করলে। সে পকেটে টাকা বাজাতে বাজাতে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু তার পকেটের গায়ে যে অনেকগুলো বড়শি লাগানো আছে, একথা জানত কেবল সে নিজে।

হঠাৎ এক জায়গায় তার পকেটে কে হাত দিলে—সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ। সে ফিরে দেখলে, তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোকরা যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

ছোকরা বললে, "উঃ।" আপনার পকেটে আমার হাত আটকে গেছে। উঃ।"

—"আমার পকেটে? কি আশ্চর্য! এস, এদিকে এস, হাত খুলে দিচ্ছি।" আড়ালে ডুবইস্‌ অপেক্ষা করছিল! ছোকরাকে দেখে সে বললে, "কি হে, তুমি হাতকড়ি প'রে থানায় যেতে চাও, না, আমাকে নিয়ে তোমার আড্ডায় ফিরে যাবে?"

ছোকরা, ডুবইস্‌কে তাদের দলের সর্দারের ঘর দেখিয়ে দিলে।

রাত্রে টেট্‌ নিজের ঘরে ফিরে এল। হঠাৎ এক পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ডুবইস্‌ তার সোনালী চুলগুলো বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলে। তার হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দুই পায়ে দড়ি বেঁধে তাকে মাটির উপরে শুইয়ে রাখলে। তারপর ঘরের চারিদিকে চোরাই মাল খুঁজতে লাগল।

ডুবইস্‌ অবাক হয়ে দেখলে, টেট্‌-ছোকরার পড়াশুনায় মন আছে। কারণ, ঘরের দেওয়ালে তাকে তাকে অগুন্তি বই সাজানো রয়েছে। প্রত্যেক বই, পুস্তকের দোকান থেকে চুরি করা।

খানিক পরে একটা শব্দ শুনে ডুবইস্ ফিরে দেখলে যে, টেট্ জানলার ভিতর দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ছে।

ডুবইস্ বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল। ঘরের এবড়ো-খেবড়ো দেওয়ালে টেট্ পায়ের দড়ি ঘষে ছিঁড়ে ফেলেছে।

চার

কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতক ছোকরাই কিছুদিন পরে টেট্‌কে আবার ধরিয়ে দিলে।

আদালতে তার বিচার হল। বিচারক গম্ভীরভাবে বললেন, "ছোকরা, তোমাকে এক বৎসর জেল খাটতে হবে।" টেট্ অবহেলাভরে বললে, "এক বছর ? মোটে বারোটা মাস। ভারী তো!"

আচম্বিতে কাঠগড়া থেকে সে একলাফে বিচারকের টেবিলের উপরে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে বিস্মিত পাহারাওয়ালাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে বাইরে পালিয়ে গেল। তারপর অনেক কষ্টে আবার তাকে ধরা হল। তার সাহস ও কৌশল দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

তার কিছুকাল পরে আর-একবার সে পালাবার চেষ্টা করলে—টেটের শেষ চেষ্টা।

জেলখানার উঁচু ছাদে উঠে সে দেখলে, খানিক নিচে একটা কার্ণিস রয়েছে, সেখানে পৌঁছতে পারলে পলায়নের অত্যন্ত সুবিধা।

টেট্ লাফ মারলে। কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হয়ে কার্ণিসে গিয়ে পৌঁছতে পারলে না। একেবারে মাটির উপরে গিয়ে পড়ে তার ঘাড় ভেঙে গেল।

মোটে বারো বছর বয়সে টেটের মৃত্যু হয়। ফরাসী পুলিসের মতে, আরো কিছুকাল বেঁচে থাকলে, মানুষ খুন করে তাকে ঘাতকের হাতেই মরতে হ'ত।

যত বুদ্ধি থাক, যত সাহস থাক, অসৎ পথের পরিণাম চিরদিনই ভয়াবহ। ভাল ছেলে হলে টেট্ আজ নিশ্চয়ই মস্ত লোক হতে পারত।

●